ওঁ নমঃ।

জ্ঞানপ্রদীপ।

(প্রথম ভাগ)।

"সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য"

(তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত

——*——

শিল্প ও সাহিত্য পুস্তক বিভাগ হইতে
শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

——o——

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, বহুবাজার,
কলিকাতা।
১৩২৭।

——o——

মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

প্রথমোল্লাস।

দ্বিতীয়োল্লাস।

তৃতীয়োল্লাস।

চতুর্থোল্লাস।

ওঁ হংসঃ ষট শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ।

ব্রহ্মানন্দস্বরূপ পরমানন্দপ্রদ মূর্ত্তিমান অনন্ত জ্ঞানাধার সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম পরম পূজ্যপাদ ঠাকুর ওঁ পরমহংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ সদ্‌গুরুদেব! আপনি অনাদি বৃদ্ধ ও অসংখ্য আর্য্য গুরুমণ্ডলীর সমষ্টিভূত হইয়াই আজি একমেবাদ্বিতীয়ং ও অনন্তের একমাত্র সাক্ষীস্বরূপ, আপনি ত্রিগুণরহিত হইয়াও আজি সাম্যাবস্থাময়ী ত্রিগুণাত্মিকা মহা-প্রকৃতির সহিত যেন একীভূত, আপনারই কৃপাবলে দ্বন্দ্বাতীত ও নিত্য অপূর্ব্ব জ্ঞানতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস উপলব্ধিপূর্ব্বক আপনারই প্রদত্ত এবং প্রোজ্জ্বলীকৃত এই "জ্ঞানপ্রদীপ" আপনার চির পবিত্র আনন্দমঠের পাদপীঠে সন্তর্পণে সংরক্ষা করিলাম। আশীর্ব্বাদ করুন, তত্ত্বাভিলাষী মুমুক্ষু সজ্জনগণ এই স্থির প্রদীপালোকে আত্মদর্শন করিয়া যেন ধন্য হয়; আর এই অভূতপূর্ব্ব শুভ অবসরে আপনার জ্ঞানপ্রদীপোত্থিত ব্রহ্মবহ্নিতে আপনার স্নেহের সচ্চিদানন্দ একান্তে আত্মসমর্পণ করিতেছে, তাহাকে তদঙ্গে মিলাইয়া লউন প্রভো!

"ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥"
ওঁ ব্রহ্ম ওঁ পরমশিব ওঁ ব্রহ্ম ওঁ॥

কাশীধাম
শুভ শ্রাবণী গুরু-পূর্ণিমা,
কলের্গতাব্দাঃ ৫০১৯।

সচ্চিদানন্দ

প্রকাশকের নিবেদন।
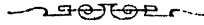
"জ্ঞানপ্রদীপের" মুদ্রণকার্য্য অনেকদিন হইতে আরম্ভ হইলেও নানা দৈব দুর্ঘটনা বশে ইহা আজও পরিসমাপ্ত হয় নাই। এদিকে ভক্ত সাধকমণ্ডলী গ্রন্থপ্রকাশের জন্য অধৈর্য্যভাবে আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন; আমরাও যথাসাধ্য যত্নের ত্রুটী করিতেছি না, তথাপি কি জানি শ্রীভগবানের কি অভিপ্রায়, একটা না একটা প্রতিবন্ধক আসিয়া ইহার অযথা বিলম্বের কারণ হইতেছে। সৎকার্য্যে যে পদে পদে নানা বিঘ্ন-বাধা ভোগ করিতে হয়, ইহা বোধ হয় তাহারই একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ!

যাহা হউক, আমরা উপস্থিত পূজ্যপাদ্ শ্রীমদ্ স্বামীজী মহারাজের পরামর্শে "জ্ঞানপ্রদীপের" যতদূর মুদ্রণ হইয়াছে, তাহা হইতে ইহার প্রথম-ভাগরূপে একখণ্ড প্রকাশ করিয়া দিলাম। ইহাতে সাধনানুরাগী ভক্তজন অবশ্যই তৃপ্তিলাভ করিবেন। অবশিষ্ট অংশ দ্বিতীয়-ভাগরূপে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এখন হইতে তাহার মুদ্রণকার্য্য সত্বর সম্পন্ন করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। তাহাতে পঞ্চম হইতে সপ্তম উল্লাসের মধ্যে বিরজা-সংস্কার ও অন্তিম দীক্ষা, সন্ন্যাসাশ্রম, অবধূতাদি সন্ন্যাসীর আচার, অধিকারভেদ ও সমাধি, শ্রীমদ্‌বৃদ্ধব্রহ্মানন্দদেব-কপিল ও গঙ্গাসাগর প্রসঙ্গ, মঠ বা আম্নায়-সপ্তক রহস্য, জ্ঞানতত্ত্বাদি বিচার ও তাহার

সাধনা, তন্ত্রে সৃষ্ট্যাদিতত্ত্ব ও সমগ্র দর্শনশাস্ত্র-সমন্বয়, আত্মতত্ত্বাদি রহস্য, তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য রহস্য, ত্রিবিধ প্রণব রহস্য এবং মুক্তিতত্ত্বাদি অতি গভীর ও গুপ্ত জ্ঞান তন্ত্রের অপূর্ব্ব সাধন-বিষয় সকল বিস্তৃতভাবে প্রকাশ হইতেছে। পূজ্যপাদের উপদেশক্রমে আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, ভক্ত ও মুমুক্ষু পাঠকবৃন্দ ততদিন এই প্রথমভাগ "জ্ঞানপ্রদীপ" মনোযোগসহ আলোচনা করুন, ইহাদ্বারা দ্বিতীয়ভাগের আলোচনা পক্ষে যে বিশেষ সহায়তা করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইতি—

কলিকাতা,
শ্রীপঞ্চমী
৫০২০ কলের্গতাব্দা। } প্রকাশক।

ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রীমদ্ গুরবে নমঃ।

জ্ঞানপ্রদীপ।

(সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য—তৃতীয় খণ্ড।)

প্রথমোল্লাস।

"জ্ঞানংসাক্ষান্নির্ব্বাণকারণম্।"

"জ্ঞানান্মুক্তি।"

সনাতনধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা।

"সাধনপ্রদীপের" প্রথমেই "সনাতনধর্ম্ম ও মহাবিদ্যা" প্রসঙ্গের টিপ্পনীতে (ফুট্ নোটে) প্রতিশ্রুতি ছিল যে, "জ্ঞান-প্রদীপে" এতদ্বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রদত্ত হইবে। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ঠাকুরের কৃপায় আজ জ্ঞানপ্রদীপ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াই সেই প্রতিশ্রুতি স্মরণে সনাতনধর্ম্ম-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে বাধ্য হইতেছি।

প্রাকৃতিক মূলধর্ম্ম ও বিভিন্ন উপধর্ম্ম।

"সনাতনধর্ম্ম" এই শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মনে হইতেছে, বেদ পুরাণ তন্ত্র ও দর্শনাদি সমুদায় আর্ষ-শাস্ত্রের মধ্যে কোথাও "সনাতনধর্ম্ম" বলিয়া আমাদিগের বেদ ও তদনুগত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সংজ্ঞাবাচক কোনও বিশেষ শব্দের উল্লেখ নাই। সর্ব্বত্রই "ধর্ম্ম" এই সাধারণ আদি শব্দমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কলিযুগের মধ্যে কতকগুলি উপধর্ম্মের প্রচার হওয়ায়

তাহাদের পরস্পরের পার্থক্য পরিচয়ের জন্যই ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন বহু নাম বা শব্দ শুনা যাইতেছে। উদাহরণস্বরূপ "পারসিক" বা "জোরাস্তানধর্ম্ম," "জৈনধর্ম্ম," "বৌদ্ধধর্ম্ম," "খ্রীষ্টধর্ম্ম" ও "ব্রাহ্মধর্ম্ম" ইত্যাদি বলা যাইতে পারে। এই আদর্শেই সর্ব্ব-ব্যাপক ও সার্ব্বভৌম লক্ষ্য-সম্পন্ন উদার এবং পরম শান্তিগুণ-সংযুক্ত জগতের সেই মূলধর্ম্মও উপধর্ম্মসমূহ হইতে স্বকীয় বিশিষ্টতা রক্ষাকল্পে "সনাতনধর্ম্ম" বলিয়া অধুনা অভিহিত হইয়াছে।

"সাধনপ্রদীপে" উক্ত হইয়াছে, ইহা অনাদি ও অবিনাশী, সেই হেতু ইহা "সনাতন;" এতদ্ব্যতীত পূজ্যপাদ আর্য্যমহর্ষিগণসেবিত বলিয়া ইহা আদি "আর্য্যধর্ম্ম" বা "আর্ষধর্ম্ম," অপৌরুষেয় সত্যজ্ঞান বা বেদমূলক বলিয়া ইহা "বৈদিকধর্ম্ম" বা "ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম"এবং সিন্ধুনদের সমীপবর্ত্তী প্রদেশসমূহের জনগণকর্ত্তৃক আচরিত বলিয়া, তাহার দূর পশ্চিমতীরবাসী এবং পরবর্ত্তী সময়ে ধর্ম্মান্তর বিশ্বাসী প্রতিবেশী জনদিগের ভাষায় সিন্ধুর অপভ্রংশে হিন্দুর ধর্ম্ম বা "হিন্দুধর্ম্ম" নামেও পরিচিত হইয়াছে।

বিশ্ববরেণ্য আর্য্যশাস্ত্রসমূহের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে শ্রীভগবানের যে ইচ্ছা শক্তি জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, যে ভগবদ্বিধান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপী প্রকৃতিকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, সাধারণতঃ তাহাই প্রাকৃতিক মূলধর্ম্ম অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির যে ক্রম আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বের সর্ব্বত্র সমভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে বা যে ইচ্ছা-শক্তির বলে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়রূপ ক্রিয়াত্রয় যথাক্রমে ও যথাসময়ে সংসাধিত হইয়া আসিতেছে এবং যে মহাশক্তি জীবসমূহকে উদ্ভিজ্জ হইতে ক্রমশঃ উন্নত করাইতে করাইতে মনুষ্য-যোনি পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতেছে, অথবা যে ক্রমবিধান সেই ঐশী নিয়মদ্বারা চিরদিন ধৃত রহিয়াছে, সেই জগদ্ধারিকা বিধান-শক্তির নাম ধর্ম্ম। ইহাই জগতের আদি ধর্ম্ম।

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি।
ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি ধর্ম্মেসর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি॥
ধর্ম্মেণৈব জগৎ সুরক্ষিত মিদং ধর্ম্মো ধরাধারকঃ।
ধর্ম্মাদ্বস্তু নকিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈনমঃ॥"

প্রাকৃতিক-ধর্ম্মের বিচার সহযোগে ইহাও নিরাকৃত হয় যে, জীবসমূহও সেই ঐশী-নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন; অর্থাৎ উৎপত্তি স্থিতি ও লয় বা মোক্ষাত্মক সত্বাদি ত্রিবিধ গুণেরই ত্রিভেদ অনুসারে তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ধর্ম্মের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—ধর্ম্ম অর্থাৎ ধারণ কর্ত্তা এবং নিরুক্তানুগত অর্থ—ধর্ম্ম অর্থাৎ ধারণযোগ্য নিয়ম, বুঝিতে পারা যায়।

"ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥"

ইহা ব্যতীত ধর্ম্মশব্দের ভাবার্থ অনুধাবনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, জীবের ক্রমোন্নতিবাদই জীবের প্রকৃতিগত একমাত্র ধর্ম্ম; সুতরাং জীবশ্রেষ্ঠ মানবের পক্ষেও তাহাদের যাবতীয় কর্ম্ম যে, সেই চিরন্তন ধর্ম্মাধিকারেরই অন্তর্গত হইয়া পড়ে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব বিশ্বসংসারের সমস্ত বস্তুর ন্যায় মনুষ্য-সমাজও সেই আদি প্রাকৃতিক ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অধীন। মানবকেও ধীরে ধীরে লক্ষ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণানন্তর স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর বিজ্ঞানের পথে উন্নত হইতে হয়। শ্রীমন্মহর্ষি কণাদ তাঁহার "বৈশেষিক-সূত্রে" বলিয়াছেনঃ :—

"যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ॥"

অর্থাৎ জীবের অভ্যুদয় বা ক্রমোন্নতিমূলক তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি লাভের কারণ-স্বরূপ বিধি-নিষেধকেই ধর্ম্ম বলে। অথবা যদ্বারা প্রকৃত সুখ ও মোক্ষ লাভ হয়, তাহারই নাম ধর্ম্ম। কিঞ্চিৎ বিস্তৃত করিয়া না বলিলে বোধ হয় সকলে ইহা ঠিক অনুভব করিতে পারিবেন না।

জড় ও চৈতন্য রাজ্য

ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু সাধকগণ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম বস্তুর বিশ্লেষণে সৎ চিৎ ও আনন্দ এই ত্রিধা বিভক্ত বিচিত্রভাব সতত উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সেই কারণ তাঁহারা তদীয় শিষ্যবর্গের মধ্যেও তাহার বিশেষ উপদেশ প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করেন না। সেই সৎ চিৎ ও আনন্দ ক্রিয়ার মধ্যে প্রথম দুইটী, ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকেই সুধিগণ যথাক্রমে সংসারের জড়ক্রিয়া ও চেতনক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করেন। সৎ—যাহা নিত্য, ধীর ও অচঞ্চল এবং চিৎ—যাহা চৈতন্যযুক্ত, চঞ্চল বা সচঞ্চল। অতএব ব্রহ্ম বস্তুতে নিত্য ধীর বা অচঞ্চল এবং চৈতন্য বা সচঞ্চল ভাব উভয়ই বর্ত্তমান আছে; সুতরাং সেই ধীর বা অচঞ্চল ভাবমূলক সৎ বস্তুর ক্রিয়া জড়ক্রিয়া বা অবিদ্যা এবং চিৎ বস্তুর ক্রিয়া চৈতন্য ক্রিয়া বা বিদ্যা। ভাবাভাব-পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মবিন্দু হইতে উভয়-দিকে ব্রহ্মপরিধিরূপ অনন্তবৃত্তে বিস্তৃত ব্রহ্মবিবর্ত্তন-স্বরূপ ভাব-রাজ্যে উক্ত অবিদ্যা বা জড়ের ক্রিয়া এবং বিদ্যা বা চৈতন্যের লীলা সদাই পরিলক্ষিত হয়। জড়ক্রিয়া ঈশ্বরবিমুখী বা চৈতন্য-বিমুখী জড়ভাবাপন্ন সৎ প্রান্ত পর্য্যন্ত এবং চৈতন্যক্রিয়া ঈশ্বরমুখী বা চৈতন্যমুখী চেতনভাবাপন্ন চিৎ প্রান্ত পর্য্যন্ত পরস্পর বিপরীত দিকে সমভাবে বিস্তৃত। অথবা ব্রহ্ম বস্তুকে গোলকের ন্যায় কল্পনা করিয়া তাহার মধ্যভূমিতে পৃথিবীর বিষুবরেখার (Equator) ন্যায় কোন মধ্যরেখা কল্পনা করিলে, তথা হইতে একদিকে বা এক মেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত জড়-রাজ্যের ক্রিয়া বিদ্যমান বুঝিতে হইবে। জড়ক্রিয়ার রাজ্য ব্রহ্মবিবর্ত্তনের শেষ পরিণতি বা তাহার প্রান্ত অথবা মেরুস্থানে আসিয়া অবিদ্যার অতি স্থূল লীলায় প্রস্তরাদিসম স্থূলতম কঠিন স্থাবর পদার্থে পরিসমাপ্ত হইয়াছে এবং সেইরূপেই চৈতন্য-রাজ্যের শেষ পরিণতি মুক্ত মানবরূপ চৈতন্য-জ্ঞানাধার ব্রহ্মজ্ঞ বা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ পর্য্যন্ত

বিস্তৃত হইয়াছে। সেইহেতু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মবিদ্যার উপলব্ধি বিবর্জ্জিত যে জড়ক্রিয়া তাহা ঈশ্বরবিমুখী ভাব এবং যাহা ব্রহ্মজ্ঞানমুখী ভাব তাহাই চৈতন্যক্রিয়া। তবে জড়ের মধ্যেও যে চৈতন্য নাই অথবা চৈতন্যও যে জড়াচ্ছাদিত থাকেন না, তাহা নহে। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই জড়-চৈতন্যের সমাহারভূত অপূর্ব্ব বিকাশ। জড় ও চৈতন্য উভয় ক্রিয়াই পরস্পর ওতপ্রোতঃ-ভাবে বিশ্বলীলার সহিত বিচিত্রভাবে সংজড়িত। এই অনন্ত লীলা-বিকাশের মধ্যে যাহাতে বা যে বস্তুতে জড়ভাবের অংশ যত অধিক, তাহাই তত স্থূল কঠিন বা তাহা একেবারেই অচঞ্চল-প্রায়, তাহাঁকেই সাধারণে জড় বস্তু বলিয়া বুঝিয়া থাকে, এবং যাহাতে চৈতন্য ভাবের অংশ যে পরিমাণে অধিক বর্ত্তমান থাকে, তাহা সেই পরিমাণেই চেতন আখ্যাযুক্ত। সুতরাং জড়-রাজ্যের শেষ পরিণতি প্রস্তরাদিসম কঠিন স্থাবর বস্তু হইতে মনুষ্যেতর সমস্ত জীবেই অবিদ্যা বা জড়ক্রিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। মনুষ্য ব্যতীত অন্য সকল জীবই অধিকতর অবিদ্যাশ্রিত হইবার কারণ, অর্থাৎ তাহাদের অন্তরে জড়ত্বের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অধিক বিদ্যমান থাকা প্রযুক্ত, তাহারা প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া আছে, এইহেতু তাহারা প্রকৃতিবিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিতে সমর্থ নহে, কিন্তু মনুষ্য-রাজ্যের অধিকার তাহা অপেক্ষা বিস্তৃত ও উর্দ্ধে অবস্থিত। মনুষ্য কতকটা স্বাধীনভাবেই চৈতন্য-রাজ্যমধ্যে বিচরণ করিতে পারে। তাহারা ভগবদ্দত্ত চৈতন্য-বুদ্ধির সাহায্যে স্বভাবের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া যথাসাধ্য অভিনব কর্ম্মও সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। এবং সেই কর্ম্মের ফলে উন্নত বা অবনত হওয়াও তাহাদের ইচ্ছাধীন বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ উন্নত তত্ত্ববিদ্যা বা জ্ঞানাধিকার বশে মানব নিজ পুরুষার্থবলে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার পূর্ব্বক মুক্ত হইতে পারে, অথবা অন্যদিকে অবিদ্যাসেবক হইয়া ক্রমে হীন হইতে অধিকতর হীনত্বপ্রাপ্তিপূর্ব্বক পুনরায় জড়াচ্ছাদিত হইয়া জড়রূপেও

পরিণত হইতে পারে। যাহাহউক শ্রীভগবান মানবকে চেতন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ অধিকারী করিবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি দায়িত্বও প্রদান করিয়াছেন। চতুরশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণের পর জীব সৃষ্টিক্রিয়ার অবিরোধ প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বা বিধানের অনুবর্ত্তী হইয়া ক্রমে উন্নতি লাভ করে ও অবশেষে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের অধিকারীরূপে মুক্তিপদের সন্নিহিত মনুষ্যযোনিতে আসিয়া উপনীত হয়।

"ইয়ং হি যোনিঃ প্রথমা যাং প্রাপ্য জগতীপতেঃ।
আত্মা বৈ শক্যতে জ্ঞাতুংকর্ম্মভিঃ শুভলক্ষণৈঃ॥
মানুষেষু মহারাজ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রবর্ত্ততে।
নতথান্যেষু ভূতেষু মনুষ্য রহিতেষ্বিহ॥"

মুক্তিপ্রদ এই মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া জীব শুভ কর্ম্ম করিতে করিতে পরিণামে নির্ব্বাণপদ লাভ করে। মনুষ্যই ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিতে পারে, অন্য জীব তাহা পারে না।

জলপ্রবাহের মধ্যে নিমজ্জিত মানব যেমন জলের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা ক্রিয়ার বলে জলের উপর একবার ভাসিয়া উঠে, অথবা জল সকল সময়েই নিমজ্জিত জীবকে একবার উপরে ভাসাইয়া দেয়; তাহার পর জীব সন্তরণাদি কৌশলের সাহায্যেই তীরে আগমন করিতে পারে; এইরূপে তীরভূমিতে আগমন করা যেমন সেই জীবের সন্তরণাদি ক্রিয়ারূপ পুরুষার্থসাপেক্ষ, সেইরূপ প্রকৃতিমাতা সৃষ্টি-প্রবাহে পতিত সকল জীবকেই একবার মনুষ্য-যোনিতে উপনীত করিয়া দিয়া থাকেন; তখন মানবরূপ-প্রাপ্ত জীব পূর্ব্বোক্ত সন্তরণাদি ক্রিয়ার ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচাররূপ ক্রিয়া সহযোগে বা স্বীয় পুরুষার্থ বলে ক্রমে মুক্তি-স্বরূপ সংসার-সাগরের তীরের দিকে অগ্রসর হইতে পারে এবং পরিণামে জীবের চির-বাঞ্ছিত মুক্তিপদ লাভ করিতেও সমর্থ হয়। সুতরাং চৈতন্য-জ্ঞানাধার হিতাহিত বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানবের পক্ষে তখন মুক্ত হওয়া বা না হওয়া তাহার নিজেরই ইচ্ছাধীন বলিতে হইবে।

ঐশ্বর্য্যশালী পিতা যেমন তাঁহার সন্তানবর্গের মধ্যে তাঁহার

স্বোপার্জ্জিত ধনসম্পত্তি সমভাবে বিভাগ করিয়া দিয়া থাকেন; তাহার পর সেই সন্তানগণ স্ব স্ব প্রবৃত্তি বা ইচ্ছানুসারে তাহার সদ্ব্যবহার কিংবা অপব্যবহার করিয়া কেহ সেই মূলধনের বৃদ্ধির সহিত স্বয়ং অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারেন, অথবা কেহ পিতৃপ্রদত্ত সেই ধনের অপব্যবহার করিয়া ক্রমে একেবারে নিঃস্ব হইয়া পরিণামে সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী বা ভিক্ষোপজীবীরূপে নিত্য অসংখ্য দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন; সেইরূপ পরম পিতা শ্রীভগবান হিতাহিত-জ্ঞান-বিচাররূপ সামর্থ্য বা চৈতন্যশক্তি স্বরূপ অমূল্য মূলধনসহ তাঁহার সাক্ষাৎ স্বরূপ-সন্তান মনুষ্যমাত্রকেই সংসারবিপণীতে প্রেরণ করিতেছেন। মানব স্ব স্ব ইচ্ছাবলে তাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা ক্রমে মুক্তিপদরূপ ব্রহ্মৈশ্বর্য্য লাভ পূর্ব্বক ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবানরূপে পরিণত হইতে পারেন, অথবা তাহার অযথা ব্যবহার দ্বারা ঘোর দুঃখ-কষ্টময় অবনতির অতি নিম্ন-ভূমিতে পুনরায় পতিত হন্। ত্রিতল গৃহের মধ্যস্থলে দ্বিতলের কোন সোপানমধ্যে একটী গোলক রাখিয়া দিলে, গোলকটী এক সোপান হইতে অন্য সোপানে পতিত হইতে হইতে ক্রমে নিম্নতলে বা নিম্নভূমিতে আসিয়া পড়িবে। জড়ময় স্থূলবিষয় সমূহ সততই এইরূপ নিম্নগামী, কিন্তু-চৈতন্য-শক্তি সম্পন্ন মানব সেই দ্বিতল গৃহের সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া স্বইচ্ছায় নিম্নেও নামিয়া আসিতে পারে, অথবা ইচ্ছা করিলে ত্রিতলে বা উপরে যাইবার সোপানপথ অবলম্বন করিয়া উপরেও উঠিতে পারে। মানবের পক্ষে উভয় দিকেই পথ সতত উন্মুক্ত রহিয়াছে। মানব মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে কূপপ্রস্তুত করিয়া যেমন নিম্নে নামিয়া যাইতে পারে, এবং ইচ্ছা করিলে তাহার সেই নিজকৃত কূপ-সলিলে ডুবিয়া মরিতেও পারে; তেমনই ইষ্টকের উপর ইষ্টক বা প্রস্তরের উপর প্রস্তর রাখিয়া গগণস্পর্শী সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চূড়ার উপর উঠিয়া বিশ্বরাজ্যের দিগ্‌দিগন্তের অনন্ত দৃশ্য দেখিয়া আনন্দিত হইতেও পারে। সুতরাং চৈতন্যশক্তি ও বিবেকযুক্ত

মানবের পক্ষে যেমন আধ্যাত্মিক জগতের ও লৌকিক জগতে উভয়দিকেরই অসংখ্য পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে, তেমনই মানব ইচ্ছ করিয়া একদিকে ঋষিপ্রোক্ত স্বধর্ম্মাচরণের সংযোগে আত্মোন্নতি করিয়া মুক্ত হইতেও পারে, অথবা অন্যদিকে ক্রমশঃ অবনতির পথে সংসার বিমুগ্ধ হইয়া ভীষণ দুঃখ-যন্ত্রণাও ভোগ করিতে পারে তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—

"ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধং গমনমধস্তাদ্ভবত্যধর্ম্মেণ ।"

ধর্ম্মের দ্বারাই জীব ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারে এবং অধর্ম্মে আচরণ ফলে জীব পুনরায় অধোগতি প্রাপ্ত হইতেও পারে এই সকল বিষয় বিচার করিয়া সকল মহর্ষিই একবাক্যে স্থি করিয়াছেন যে, যে সমুদায় ধর্ম্মকর্ম্ম দ্বারা মানব অবাধে আত্মোন্নতি লাভ করিয়া মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহাই মানবে একমাত্র শ্রেষ্ঠধর্ম্ম এবং যে সকল ক্রিয়া সেইপথে অগ্রসর হইবা পক্ষে বাধা প্রদান করে বা জীবের ভববন্ধনাদির হেতুরূপে নিম্ন গামী অথবা ঈশ্বরবিমুখী পথে জড়ত্বের দিকে ক্রমশঃ লইয় যায়, তাহাই অধর্ম্ম পদবীবাচ্য ।

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধির দ্বারা মানবের সেই মুক্তিমার্গ ক্রমে সরল ও প্রশস্ত হয় এবং তমোগুণের বৃদ্ধিতে তাহা পুনরায় সংকীর্ণ ও কণ্টকিত হইয়া পড়ে। সেইহেতু শাস্ত্রকারগণ সত্যাদিলক্ষণযুক্ত বা ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুগত সমস্ত কর্ম্মের আদেশ ও নিষেধ দ্বার বিবিধ আচারমূলক ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাধন বিধানের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া গভীর নিশা ও নিশান্ত পর্য্যন্ত সকল সময়ের জন্য পান ভোজন আহার ব্যবহা শয়ন উপবেশন দর্শন শ্রবণ এমন কি মননাদি সকল কর্ম্মাকর্ম্মে বিধিনিয়ম নিরূপণ করিয়া সকল বস্তু ও জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মে সম্বন্ধও গভীর বিজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন।

সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃতি, উদারতা ও ব্রহ্মবিদ্যা।

পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বা আদিগুরু স্ব স্ব প্রচারিত ধর্ম্ম যে সকল নিয়মবদ্ধ করিয়া গঠন করিয়াছেন, তাহাদের পরস্পর তুলনাসহ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সকলেরই সাধারণ বিধি নিয়ম প্রায় একরূপ, এবং সেই সাধারণ বিধিগুলি এই অতি প্রাচীন ঋষিপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মেরই আংশিক ছায়ামাত্র বা ইহার কতকগুলি প্রাথমিক স্থূল বিধি-ব্যবস্থা লইয়াই সে গুলি গঠিত বলা যাইতে পারে। তদ্ব্যতীত প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানানুকূল ক্রমোন্নত সাধন-পন্থার সহিত ঐ সকল ধর্ম্মের কোনও রূপ সম্বন্ধ আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক. সাধারণের অবগতির জন্য সনাতনধর্ম্মের প্রকৃতিমূলক একটী সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

সনাতনধর্ম্মের মূল ভিত্তি অনাদি বেদ বা বেদবাক্য, তাহাই একমাত্র প্রামাণ্য। শাস্ত্র বলিয়াছেনঃ—

"তদ্ বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্॥"

অর্থাৎ বেদোক্ত যে বাক্য তাহাই প্রামাণ্য বা যে উপায়-দ্বারা যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাকেই প্রামাণ্য বলে। এইহেতু প্রকৃত জ্ঞান বা সত্য জ্ঞানকেই বেদ বলা হইয়া থাকে। বেদ-ভাষ্য মধ্যে শ্রীমৎ মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন—

"অনধিগতা বাধিতার্থ বোধকঃ শব্দো বেদঃ।"

স্থূল ইন্দ্রিয় সহযোগে লৌকিকভাবে বা তন্মূলক অনুমানের দ্বারা যাঁহার সত্যতা নিশ্চয় পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় না, সেই ব্রহ্ম-বস্তু জ্ঞাপনার্থপ্রবৃত্ত নিশ্চয়াত্মক শব্দকে বেদ কহে। অতএব ব্রহ্মই বেদ বা বেদই ব্রহ্ম। শ্রীমন্মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন :—

"আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ।"

'আপ্ত' শব্দের অর্থ ঠিক জানা বা পাওয়া। যে শব্দ বা

বাক্যের দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধি হয়; তাহাই আপ্ত-প্রমাণ যাঁহারা ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য ও প্রতারণা-বিরহিত, তাঁহারাই আপ্ত না অভিহিত। কোনও কোনও ঋষিবাক্যে প্রকাশ আছে বেদই প্রকৃত পক্ষে আপ্ত। সেই কারণ বেদাদিতন্ত্রবিহি শাস্ত্রোপদেশই প্রকৃত পক্ষে আপ্ত-বাক্য বা শব্দ-প্রমাণ বলি কথিত হইয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—

"ব্রহ্মাদ্যাঋষি পর্য্যন্তাঃ স্মারকা নতু কারকাঃ।"

অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে ঋষি পর্য্যন্ত কেহই এই আ বাক্য-মূলক শাস্ত্রসমূহের প্রণেতা নহেন, সকলেই ইহার স্মারক মাত্র পূজ্যপাদ মহর্ষি ও মহাপুরুষগণ নিত্যস্থিত জ্ঞানরাজ্য হই প্রয়োজন অনুসারে অভ্রান্ত বেদাদি শাস্ত্রের আবিষ্কার মাত্রই করি থাকেন। কাল-চক্রের তীব্র নিষ্পেষণে যুগে যুগে যুগধর্ম্মোপযো সনাতন শাস্ত্রসমূহের আবির্ভাব, তিরোভাব ও আবিষ্কারই হই থাকে। অসাধারণ দৈবীকলা-পরিপুষ্ট মহাপুরুষবৃন্দ দেবভা তাহা সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন। বেদ ঋষি-পরম্পরা-ক্র নানাভাবে রক্ষিত বা সম্প্রসারিত হইলেও, ইহা সেই নিত জ্ঞানেরই প্রকাশক এবং প্রেরকস্বরূপ। ইহাই ব্রহ্মবিদ্যা বা বি বিজ্ঞান, অথবা ইহাই সেই বিশ্বাধার সাক্ষাৎ পরমপুরুষস্ব নিত্যবস্তু। ইহার প্রণেতা বলিতে হইলে তাঁহাকেই নি করিতে হইবে। কারণ শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—

"যস্যজ্ঞানং তেনৈব প্রণীতং।"

এই জন্যই বেদ ঈশ্বরসৃষ্ট বলা হইয়া থাকে। সুতরাং অপৌরুষেয় এবং স্বতঃপ্রমাণ। ইহাই সনাতনধর্ম্মের আদি মূল ভিত্তি এবং তন্ত্র ইহারই অন্ত বা চূড়াস্বরূপ। বেদ সনা শাস্ত্রের ঔপপত্তিক (Theoretical) অংশের মূল-বিজ্ঞান তন্ত্র তাহারই ক্রিয়াসিদ্ধ (Practical) অংশ বা সাধনবিধা

অতএব বেদ ও তন্ত্র সমগ্র সনাতন শাস্ত্রের আদি ও অন্ত বা উভয় প্রান্তস্বরূপ এবং স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতিকে সেই প্রান্তদ্বয়ের অন্তর্নিহিত সনাতনধর্ম্মের বিবিধ ব্যখ্যাশাস্ত্র বলা যাইতে পারে। বেদ যেমন অপৌরুষেয় বা ঈশ্বর-প্রণীত অনাদি বলিয়া একবাক্যে প্রতিপন্ন হইয়াছে, পুরাণাদি শাস্ত্রগুলি ঠিক তাহা নহে, তাহা স্পষ্ট ঋষিপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু তন্ত্র পুরাণাদির ন্যায় কোনও ঋষিপ্রণীত বলিয়া উল্লেখ নাই। ইহা পরম যোগী বৃষভবাহন মহাদেব কর্ত্তৃক প্রণীত বা শিবোক্ত বলিয়া চির-প্রসিদ্ধ। আচার্য্য যাস্ক বলিয়াছেন "বৃষভবাহন শব্দান্তর্গত "বৃষভ" শব্দের প্রকৃত অর্থ "বর্ষণকারী" (নিরুক্ত ৯।২২) (এস্থলে বৃষভ অর্থে ষণ্ড বা ষাঁড় নহে) এতাবতা বর্ষণকারী বেদই বৃষভ নামে খ্যাত অর্থাৎ বেদে সেই ব্রহ্মজ্ঞানই অবিরত বর্ষিত হইয়াছে।" আবার 'বৃষ' ধর্ম্মেরও পর্য্যায় শব্দ বলিয়া অমর কোষে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"স্যাদ্ধর্ম্মমস্ত্রিয়াং পুণ্যশ্রেয়সী সুকৃতং বৃষঃ।"

এবং "বাহন" শব্দের ধাতুগত অর্থ অনুসারে বুঝিতে পারা যায়, (বহ — প্রাপণে + ঞ = বাহি + অনট্) যাহাদ্বারা প্রাপ্ত বা পরিচিত হওয়া যায়, তাহাকেই বাহন বলে। অতএব "বৃষভ অর্থাৎ ধর্ম্ম বা বেদরূপ বাহনই যাঁহাকে লোকমধ্যে প্রাপ্ত বা বিদিত করিয়া দেয়, এই বৃষভ, ধর্ম্ম বা বেদই যাঁহার বাহনস্বরূপ, সেই 'বৃষভবাহন' বা সেই মহাদ্যোতনাত্মক দেবই পরব্রহ্ম মহাদেব নামে প্রখ্যাত।" এইরূপ বৃষভবাহন অর্থাৎ বেদপ্রতিপাদ্য মহাদেব বা সদাশিবই তন্ত্রের বক্তা; সুতরাং বেদের ন্যায় তন্ত্রও আপ্তবাক্য। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

"ন বেদঃ প্রণবং ত্যক্ত্বা মন্ত্রো বেদ সমুত্থিতঃ।
তস্মাদ্বেদপরোমন্ত্রো বেদাঙ্গশ্চাগমঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ বেদ প্রণব পরিত্যক্ত নহে, প্রণব-মন্ত্র বেদ হইতেই

সমুত্থিত হইয়াছে, আবার প্রণব মন্ত্র বেদাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রতিপন্ন হইয়াছে, অথবা সেই প্রণব-মন্ত্রই বেদপ্রসূ। "প্রণব-রহস্যে" তাহা বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। আগম বা তন্ত্র সেই প্রণবাত্মক বেদাঙ্গ বলিয়া কথিত। শ্রীমন্মহর্ষি হারীত-বচনে উল্লেখ আছে ঃ—

"অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। শ্রুতিপ্রমাণকো ধর্ম্মঃ।
শ্রুতিস্তু দ্বিবিধা, বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।"

অর্থাৎ এইবার আমি ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব। ধর্ম্ম শ্রুতিপ্রমাণক। সেই শ্রুতি দ্বিবিধা, বৈদিকী এবং তান্ত্রিকী। শ্রীভগবান্ মনু বলিয়াছেন ঃ—

"শ্রুতিস্তু বেদবিজ্ঞেয়ঃ।"

অর্থাৎ শ্রুতিকে বেদ বলিয়া জানিবে। "সাধনপ্রদীপে"ও এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। অতএব বেদ যেমন ঈশ্বর-প্রণীত অনাদি শাস্ত্র, তন্ত্রও তেমনি সদাশিব-প্রণীত অন্ত বা শেষ ও অনন্ত শাস্ত্র। অর্থাৎ তন্ত্র অধিকারী-ভেদে নানা ভাবে ও নানা অংশে বিভক্ত। যাহা হউক, আর্য্যের এই সুপবিত্র সত্য বেদমূলক ও তন্ত্রাত্মক সমগ্র শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সনাতনধর্ম্মের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—'দান,' 'তপ' ও 'যজ্ঞ' রূপ ত্রিবিধ অঙ্গই সাধারণতঃ এই বিরাট সনাতনধর্ম্ম-বিটপীর তিনটী প্রধান শাখা, এবং ইহাকেই এই অনাদি ধর্ম্মের যথার্থ মূল প্রকৃতি বলা যাইতে পারে। শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—

"যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।"

অনুসন্ধিৎসু পাঠকের অবগতির জন্য মনীষিবৃন্দের আত্মোন্নতিকর উক্ত দানধর্ম্ম, তপোধর্ম্ম ও যজ্ঞধর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ দানধর্ম্ম,—ইহা সাধারণতঃ তিন প্রকার; যথা—

অর্থদান, বিদ্যাদান ও অভয়দান। সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের ভেদে এই অর্থ, বিদ্যা ও অভয়দানের প্রত্যেকটী আবার তিন তিন প্রকার হওয়ায়, দানধর্ম্ম সর্ব্বশুদ্ধ নয় প্রকার বা এই দানধর্ম্ম নয় অঙ্গ বিশিষ্ট বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে।

দ্বিতীয়তঃ তপোধর্ম্ম,—তপ বা তপস্যা অর্থাৎ প্রাকৃতিক শক্তি বা বেগসমূহকে দমন করিয়া অপেক্ষাকৃত দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হওয়াকেই তপোধর্ম্ম কহে। শম-দমাদি সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ-করণের নাম তপস্যা। শম-সাধনায় মনোনিগ্রহ, এবং দম-সাধনায় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রাপ্ত হয়। কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে এই তপ ত্রিবিধ, এবং পূর্ব্বকথিত দান-ধর্ম্মের ন্যায় সত্ত্ব ও রজঃ আদির বিভেদানুসারে উক্ত ত্রিবিধ তপের প্রত্যেকের আবার তিন তিন প্রকার ভেদ হওয়ায় তপোধর্ম্মও নয় অঙ্গে বিভক্ত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ যজ্ঞধর্ম্ম,—যজ্ঞ বা যাগধর্ম্ম। পূর্ব্ব-বর্ণিত দান ও তপের ন্যায় ইহারও তিনটী প্রধান ভেদ আছে যথা;—কর্ম্মযজ্ঞ, উপাসনাযজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ। এই তিন অঙ্গের আবার নিম্নলিখিত-রূপ বহু উপভেদ আছে।

১ম। কর্ম্মযজ্ঞ—ইহা সাধারণতঃ ছয়টী উপাঙ্গ বিশিষ্ট, যথা—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, অধ্যাত্ম, অধিদৈবক ও অধিভূত কর্ম্ম-রূপ ছয় প্রকার কর্ম্মযজ্ঞ। (১) অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দনাদি রূপ নিত্য-কর্ম্ম, (২) তীর্থ-পর্য্যটনাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম, (৩) ধন-পুত্রাদি-কামনামূলক কাম্যকর্ম্ম, (৪) আত্মোন্নতি ও দেশের কল্যাণ বা উন্নতিকর অনুষ্ঠানাদিরূপ আধ্যাত্মিক কর্ম্ম, (৫) বাস্তুযাগাদিরূপ দেব-প্রীতিকর আধিদৈবিক কর্ম্ম এবং (৬) অতিথি অভ্যাগত ও ব্রাহ্মণ-ভোজনাদিরূপ আধিভৌতিক কর্ম্ম; এইগুলিই আর্য্যের কর্ম্মযজ্ঞ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে।

২য়। উপাসনাযজ্ঞ:—ইহা সাধারণতঃ পঞ্চবিধ উপাঙ্গ

বিশিষ্ট। যথা—(১) নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা, (২) সগুণ ব্রহ্মোপাসনা অথবা পঞ্চ দেবোপাসনা,* (৩) লীলা-বিগ্রহোপাসনা বা অবতারবৃন্দের উপাসনা, (৪) ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণের উপাসনা এবং (৫) উপদেবতাদির উপাসনা। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রানুগত এই পাঁচ প্রকার উপাসনাই চির-প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত সাধন-পদ্ধতি অনুসারে 'মন্ত্র,' 'হঠ,' 'লয়' ও 'রাজ' যোগ ভেদে এই উপাসনাযজ্ঞের উচ্চতর চতুর্ব্বিধ ক্রিয়াবিধান নির্দ্দিষ্ট আছে।

৩য়। জ্ঞানযজ্ঞ—ইহা সাধারণতঃ তিন প্রকার। যথা—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। জ্ঞানতন্ত্র ও বেদান্তদর্শনাদি শাস্ত্রে একভাবেই উক্ত আছে যে,—(১) শ্রবণ;—শাস্ত্র ও শ্রীগুরুর মুখ হইতে শ্রবণ করিতে হয়।

"ষড়বিধ লিঙ্গৈরশেষবেদান্তানামদ্বিতীয় বস্তুনি তাৎপর্য্যাবধারণং॥"

অর্থাৎ ছয় প্রকার লিঙ্গ† দ্বারা অদ্বিতীয় বস্তুতে বা ব্রহ্মে সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য্য অবধারণের নাম শ্রবণ। এইরূপ (২) মনন;—জ্ঞানভাবে অর্থাৎ জ্ঞানতন্ত্ররূপ বেদান্তের অবিরোধ যুক্তি দ্বারা সর্ব্বদা শ্রুত অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু চিন্তনের নাম মনন। এবং (৩) নিদিধ্যাসন;—জ্ঞানভাবে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান-বিরোধী দেহাদি জড় পদার্থের জ্ঞান পরিহারপূর্ব্বক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর অবিরোধী

* মন্ত্রযোগ রহস্যান্তর্গত "পঞ্চাঙ্গসেবন" দ্রষ্টব্য।

† ষট্ প্রকার লিঙ্গ যথা:—(১) 'উপক্রমোপসংহার' অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বস্তুর আদি ও অন্তে সেই বস্তুরই প্রতিপাদন করা। (২) 'অভ্যাস,' অর্থাৎ যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য, সেই প্রকরণে সেই বস্তুকে পুনঃপুনঃ প্রতিপাদন করা। (৩) 'অপূর্ব্বতা,' অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রমাণাতিরিক্ত প্রমাণের অবিষয়রূপে সেই বস্তুর প্রতিপাদনের নাম অপূর্ব্বতা। (৪) 'ফল,' অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রয়োজন শ্রবণের নাম ফল। (৫) 'অর্থবাদ,' অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রশংসা শ্রবণের নাম অর্থবাদ। (৬) 'উপপত্তি,' অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিপাদনের যুক্তির নাম উপপত্তি।

জ্ঞান-প্রবাহকে নিদিধ্যাসন বলে।

এই জ্ঞানযজ্ঞেরও অঙ্গ ও উপাঙ্গাদির সত্ত্বাদি গুণ ভেদে তিন তিনটী করিয়া উপভেদ আছে। সুতরাং কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানাদি সমষ্টির ত্রিগুণ ভেদে সর্ব্বশুদ্ধ দ্বিসপ্ততি প্রকার উপাঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। উহার যে কোনও অঙ্গ ব্যষ্টিভাবে অর্থাৎ ব্যক্তি বিশেষের আত্মোন্নতির জন্য যখন অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাহাকে যজ্ঞ বলে এবং সমষ্টি বা সমগ্র জীব-কল্যাণের জন্য যখন অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাহাকে মহাযজ্ঞ বলে। এই যজ্ঞ ও মহা-যজ্ঞের সাধনাত্মক সনাতনধর্ম্মের কোন একটীর রীতিমত সাধনা করিলেই মুক্তিপথে অগ্রসর হওয়া যায়। সেইকারণ ধৈর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, পিতৃপূজা, রাজভক্তি, সেবাধর্ম্ম, অহিংসা, জ্ঞানযোগ, সত্যপ্রিয়তা, স্বার্থত্যাগ, গুণপূজা, নিয়মপালন ও সত্যানুসন্ধিৎসা প্রভৃতি সনাতনধর্ম্মের উপাঙ্গরূপ ধর্ম্ম-প্রবৃত্তিসমূহের কোন কোনও সাধনা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ধর্ম্ম বা উপধর্ম্মরূপে ক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সেই কারণেই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সমস্তই এই আদি বা সনাতন-ধর্ম্মেরই ছায়াবলম্বনে গঠিত। অতএব সনাতন সার্ব্বভৌম গুণ-সম্পন্ন এই উদার প্রাকৃতিক-ধর্ম্মের সহিত কাহারও বিরোধ হইতে পারে না। ইহা প্রকৃতই সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বজীব-কল্যাণকর। ফলতঃ বিশ্বের সকল ধর্ম্মই যে, ইহার বিরাট কক্ষের অন্তর্ভূক্ত, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই নির্ব্বি-রোধ মূল ধর্ম্মের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, নিন্দা বা ক্রোধাদির তিল-মাত্র লক্ষণ কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। তবে ভ্রম বা অজ্ঞানতা-বশে যদি কোনও স্থলে তাহার কিছুমাত্র আভাষ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা অবশ্যই প্রশংসা-যোগ্য নহে! বহু প্রাচীন ধর্ম্মমন্দির, কালবশে স্থানে স্থানে জীর্ণ হইয়াছে, সেই জীর্ণ অংশের 'ফাঁকে' 'ফাটলে' যে, দুই দশটা কৃমি, কীট, শ্বাপদ, সরিস্থপ আশ্রয় লইবে, তাহাতে

আর বিচিত্রতা কি? এইরূপই অতি প্রাচীন প্রাকৃতিক বিরাট সনাতনধর্ম্মের মধ্যে কোথাও কিছু বিকৃত হওয়া অসম্ভব নহে। দুই দশ জন ভ্রান্ত অনভিজ্ঞ ও অপরিণামদর্শীর সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ধর্ত্তব্য নহে। সেরূপ স্থলে তাহার গূঢ় মর্ম্মার্থ উপলব্ধির জন্য জ্ঞানী গুরু বা অভিজ্ঞ শাস্ত্রদর্শীর আশ্রয় গ্রহণ করাই অনভিজ্ঞ সাধকের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহা হউক, সনাতনধর্ম্মান্তর্গত পূর্ব্বোক্ত সাধারণ ধর্ম্মবিধির সহিত কোন ধর্ম্মের কোনও রূপ মতান্তর হইতে পারে না; কিন্তু বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম-বিধানের সহিত পরস্পর মতভেদ থাকা অবশ্যম্ভাবী! উদাহরণরূপে প্রবৃত্তিমার্গের সহিত নিবৃত্তিমার্গের, গৃহস্থাশ্রমীর সহিত সন্ন্যাসীর, সঞ্চয়ীর সহিত ত্যাগীর, সাত্ত্বিক আচারের সহিত রাজসিক বা তামসিক আচারের অবশ্যই অসদ্ভাব হইবে বলা যাইতে পারে; এইরূপ আচার ও অনুষ্ঠান-বহুল মতাবলম্বী প্রাথমিক সাধকদিগের সহিত উপেক্ষিতাচারী বা আচারত্যাগী উচ্চতর যে কোনও সাধকসম্প্রদায়ের বাহ্য-মতানৈক্য নিশ্চয়ই আছে এবং তাহা চিরকাল সমভাবে থাকিবেও! সেই কারণেই শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"অধিকার-বিরোধ অবস্থায় বিভিন্ন কর্ম্মাসক্তদিগের বুদ্ধি-ভেদ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।" অর্থাৎ যে, যে অবস্থার সাধক, তাহাকে তাহার অবস্থার বা অধিকারের অনুরূপ শাস্ত্ররহস্য উপদেশ করাই সমীচীন। তাহাদ্বারা সাধকের সাধনাবিষয়ে ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতে থাকিবে। কিন্তু তদ্‌পরিবর্ত্তে উচ্চতর বা উচ্চতম রহস্যযুক্ত উপ-দেশাবলী প্রদত্ত হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে সে সাধক তাহার উদ্দেশ্য ও যথার্থ ক্রিয়া আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, ফলে তাহার বিকৃতানুভূতির দ্বারা অনেক স্থলে অনিষ্টের আশঙ্কাই অধিক হইয়া পড়ে। আধার বুঝিয়া আধেয় বিন্যাস করাই আর্য্যশাস্ত্রসমূহের অন্যতম আদেশ। সনাতনধর্ম্ম তাহাই অধিকার ভেদে অতি বিস্তৃতভাবে ও বিভিন্ন উপায়ে বর্ণিত হইয়াছে; এই হেতু পৃথিবীর

অন্যান্য ধর্ম্ম-বিধানের সহিত বিচারপূর্ব্বক তুলনা না করিলে, সনাতনধর্ম্মের যে কোনও অঙ্গ বা উপাঙ্গ সহসা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়া অনুমিত হওয়া বিচিত্র নহে ! অন্য দিকে সনাতনধর্ম্মের মূল লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক যে সকল ক্রিয়াদ্বারা মনুষ্যের ঐহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি এবং অন্তে মুক্তিলাভ হইতে পারে, তাহারই নাম ধর্ম্ম। পৃথিবীর কোন প্রান্তে এমন কোনও ধর্ম্মমত নাই, যাহার সহিত এই লক্ষণ কয়টীর কিছু না কিছু সমাবেশ না হইতে পারে। যাহা হউক, সনাতনধর্ম্ম ও সাধারণ উপধর্ম্মসমূহের মধ্যে প্রভেদ এই যে, যাহাতে অনাদি বেদ-তন্ত্ররূপ আপ্তবাক্য, আচার, বর্ণ ও আশ্রমবিধান স্বীকৃত হয় ; যাহাতে রজঃ-বীর্য্যের বিশুদ্ধতা রক্ষাকল্পে সতীত্ব ও ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য বর্ত্তমান থাকে; এবং যাহার সকল বিষয়ই আধ্যাত্মিক-লক্ষ্যযুক্ত ও ক্রমোন্নতি-মূলক তত্ত্বজ্ঞানসহ মোক্ষ-বিষয়ক, তাহাই সনাতনধর্ম্ম ; তাহাই সেই বিশ্ববরেণ্য আর্য্য ঋষি-মুনি-প্রবর্ত্তিত আদি বা প্রাকৃতিক ধর্ম্মের বিশেষত্ব ! আর যে সকল ধর্ম্মমতে এইরূপ গূঢ় বিষয়সকলের অস্তিত্ব নাই বা এইগুলির প্রতি আদৌ লক্ষ্য নাই, কেবল পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মোপাঙ্গের কোন কোনও বিধানসহ আত্মোন্নতির স্থূল ধারাই নির্দ্ধারিত আছে, তাহাই বর্ত্তমান প্রচলিত বিভিন্ন উপধর্ম্ম নামে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ-নির্দ্দিষ্ট বিরাট ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যসংযুক্ত সনাতনধর্ম্মের সাধারণ বিধানগুলি এমন সহজ ও সর্ব্বব্যাপকতা গুণসম্পন্ন যে, তাহা অধিকার-ভেদে সর্ব্ব স্থানের সকল মনুষ্যের মধ্যেই সমানভাবে হিতকরী, পতিতপাবনী জাহ্নবীর ন্যায় সর্ব্বত্রই সমানভাবে কল্যাণ-কারিণী ; গঙ্গোত্তরী হইতে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত ভারতের নানা প্রদেশ বিধৌত ও পবিত্র করিতে করিতে মা আমার গঙ্গারূপে যেমন চিরকাল সমভাবেই চলিয়াছেন,

কোন স্থানে, কোন প্রদেশেই তাঁহার পতিতোদ্ধারিতা শক্তির ন্যূনাধিক্য নাই, তবে কোথাও অনুকূল ও প্রতিকূল ভূমি অনুসারে যেমন তাহার বিস্তার এবং গভীরতার আধিক্য বা অল্পতা প্রতীত হইয়া থাকে; তেমনই সনাতনধর্ম্মের ছায়া বা উপাঙ্গ লইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থলে যে সমস্ত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন কোনটীর দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিজ্ঞানের ও সাধন-পন্থার বিস্তৃতি ও গভীরতা কোথাও অধিক, কোথাও বা অল্প পরিলক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিধি নিয়ম সম্বন্ধে এইরূপ ভেদই স্বাভাবিক, নতুবা ধর্ম্মস্বরূপ ধর্ম্মের সার্ব্বভৌম লক্ষ্য সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞের বিবিধ ভেদের মধ্যে কোনও না কোনটীর সম্পর্কে অথবা তপ ও দানধর্ম্মের কিছু কিছু সম্বন্ধে কিম্বা——

"ধৃতিঃ ক্ষমাদমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়ং নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥"

ধৃতি, ক্ষমা, দম, আস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ রূপ এই দশবিধ ধর্ম্মলক্ষণের কোন কোনটীর সম্বন্ধে পৃথিবীর সমস্ত জাতি, সকল ধর্ম্ম ও সমাজবদ্ধ মনুষ্যবর্গ সমানভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতির অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিরাট সনাতনধর্ম্মের এইরূপ সর্ব্বব্যাপকতা প্রকৃতিমূলক অঙ্গ ও উপাঙ্গসমূহের অধিকারানুরূপ যথাবিধি সাধনাদ্বারা সাধক কালে তাহার চিরবাঞ্ছিত ঋষিপ্রোক্ত সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্ববর্ণিত সৎ বা সদ্ভাবের এবং চিৎ বা চিদ্ভাবের সম্মিলনেই আনন্দ-ভাবের স্বরূপ ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব যাহা প্রকৃতিরাজ্যের সিংহাসনরূপ মানব-আস্তেই হাস্যরূপে প্রথম প্রকটিত হয়, তাহা প্রকৃতির কোনও স্থলে জীব ও জড়ে কোথাও কোন কালেই পরিলক্ষিত হয় না। মানব

বিশ্বমঙ্গলময়ী প্রকৃতি-মাতার সেই অপূর্ব্ব প্রথম দান ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বরূপ আনন্দকে আপনার একমাত্র মূলধর্ম্মরূপে প্রাপ্ত হইয়া, বিধি-নিষেধ-মূলক আচার, ক্রিয়া ও উপাসনাদির অনুষ্ঠান-সহযোগে উৎকর্ষ বিধান করিলে, ক্রমে পরমানন্দপ্রদ উক্ত ব্রহ্ম-বিদ্যার সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে পারে। এই সনাতনধর্ম্মের মধ্যেই সেই ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অতি বিচিত্র ও ক্রমোন্নত সাধন-পদ্ধতি বিনির্ণীত হইয়াছে। "সাধনপ্রদীপ" ও "গুরুপ্রদীপে" তাহারই সাধন-পন্থা পূজ্যপাদ শ্রীগুরুমণ্ডলীর আদেশক্রমে ক্রমোন্নতভাবে কিয়ৎপরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে এই "জ্ঞানপ্রদীপে" তত্তদ্‌বিষয়ের সূক্ষ্মতম বিচারসহ ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক উচ্চজ্ঞান-ক্রিয়ার সম্বন্ধেই যথাসাধ্য বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয়োল্লাস।

যোগসমাহার।

গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর পক্ষে কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান-বিধি।

পূর্ব্ব পূর্ব্বখণ্ডের অনেক স্থলেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, "ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং তৎপরে জ্যোতিরোম্ ইতি।" ইচ্ছা, ক্রিয়া, পরে জ্ঞান-শক্তির বিকাশ হইলেই, সাধক জ্যোতিঃ-স্বরূপ ওঁ প্রণব বস্তুর উপলব্ধির অধিকারী হইবেন। অতএব উচ্চ সাধকের পক্ষে জ্ঞানই প্রধান বা সাধনার শ্রেষ্ঠতম বস্তু। জ্ঞানই সাক্ষাৎ নির্ব্বাণের স্বরূপ অথবা জ্ঞান হইতেই জীবের প্রকৃত মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন :— "জীবের মুক্তিপ্রদ সেই জ্ঞান দ্বিবিধ।" যথা তটস্থ জ্ঞান ও স্বরূপ জ্ঞান। ইহা আবার গৃহী ও উদাসীন ভেদে ভিন্ন ভিন্ন

রূপে অবলম্বনীয়। অর্থাৎ সংসারী সাধকের পক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্বখণ্ডে যেরূপ বর্ণিত আছে, সেইরূপই প্রথমে ইচ্ছা, পরে কর্ম্ম, তৎপরে জ্ঞানের ক্রমোন্নত সাধনা করিতে হইবে। এক্ষণে বলিয়া রাখা আবশ্যক, এই ইচ্ছা শব্দই গৃহীর পক্ষে প্রকৃত কর্ম্ম-পদবী বাচ্য—অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক ও দানাদি পুণ্যপ্রদ বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেহ ও চিত্তশুদ্ধির উপায় অবলম্বন মাত্র। তাহাই "সাধনপ্রদীপে" বেদাচার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়া শব্দ গৃহীর পক্ষে উপাসনা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ দেহ ও মন উক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের ফলে কিয়ৎ-পরিমাণে বিশুদ্ধিতা লাভ করিলে ক্রিয়া বা উপাসনার অধিকারী হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ক্রিয়া ও মন্ত্রযোগাদি সাধনের প্রাথমিক অনুষ্ঠান যাহার দ্বারা ভগবৎ-বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়, তাহাই সেই ব্রহ্ম-যোনি বিশ্বশক্তির উপাসনা মাত্র। তাহাই "সাধনপ্রদীপে" বৈষ্ণবাদি আচার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অনন্তর ক্রমে অবিরত সাধনার ফলে, যে ভাবে সাধক নিত্যানিত্য বস্তুর উপলব্ধি করিতে থাকেন, তাহাই তাঁহাদের জ্ঞানাধিকার জানিতে হইবে। অর্থাৎ গৃহস্থের পক্ষে এইভাবে ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান, বা কর্ম্ম, উপাসনা, ও শেষে জ্ঞানের সাধনা অবলম্বনীয়। কিন্তু সন্ন্যাসী-সাধকের পক্ষে সমস্তই যেন তাহার বিপরীত, বা সংসারীর উক্ত জ্ঞানাধিকারের পর হইতেই তাঁহাদের সাধনার ক্রম আরম্ভ হইবে। সংসারী অবিরত সাধনার ফলে যে সময় জ্ঞানাধিকার প্রাপ্ত হইলেন, উদাসীন বা সন্ন্যাসমার্গী তাহার পর হইতেই বা উচ্চতর জ্ঞানমার্গ হইতেই তাঁহাদের কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবেন। সুতরাং জ্ঞানই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বনীয় বস্তু বলিতে হইবে। বাস্তবিক একেবারে ত কেহ সন্ন্যাসী হন না, গৃহস্থ হইতেই সকলকে সন্ন্যাসী হইতে হয়, অতএব গৃহস্থাশ্রমই যে সকলের পক্ষে প্রাথমিক শিক্ষাপীঠ, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সন্ন্যাসীকেও

সংসারের মধ্যেই জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক যথারীতি লালিত, পালিত ও শিক্ষিত হইতে হয়, ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্যাদি আশ্রমগুলিও তাহাদের যথাক্রমে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তবে তাহা এক জন্মেই হউক বা পুনঃ পুনঃ বহু জন্মেই হউক, সমাধা না করিলে কেহই প্রকৃত সন্ন্যাসমার্গে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। সেই কারণ পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানাধিকার হইতেই সন্ন্যাসী-সাধকের সাধনা আরম্ভ হইয়া থাকে। তাঁহারা তখন সেই প্রথম জ্ঞান-বস্তুর অবিরত সাধনার ফলে "নেতি নেতি" বিচার দ্বারা ক্রমে ব্রহ্ম-নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, সংসারীর পক্ষে যে জ্ঞান শেষ বস্তু, সন্ন্যাসীর পক্ষে তাহাই আদি বা প্রথম সাধনার বস্তু। পরে তাহা হইতেই বিপরীত ভাবে সাধনার সকল কার্য্যই নিষ্পন্ন হইতে থাকে। অর্থাৎ কোন্‌টী নিত্য, কোন্‌টী অনিত্য, এই বিচার-জ্ঞান পুষ্ট হইলেই সাধক সেই নিত্যবস্তুর উপলব্ধির জন্য যে সকল ক্রিয়া করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যাহাদ্বারা সর্ব্বজীবে, সর্ব্বভূতে সেই পরম-বস্তুর নিত্য-সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে উপাসনা বলিতে হইবে। অতএব সংসারী-সাধকের পক্ষে যেমন প্রথমে কর্ম্ম, পরে উপাসনা এবং সর্ব্বশেষে জ্ঞান, সন্ন্যাসীর পক্ষে সেইরূপ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত রীতি, অর্থাৎ প্রথমে জ্ঞান, পরে উপাসনা অর্থাৎ জ্ঞানপুষ্ট ব্রহ্মোপাসনা এবং সর্ব্বশেষে তাঁহাদের কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রশ্ন হইতে পারে "সে আবার কি কর্ম্ম?" ঠাকুর বলেন—"তাহাই শাস্ত্রোক্ত নিষ্কামকর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞান-পরিপুষ্ট ব্রহ্মকর্ম্ম।" সাধক সর্ব্বভূতে তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি করিলে "ব্রহ্মময়ং জগৎ" এই মহাবাক্যের নিশ্চয়তা হইবে, তখন তাহার পক্ষে সত্যই "বসুধৈব কুটুম্বকম্" হইয়া পড়িবে। তখন তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে ব্রহ্মরূপ সন্দর্শনে তন্ময় হইয়া যাইবেন, সুতরাং তিনি তখন জগতের সেবায় বিশ্বের মঙ্গল-চিন্তায় বিশ্বনাথ শিবরূপে কাম বা

কামনা-পরিশূন্য হইয়া বিশ্বের সেবা-কর্ম্মেই নিযুক্ত হইয়া যাইবেন। ইহাই সনাতন সাধনমার্গের চিরন্তন রীতি। এই অবস্থাকেও সাধকের জীবন্মুক্তি দশা বলা যায়। শাস্ত্রে ইহাকেই ঈশকোটী জীবন্মুক্তি বলা হইয়াছে। এই সময় সাধকের যে কর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, তাহাতে ফলভোগের আশঙ্কা আদৌ থাকে না, তবে তাঁহাদের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রারব্ধ সংস্কার থাকা প্রযুক্ত তাঁহারা নিষ্কামভাবে বিশ্বের কল্যাণার্থে কিছু কর্ম্ম না করিয়া পারেন না। সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত থাকিলেও উচ্চতম আধার বিশেষে তাঁহার বিভূতি কেন্দ্রীভূত হইয়া জগন্মঙ্গলকর যে সকল কর্ম্ম করাইয়া থাকেন, তাহাই পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসী-সুলভ সাধকের শেষ বস্তু "কর্ম্ম"। কিন্তু এ কর্ম্মও কালে বিলয়-প্রাপ্ত হয়। উচ্চতম সাধকের প্রারব্ধ-কর্ম্ম-সংস্কার-জনিত সেই ক্ষীণ প্রবৃত্তিরও বিলয় হইলে তখন যে, অভিনব জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে, তাহাই সম্পূর্ণ বা স্বরূপ জ্ঞান। এই জ্ঞানেরই শেষ সীমায় সাধক নির্ব্বিকল্প সমাধিমগ্ন হইয়া যান। তখন তিনি সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান-রহিত হইয়া, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানেই তন্ময় হইয়া থাকেন। সাধকের পক্ষে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবন্মুক্তি অবস্থা। শাস্ত্র ইহাকেই ব্রহ্মকোটী জীবন্মুক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন কোন মহাত্মার ঈশকোটী অবস্থা না হইয়া একেবারেই ব্রহ্মকোটী দশাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তাঁহারা শেষ ব্রহ্মকর্ম্ম করিবার আর অবসর পান না। তাঁহারা ঠিক আরণ্য-প্রসূনের ন্যায় নিবিড় বনান্তরালে প্রস্ফুটিত হইয়া নিভৃতেই তাঁহাদের জীবলীলার অবসান করেন। যাহাহউক, শ্রীমন্মহর্ষি কপিলের সাংখ্য দর্শনে সেই কারণেই উক্ত স্বরূপ-জ্ঞানসিদ্ধির ক্রিয়া-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এক কথায় বলিয়াছেন যে, "জ্ঞানান্মুক্তি" অর্থাৎ জ্ঞান হইতেই প্রকৃত মুক্তিপদ লাভ হইয়া থাকে। এতদ্‌সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভগবতী গীতায় স্বয়ং দেবী বলিয়াছেন ঃ —

"জ্ঞানাৎসংজায়তেমুক্তির্ভক্তির্জ্ঞানস্য কারণম্ ।
কর্ম্মণা জায়তে ভক্তিঃ ধর্ম্মযজ্ঞাদিকোমতঃ ।
তস্মান্মুমুক্ষুর্ধর্ম্মার্থং মমেদং রূপমাশ্রয়েৎ ॥"

জ্ঞান হইতেই মুক্তিলাভ হয়, ভক্তি জ্ঞানেরই কারণ-স্বরূপ এবং ধর্ম্মানুকূল যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে আবার সেই ভক্তির পরিপুষ্টি জন্মিয়া থাকে, সেইজন্য মুমুক্ষু ব্যক্তি ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সাধনার্থ আমার এইরূপ আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইহাতে জগদম্বা সুস্পষ্ট ভাবেই আদেশ করিয়াছেন যে, ভক্তি, উপাসনা ও কর্ম্মপরিপুষ্ট জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র কারণ স্বরূপ।

জ্ঞান, জ্ঞান, জ্ঞান, এই ত্রিতয়-জ্ঞান পূর্ণ হইলেই, জীবের চির বাঞ্ছিত ঐ মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। তাই সংসারীর পক্ষে ব্রহ্মের বিভূতি-জ্ঞানই প্রথম। সংসারী-সাধক তাঁহার কঠোর উপাসনার ফলে স্বীয় ধ্যান-সম্মত নামরূপাত্মক সান্ত উপাস্য-মূর্ত্তির মধ্যে সেই অনন্ত ব্রহ্মশক্তির আভাস পরিদর্শন করিয়া থাকেন। অনন্তর ব্রহ্মের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-সিদ্ধ শক্তি-সামর্থ্যের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। বাহ্য-পূজা, স্তব ও জপরূপ মন্ত্রযোগ এবং আংশিক হঠযোগের দ্বারা তাহা ক্রমে সিদ্ধ হইয়া থাকে। সমস্ত "সাধন-প্রদীপ" ও "গুরুপ্রদীপের" প্রথম হইতে পঞ্চম অধ্যায়ের মধ্যে তাহা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সন্ন্যাসী বা উচ্চতর সাধকের পক্ষে তাহার পরবর্ত্তী জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানবস্তুর বিচার-সিদ্ধ তটস্থ জ্ঞান বা দ্বিতীয় স্থলাভিষিক্ত জ্ঞান, যাহাকে সাধকশ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দ পরোক্ষানুভূতি বলেন, তাহাই ত্রিতয়-জ্ঞানের মধ্য কল্প। হঠযোগ ও আংশিক লয়-যোগের সমাহারভূত সাধনাদ্বারা ব্রহ্মজ্যোতির্বিন্দু ধ্যানের সহ-যোগে তাহা নিষ্পন্ন হয়। "গুরুপ্রদীপের" শেষ অংশে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রকৃত সন্ন্যাসী বা অবধূত কাহাকে বলে ?

এই প্রসঙ্গে সন্ন্যাসী-সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা বিশেষ আবশ্যক মনে করিতেছি। কেবল গৈরিক বা রক্তবস্ত্র-পরিহিত, দীর্ঘকেশ, শ্মশ্রু কিম্বা জটাজুট-সম্পন্ন অথবা শিখা-সূত্র-ত্যাগী, দণ্ড, কমণ্ডলু ও কৌপীনমাত্রধারী হইলেই যে কোনও মানব, সন্ন্যাসী-পদবীবাচ্য হইতে পারিবেন না; কিন্তু অধুনা এইরূপ ধরণের লোককেই সাধারণে সন্ন্যাসী বলিয়া অভিহিত করেন। কারণ জটী, মুণ্ডী ও দণ্ডী আদির উক্তরূপ পরিচ্ছদ বা বেশই চতুর্থাশ্রমীর প্রাথমিক পরিচয়ের পক্ষে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট আছে। পরন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, এইরূপ বেশধারী অধিকাংশেরই প্রকৃত সন্ন্যাসধর্ম্মের বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায় না। তৎপরিবর্ত্তে ঘোর আকাঙ্ক্ষা-পরিপুষ্ট সংসারীর অপেক্ষাও নিতান্ত অধম ভাবাপন্ন ব্যক্তিই সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদ্বারা যে সন্ন্যাসী-মর্য্যাদার যথেষ্ট হানি হইতেছে, তাহা অনেকে চিন্তা করিতেও অবসর পান না। সংসারী হউন বা সংসারের মধ্যে পাঁচজনের একজন হইয়াও নির্লিপ্তভাবে থাকুন, অথবা পূর্ব্বোক্ত রূপ পরিচ্ছদাদি পরিহিত হইয়া একান্তবাসীই হউন— যিনি সম্পূর্ণ রূপে কিম্বা যতদূর সম্ভব কামনা পরিবর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, তিনিই সেই অনুপাতে তত উচ্চ বা উচ্চতর সন্ন্যাসী বা অবধূত-পদবীবাচ্য। অতএব কেবল দীক্ষা ও অভিষেকাদি সম্পন্ন হইলেই সাধক সন্ন্যাসী হইতে পারেন না। তাহার পর রীতিমত সাধনার ফলে যথাক্রমে মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র বৈরাগ্যের * অধিকারী হইলেই সাধক ক্রমে প্রকৃত সন্ন্যাসী হইতে পারেন। এইরূপ যথার্থ সন্ন্যাসাশ্রমী ব্যক্তির পক্ষেই প্রথম হইতে তটস্থ বা

* বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-আশ্রম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 'চতুর্থ-উল্লাসে' প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয়-কল্প-নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানের উপলব্ধি সম্ভবপর। অনন্তর তাহাদের মধ্যে মহাপূর্ণ দীক্ষান্তে যথাযথ রাজযোগের সাধনাদ্বারা যিনি সেই জ্ঞানোপাসনায় পরবৈরাগ্যের অধিকারী হইয়া উন্নত হইতে পারেন, তিনিই পরিণামে ব্রহ্মকৃপাবলে ব্রহ্ম-সদ্ভাবযুক্ত তৃতীয় বা স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষরূপে সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন। সেই তৃতীয় বা শেষ জ্ঞানই জ্ঞান-ত্রিতয় মধ্যে উত্তম কল্প বলিয়া শাস্ত্র প্রশংসা করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন ঃ—

"উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বহিঃ পূজাধমাধমা ॥"

এই ব্রহ্মসদ্ভাব করিবার উপায় সমূহই শাস্ত্রে উচ্চ বা উত্তম জ্ঞানমার্গ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীমহাভারতের মোক্ষধর্ম্মাংশেও উত্তম জ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—

"একত্বং বুদ্ধিমনসোরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
আত্মনো ব্যাপিনস্তাত জ্ঞানমেতদনুত্তমং ॥"

অর্থাৎ মায়াময় বাহ্য প্রকৃতি হইতে বহির্ম্মুখী বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে প্রতিনিবৃত্ত পূর্ব্বক অন্তর্ম্মুখী করিয়া সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মায় নিয়োজিত করাকেই উত্তম জ্ঞান বলে। ইহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকন্তুযৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতং ॥"

দেহাদির জ্ঞান ব্যতীত কেবল আত্মবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা সাত্ত্বিক; পৃথক রূপে দেহাত্মবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা রাজসিক; বাহ্যপদার্থ-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা তামসিক এবং আমাতে যে নিষ্ঠা, তাহাকে নির্গুণ জ্ঞান বলে। অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা জীব ভূতাদির

মধ্যে অভিন্নভাবে অবস্থিত একমাত্র অব্যয় পরমাত্মতত্ব প্রত্যক্ষ করে, তাহাই সাত্ত্বিক জ্ঞান। রাজসিক জ্ঞান তাহার পূর্ব্বের অবস্থায় উৎপন্ন হয়, তখন জীব ভূতসমূহের পৃথক পৃথক ভাবানুসারে সমস্তই বিভিন্নরূপে অনুভব করিতে থাকে, অর্থাৎ সর্ব্বভূতানুস্যূত সেই অব্যয় পরমাত্মতত্ত্ব তখনও অদ্বৈতভাবে অনুভব করিতে পারে না। তামসিক জ্ঞান ইহারও নিম্নস্তরে উপলব্ধ হইয়া থাকে ; তখন জীব ঘট, পট ও স্থূল মূর্ত্তি আদির মধ্যেই ঈশ্বরের বিদ্যমানতা বিশ্বাস করে। এইরূপ তামসিক জ্ঞানের দ্বারা যে জীবের অবশ্যই উন্নত গতি হয়, তাহাতে সন্দেহ-মাত্র নাই, কিন্তু মোক্ষ হয় না। তবে মোক্ষ-পথে অগ্রসর হইবার ইহাই প্রথম সোপান বা উপায় স্বরূপ । তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন :—যখন সাধক ক্রমোন্নত সাধনাদ্বারা আত্মজ্ঞান-পরায়ণতা বা তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনাসহ মোক্ষাত্মক যে সাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান বা তাহাই উত্তম জ্ঞান। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ঠাকুরের কৃপায় এই "জ্ঞান-প্রদীপে" সেই জ্ঞানমার্গের সাধনা-পদ্ধতি সম্বন্ধেই যথাসম্ভব আলোচিত হইবে।

সন্ন্যাসমার্গে যোগাদি পরিত্যাজ্য নহে।

ইতিপূর্ব্বে "সাধনপ্রদীপে" ও "গুরুপ্রদীপে" মন্ত্রযোগাদি সম্বন্ধে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, জ্ঞান-মার্গী সাধকের পক্ষেও তাহা একেবারে পরিত্যাজ্য নহে, অপিচ তাহাই যে জ্ঞান-মার্গে উন্নীত হইবার সুপ্রতিষ্ঠিত সোপানশ্রেণী, তাহা সর্ব্বদা সাধকমাত্রকেই স্মরণ রাখিতে হইবে। বহু পাণ্ডিত্যাভিমানী, জ্ঞানপন্থী কোনও গুরুর সহায়তা লইয়া হউক বা না লইয়াই হউক, আপন রুচি অনুসারে যে কোন সাধারণ শাস্ত্র পাঠ করিয়া, তাঁহাদের মনোমত এক একটী সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন। এবং কিছু দিন পরে তাহাই অনুগত জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়া স্বীয়

পাণ্ডিত্য ও সাধনাভিজ্ঞতার পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ক্রমোন্নত সাধন-পন্থার প্রতি অযথা অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন, ফলে ক্রমোন্নত সাধনার সোপানস্বরূপ সেই সাধন স্তর-গুলির অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিতেই তাঁহারা যেন বদ্ধপরিকর হন। সেই কারণেই সনাতন সাধন শাস্ত্রসমূহ ক্রমে বিবিধ সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং সাধনার যথাক্রম ক্রিয়াবলী যাহা পূজ্যপাদ ঋষিমণ্ডলী কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানরূপী ক্রিয়াভিজ্ঞ শ্রীগুরুদেবের মুখাগত না হইলে, কখনই ঠিক ফলপ্রদ হয় না, এ সকল কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডেও বর্ণিত হইয়াছে। অতএব নির্ব্বাণাভিলাষী সন্ন্যাস বা অবধূত-পন্থীর পক্ষেও ক্রমোন্নত সাধন-পন্থা কোন ক্রমেই পরি-ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, সাধকের চিত্তে নানা লৌকিক কারণেই সহসা আংশিক বা ক্ষণিক বৈরাগ্যের ভাব উপস্থিত হয়, তখন বিনাবিচারেই বা অগ্রপশ্চাৎ কোন কিছু না দেখিয়াই, অধিকাংশ ব্যক্তি সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া বসেন, পূর্ব্বকৃত্য ধারাবাহিক ক্রমোন্নত সাধনা অভ্যাস করিবার আদৌ অবসর পান না। হয়ত কেহ কেহ বিনা গুরু-পদেশেই বা সন্ন্যাস-দীক্ষারূপ উপযুক্ত সন্ন্যাসী গুরুকরণের পূর্ব্বেই সন্ন্যাসীসুলভ গৈরিকবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে আপন ইচ্ছায় একটা আনন্দযুক্ত স্বামী বা পরিব্রাজকাদি নাম লইতেও অনেককে দেখা গিয়াছে; পরে দুই একখানি 'যা, তা' মুদ্রিত পুস্তক পড়িয়াই, তাঁহারা আবার গুরুগিরি করিতেছেন বা লোককে উপদেশ দিতেছেন, এরূপও অনেকস্থলে পরিলক্ষিত হইয়াছে। গভীর আক্ষেপের বিষয়, এ অবস্থায় মিথ্যাকথা প্রবঞ্চনাদিই তাঁহাদের আত্ম-প্রাধান্য-বৃদ্ধির উপায়স্ব-রূপ হইয়া পড়ে। জিজ্ঞাসা করিলে, কেহ কেহ এরূপও বলেন যে, আমি অমুক দুরারোহ পর্ব্বত-গুহায় অমুক মহাপুরুষের নিকট উপদেশ

লাভ করিয়াছি, তাঁহার দুইশত বা ততোধিক বৎসর পরমায়ু ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহাদের আচার, অনুষ্ঠান, স্বার্থপরতা ও কামাদির প্রভাব-পুষ্টতা দেখিলে, এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রমের বিষয়ে নানাবিধ শঙ্কা ও অযথা ঘৃণামাত্রই উৎপাদন করিয়া দেয়। সেই কারণ পুনরায় বলিতেছি, মুক্তিকামী প্রত্যেক সাধককে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়াও দিতেছি যে, যে কোনও প্রকারেই হউক, সংসারীসুলভ মায়াজ্ঞান যখন কাটাইয়াছ, তখন পুনরায় বৃথা সন্ন্যাসাভিমানের ঘোরে স্বার্থপরতা, হেয় আত্মপ্রাধান্য ও আত্ম-প্রবঞ্চনামূলক অতিঘৃণ্য পাপপ্রদ ভীষণ মোহজালে যেন আর আবদ্ধ হইও না; পরচর্চ্চা ছাড়িয়া আত্মচর্চ্চায় মনোনিবেশ কর, আপনার মুক্তির পথই অনুসন্ধান কর। শিশুর ন্যায় সরলান্তঃকরণ লাভের জন্য সতত যত্ন কর, আর বৃথা কালক্ষেপপূর্ব্বক নিজেই নিজেকে প্রবঞ্চনা করিয়া তোমার মুক্তির পথ কণ্টকিত করিও না! "গুরুপ্রদীপে" বর্ণিত যোগাধ্যায়ের মন্ত্র ও হঠাদি যোগ-সাধনা-সম্বন্ধে তোমার অবস্থা ও অধিকার ভেদে যে কোনও অভিজ্ঞ গুরুর নিকট বালকের ন্যায় অসঙ্কোচে সমস্ত জানিয়া বুঝিয়া লও, তোমার দুষ্ট আত্মাভিমানকে হৃদয় হইতে একেবারে বিদূরিত করিয়া দাও, পদদলিত করিয়া ফেল; নতুবা তোমার নিষ্কৃতি নাই, তোমার শান্তি নাই, তোমার সিদ্ধিও নাই। প্রিয়তম জ্ঞানাভিলাষী সাধক! তোমার জ্ঞানাধিকারের বিস্তৃত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রাদি যোগ-সাধনার আরও কিছু বুঝিবার আছে। তোমাদের অবগতির জন্য এক্ষণে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য দেব বলিয়াছেন:—

"জ্ঞানং যোগাত্মকং বিদ্ধি" ইত্যাদি।

যোগ-চতুষ্টয়ের সমাহারই তন্ত্রের বৈচিত্র্য।

অর্থাৎ জ্ঞান যোগময় বা যোগই জ্ঞান। আবার শাস্ত্রান্তরে আদিষ্ট হইয়াছে:—

"যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং" ইত্যাদি।

অর্থাৎ যোগ হইতেই বা যোগাভ্যাসের দ্বারাই ক্রমে সাধকের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব মুক্তিকামী সাধকমাত্রেরই যথাবিধি যোগাবলম্বন অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীভগবান্ "শিবসংহিতায়" বলিয়াছেন ঃ—

"জ্ঞানকারণমজ্ঞানং যথানোৎপাদতে ভৃশং।
অভ্যাসং কুরুতে যোগী তদা সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥

অর্থাৎ সর্ব্বদা সঙ্গ-বিবর্জ্জিত হইয়া যোগীপুরুষ জ্ঞান উপলব্ধির কারণ বিধিপূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিবে, তাহা হইলে অজ্ঞান উৎপাদনের আর কিছুমাত্র আশঙ্কা থাকিবে না।

শাস্ত্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—

"যাবন্নৈব প্রবিশতি চরণমারুতো মধ্যমার্গে
যাবদ্বিন্দুর্নভবতি দৃঢ় প্রাণবাতপ্রবন্ধাৎ।
যাবদ্ ধ্যানং সহজ সদৃশং জায়তে নৈবতত্ত্বং
তাবজ্জ্ঞানং বদতি তদিদং দম্ভমিথ্যাপ্রলাপঃ॥"

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত প্রাণবায়ু সুষুম্না বিবরমধ্যে বিচরণ করিয়া ব্রহ্ম-রন্ধ্রে প্রবেশ না করে, যে পর্য্যন্ত না বীর্য্য দৃঢ় হয়, অর্থাৎ স্থিরীভূত এবং যে পর্য্যন্ত না চিত্তের স্বাভাবিক ধ্যেয়াকার বৃত্তি-প্রবাহ উপস্থিত হয়, সেই পর্যন্ত যে জ্ঞান, তাহা মিথ্যা প্রলাপ মাত্র। উহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। প্রাণ, চিত্ত ও বীর্য্যকে বশীভূত করিতে না পারিলে, কখনই প্রকৃত জ্ঞান উদয় হইতে পারে না। কারণ চিত্ত সততই চঞ্চল, চিত্ত স্থির না হইলে, জ্ঞানোদয়ের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। পূজ্যপাদ মহর্ষি সূত্রকার তাই চিত্তবৃত্তি-নিরোধকেই যোগাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

"গুরুপ্রদীপের" যোগদীক্ষাভিষেক নামক ষষ্ঠস্তবকে চতুর্ব্বিধ যোগসংজ্ঞা ও তন্মধ্যে মন্ত্রযোগই প্রাথমিক সাধকের অবলম্বনীয়

বলিয়া যাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, যোগাভিলাষী পাঠকের অবশ্যই তাহা স্মরণ আছে, যদি না থাকে, তবে সেই অংশ আর একবার পাঠ করিলে পরবর্ত্তী অংশে যাহা বর্ণিত হইবে, তদ্বিষয় বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। "গুরুপ্রদীপের" শেষ অংশে "যোগসমাহারই তন্ত্রের বৈচিত্র্য" অংশও পাঠক পুনরায় একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন। সে স্থলেও মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজ এই চতুর্ব্বিধ যোগের সংজ্ঞা ও তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট তাহার মিশ্র অধিকার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইয়াছে।

যোগসূত্র-প্রণেতা পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি পতঞ্জলিদেব যোগ-দর্শনের মধ্যে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অনেকেই পাঠ করিয়া থাকিবেন, তাহা যোগবিজ্ঞানের ঔপপত্তিক (Theoretical) বিষয় মাত্র, যোগের ক্রিয়াসিদ্ধ (Practical) বিষয় তাহাতে নাই। পূজ্যপাদের সেই সূত্রাবলী ও শিবোক্ত শাম্ভবী-শাস্ত্রসমূহ অবলম্বন করিয়াই বিভিন্ন যোগাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক যথাক্রমে মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজযোগ বিষয়ক বহু তন্ত্র বা সাধন-গ্রন্থে যোগের ক্রিয়া-সাধনা অতি বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মন্ত্রযোগ-রহস্য।

মন্ত্রযোগের আচার্য্য, প্রকৃতি ও অঙ্গভেদ।

হঠ, লয় ও রাজযোগের তুলনায় মন্ত্রযোগের আচার্য্য সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহাদের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া, তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় আচার্য্য-শিরোমণির নাম এস্থলে বর্ণন করিতেছি। যথা—নারদ, পুলস্ত্য, গর্গ, বাল্মীকি, ভৃগু, বৃহস্পতি, শুক্র, বশিষ্ট, সালঙ্কায়ন ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি, এই আদিম, আচার্য্য ব্যতীত পরম পূজ্যপাদ কুলগুরু পঙ্‌ক্তির প্রথম সপ্ত-পর্য্যায় যথা—প্রহ্লাদানন্দনাথ, সনকানন্দনাথ, কুমারানন্দনাথ,

বশিষ্ঠানন্দনাথ, ক্রোধানন্দনাথ, সুখানন্দনাথ, বোধানন্দনাথ এবং আদিগুরু বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দনাথকে নিত্য অর্চ্চনা করিয়া সকলেই মন্ত্রাদি যোগের অনুষ্ঠান করিবে।

যোগচতুষ্টয়ের মধ্যে এই মন্ত্রযোগ সাধকের প্রথম অবলম্বনীয় হইলেও, তন্ত্রশাস্ত্রের এমনই বিচিত্র শিক্ষাপ্রণালী যে, ভিন্ন ভিন্ন সাধকের অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে এই মন্ত্রযোগের আনুষঙ্গিক-ভাবে হঠ ও লয়যোগেরও অল্পাধিক সাধনার ব্যবস্থা আছে। এই সর্ব্বতোমুখী উদারব্যবস্থাই তন্ত্রের বিচিত্রতা। মন্ত্রযোগ বলিলে, কেবল শ্রীগুরু-দত্ত মন্ত্রটীর জপ ব্যতীত আর যে কিছুই করিতে হইবে না, তাহা নহে। যদিও ইহা কেবল নাম ও রূপের * অবলম্বনে অর্থাৎ মূর্ত্তি ও তদন্তর্গত বা তৎপ্রতিপাদক মন্ত্র কিম্বা মন্ত্রধ্যান-সহযোগে চিত্ত-স্থির করিবার সাধনা মাত্র; তথাপি সাধকমাত্রের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ইহাই সর্ব্ববিধ যোগের মূল ভিত্তি। শাস্ত্র বলিয়াছেন:—

"মন্ত্রজপান্মনোলয়ো মন্ত্রযোগঃ।"

অর্থাৎ মন্ত্র জপ করিতে করিতে যে বিধানের দ্বারা মন সেই মন্ত্রাত্মক দেবতায় বা ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই মন্ত্রযোগ।

শ্রীভগবান্ স্বয়ং সাধনশাস্ত্রে আদেশ করিয়াছেন:—

"অঙ্গেষু মাতৃকান্যাসপূর্ব্বং মন্ত্রং জপন্‌সুধীঃ।
এবঞ্চ মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্মন্ত্রযোগঃ সউচ্যতে॥"

---

* নামরূপাত্মক লৌকিক বিষয়ই জীবকে বন্ধনযুক্ত করে বা নামরূপাত্মক প্রকৃতিবৈভব বশতঃ জীব সতত অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া থাকে সুতরাং নিজ নিজ সূক্ষ্ম প্রকৃতি বা প্রবৃত্তির গতি অনুসারে অলৌকিক বা আধ্যাত্মিক লক্ষ্যসংযুক্ত সেই নামময় শব্দ ও ভাবময় রূপকে অবলম্বন করিয়া যে যোগক্রিয়া সাধনায় জীব অবিদ্যা পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহাই যোগচতুষ্টয়ের মধ্যে মন্ত্রযোগ।

সাধক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মাতৃকান্যাস করিয়া যে মন্ত্র জপ করে, তাহার সেই মন্ত্র সিদ্ধ হইলে তাহাকে মন্ত্রযোগ বলে।

শ্রীদেবীগীতায় উক্ত হইয়াছে ঃ—

"মন্ত্রাভ্যাসেন যোগেন জ্ঞেয় জ্ঞানায় কল্প্যতে॥
ন যোগেন বিনামন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনা হি সঃ।
দ্বয়োরভ্যাসযোগোহি ব্রহ্মসংসিদ্ধি কারণম্॥
তমঃ পরিবৃতে গেহে ঘটো দীপেন দৃশ্যতে।
এবং মায়াবৃতোহ্যাত্মা মন্থনা গোচরীকৃতঃ॥

মন্ত্রাভ্যাসযোগ অর্থাৎ মন্ত্রযোগদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পাদিত হইয়া থাকে। যোগ ভিন্ন মন্ত্র সিদ্ধ হয় না, কিন্তু মন্ত্র ও যোগ এই দুইয়ের অভ্যাসই ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ। অন্ধকারের দ্বারা আবৃত গৃহমধ্যস্থিত যে কোনও বস্তু যেমন প্রদীপের আলোকেই প্রকাশিত হয়, সেইরূপ মায়া-পরিবৃত জীবাত্মাও মন্ত্রদ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে অর্থাৎ মন্ত্র মায়ান্ধকার নাশ করিয়া আমার স্বরূপ প্রকাশ করে। এই মন্ত্রযোগ-সাধনার অনুকূল ষোড়শবিধ ক্রিয়া-বিধানের ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্র তাহাকেই মন্ত্রযোগের ষোড়শাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঃ—

"ভবন্তি মন্ত্রযোগস্য ষোড়শাঙ্গানি নিশ্চিতম্।
যথা সুধাংশোর্জায়ন্তে কলাঃ ষোড়শঃ শোভনাঃ॥"

চন্দ্রের ষোড়শ কলার অনুরূপ মন্ত্রযোগের ষোলপ্রকার অঙ্গ কি ভাবে বিভক্ত, যোগীর তাহা জানিয়া রাখা আবশ্যক। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

"ভক্তিশুদ্ধিশ্চাসনঞ্চ পঞ্চাঙ্গস্যাপি সেবনং।
আচারধারণে দিব্যদেশসেবনমিত্যপি॥
প্রাণক্রিয়া তথামুদ্রা তর্পণং হবনং বলিঃ।
যাগো জপ স্তথা ধ্যানং সমাধিশ্চেতি ষোড়শঃ॥"

ভক্তি, শুদ্ধি, আসন, পঞ্চাঙ্গসেবন, আচার, ধারণা, দিব্যদেশ-সেবন, প্রাণক্রিয়া, মুদ্রা, তর্পণ, হবন, বলি, যাগ, জপ, ধ্যান, সমাধি এই ষোল প্রকার মন্ত্রযোগের অঙ্গ। এই অঙ্গসমূহের কোন কোনটীর আবার প্রত্যঙ্গ ভেদ আছে। যোগানুরাগী পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ যথাক্রমে প্রদত্ত হইতেছে।

ভক্তি, ভক্ত ও উপাসনা-রহস্য।

১ম। ভক্তি :—মন্ত্রযোগের ষোল প্রকার অঙ্গের মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ভক্তি ব্যতীত মন্ত্রযোগের সিদ্ধি ত হইতেই পারে না, পরন্তু ভক্তির সহায়তা ব্যতীত অন্য কোনও যোগই সম্পন্ন হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। সকল সাধনার মূলভিত্তিরূপ এই ভক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। শ্রীমন্মহর্ষি শাণ্ডিল্য ভক্তিদর্শন-সূত্রে বলিয়াছেন :—

"তাভ্যপাবিত্র্যমুপক্রমাৎ ॥"

ভক্তি অন্তঃকরণ গত স্বাভাবিক ধর্ম্ম, অন্তঃকরণের পবিত্রতা আসিলেই ভক্তি আপনা আপনি উৎপন্ন হয়। সেই কারণ মহর্ষি সূত্রান্তরে বলিয়াছেন :—

"ন ক্রিয়া কৃত্য নপেক্ষাজ জ্ঞানবৎ ॥"

অর্থাৎ ভক্তি ক্রিয়াত্মিকা হইতে পারে না, ভক্তি পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যের অধীন। যেমন স্বেচ্ছায় কেহ জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না বা জ্ঞান বিনষ্ট করিতেও সমর্থ হয় না, সেইরূপ ভক্তিও প্রথমে কাহারও আপন ইচ্ছায় উৎপাদন করিতে পারা যায় না। সুতরাং প্রযত্নের অভাব বশতঃ ভক্তি কখনও ক্রিয়াত্মিকা হইতে পারে না; বাস্তবিক যাহার প্রথম উৎপাদনের মূলে ইহজীবনে কোন প্রযত্ন লক্ষিত হয় না, তাহাকে ক্রিয়াত্মিকা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? ক্রিয়াত্মিকা বা কৃত্রিম ভক্তি,

মুক্তিপ্রদ নহে, অকৃত্রিম বা স্বাভাবিক ভক্তিই সকল ক্রিয়া ও মুক্তির মূল। আবার যে ক্রিয়া বা সাধনার মূলে ভক্তি নাই, তাহা শুষ্ক ক্রিয়ামাত্র। তাহাতে যথার্থ আনন্দ বা রসাস্বাদ অনুভব হয় না, তাহা শর্করা-ভার-বাহী বলীবর্দ্দের ন্যায় কেবল কর্ম্মভোগমাত্র। বাস্তবিক ভক্তি ব্যতীত ক্রিয়া হয় না, আবার জ্ঞানও সম্পূর্ণ হয় না, তবে ক্রিয়া-যোগ ব্যতীত সেই স্বাভাবিক ভক্তি-জ্ঞান পুষ্টি লাভ করিতে পারে না। তাই মহর্ষি পুনরায় বলিয়াছেন :—

"যাগস্তু ভয়ার্থমপেক্ষণাৎ প্রযাজবৎ ॥"

অর্থাৎ যোগানুষ্ঠান দ্বারা ভক্তি ও জ্ঞান উভয়ই পরিপুষ্ট হয়। যাঁহাদের চিত্ত সমাধিগত, তাঁহারা ভক্তি ও জ্ঞানোন্নতির জন্য অবশ্যই যোগানুষ্ঠান করিবেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন :—"যেমন বাজপেয়াদি যজ্ঞের অঙ্গসমূহের মধ্যে সেই যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তির দীক্ষা-ক্রিয়াও তাহার অঙ্গীভূত, সেইরূপ জ্ঞানের অঙ্গীভূত যোগও ভক্তির অঙ্গস্বরূপ বলিতে হইবে। এইরূপ বিষয়-বৈরাগ্যাদিকেও ভক্তির অঙ্গ বলিতে ইহবে। যে জ্ঞানের দ্বারা শ্রীভগবানের স্বরূপ বিদিত হইতে পারা যায়, ভক্তি সেই জ্ঞানেরও কারণস্বরূপ। আবার অনেকে জ্ঞানই ভক্তির সাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু উক্ত মহর্ষি তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন :—

"জ্ঞানমিতিচেন্নদ্বিষতোঽপি জ্ঞানস্য তদস্তি ॥"

অর্থাৎ কেবল ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানকেও ভক্তি বলা যায় না, কারণ ভগবদ্বিদ্বেষী ব্যক্তিরও ভগবান বিষয়ে কিছু না কিছু জ্ঞান থাকিতে পারে। ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমানতা আদি মাহাত্ম্য অনেকেই শুনিয়াছেন ও তাহাতে হয়ত কিছু বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু সেই ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ, প্রেম বা প্রীতি ত সকলের নাই, সংসারের ভ্রান্ত বিষয়ানুরাগেই প্রায় সকলে মুগ্ধ হইয়া আছেন।

সুতরাং ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকিলেও ভক্তি হয় না। এ কথা "সাধন-প্রদীপ" ও "জ্ঞানপ্রদীপেও" অনেকবার আলোচিত হইয়াছে। যাহাহউক সেই ভক্তি কাহাকে বলে বা ভক্তির লক্ষণ কি? মহর্ষি শ্রীমৎ অঙ্গিরাকৃত দৈবীমীমাংসাসূত্রে উক্ত হইয়াছে;—

"সানুরাগরূপা ॥"

অর্থাৎ সেই ভক্তি অনুরাগরূপা। মহর্ষি শ্রীমৎ শাণ্ডিল্যও তৎ-কৃত সূত্রে এইভাবেই বলিয়াছেন;--

"সাপরমানুবৃত্তিরীশ্বরে ॥" বা "সাপরমানুরক্তিরীশ্বরে ॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবানে পূর্ণানুরাগের নামই ভক্তি। দেবর্ষি নারদকৃত সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়;—

"সাকস্মৈ পরম প্রেমরূপা ॥"

ঈশ্বরে একান্ত অনুরাগের নামই ভক্তি। "মন্ত্রযোগতন্ত্রে" শ্রীসদা-শিবও এই কথা আরও সুস্পষ্ট ভাষায় উপদেশ করিয়া-ছেন যে ;—

"দেবেপরোহনুরাগস্তু ভক্তি সম্প্রোচ্যতে ॥"

অর্থাৎ স্ব স্ব ইষ্টদেবতার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগকেই ভক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। চিত্তের যতগুলি বৃত্তি আছে, তাহার মধ্যে রাগ বা অনুরাগ এবং দ্বেষ বা বিরাগই প্রধান। অনুরাগ সত্ত্বগুণ-প্রধান বলিয়া সুখদায়িকা বৃত্তি এবং দ্বেষ তমোগুণ-প্রধান বলিয়া দুঃখদায়িকা বৃত্তি নামে অভিহিত হইয়াছে। মহর্ষি শ্রীমদ্‌পতঞ্জলিদেব সেই কারণেই বলিয়াছেন যে,--

"সুখানুশয়ীরাগঃ। দুঃখানুশয়ীদ্বেষঃ ॥"

অর্থাৎ অনুরাগ সুখপ্রদ এবং দ্বেষ দুঃখপ্রদ। সুতরাং সেই সত্ত্বগুণ প্রধান উন্নতির নিদানভূত সুখপ্রদ রাগ-বৃত্তির সমভূমিস্থিত শ্রীভগবানের প্রতি ঐকান্তিক রাগ বা অনুরাগের নামই ভক্তি।

লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে অনুরাগ দ্বিবিধ। লৌকিক অনুরাগের দ্বারা জীব বিষয়-সম্বন্ধে জড়িত হয় ; ধন, ঐশ্বর্য্য, পুত্র

কন্যা, ভাই, বন্ধু, স্বামী, স্ত্রী ও পিতা, মাতা গুরুজনের প্রতি অনুরাগ পরিপুষ্ট হয়। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা ও শ্রদ্ধারূপে সেই অনুরাগ লৌকিক বিষয়ে আসক্তি মাত্রেই পরিণত হয়, কারণ এই অনুরাগ যে সকল বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাহা ত চিরস্থায়ী নহে, তাহা সততই পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর। অতএব এই লৌকিক অনুরাগও যে, বিনাশশীল তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পরমেশ্বরের প্রতি যে অনুরাগ, তাহাই অলৌকিক, অপরিবর্ত্তন-শীল ও অবিনশ্বর, তাহা পূর্ব্বকথিত লৌকিক বা বিষয়ানুরাগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু, তাহাকেই মহর্ষিবৃন্দ ভক্তি শব্দে অভি-হিত করিয়াছেন।

এই ভক্তি সাধারণতঃ দ্বিবিধ, যথাঃ—গৌণী ও মুখ্যা। সাধনদশাগত যে ভক্তি, তাহাকে গৌণী ভক্তি বলে এবং সিদ্ধ-দশাগত যে ভক্তি, তাহাকে মুখ্যা বা পরাভক্তি বলে। গৌণীভক্তি আবার বৈধী ও রাগাত্মিকা ভেদে দ্বিবিধ, এই কারণ শ্রীসদাশিব মন্ত্রযোগতন্ত্রে উপদেশ করিয়াছেন যে,—

"ভক্তিস্ত্রিবিধাজ্ঞেয়া বৈধী রাগাত্মিকা পরা॥"

অর্থাৎ প্রকার ভেদে ভক্তি ত্রিবিধা, যথা—বৈধী, রাগাত্মিকা ও পরাভক্তি।

প্রথম, বৈধীভক্তি ঃ—যখন সাধক শাস্ত্র-সম্মত ও গুরূপদিষ্ট বিধি-নিষেধের অধীন হইয়া পূজা, অর্চ্চনা, জপ, ধ্যান, শ্রবণ, কীর্ত্তন, বহির্যাগ ও অন্তর্যাগাদি ক্রিয়াদ্বারা তাঁহার অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক ভক্তি-প্রবাহকে পরিপুষ্ট করিতে করিতে ইষ্টদেবতার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইতে থাকেন, অর্থাৎ যখন তিনি কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যরূপ বিধিনিষেধের দ্বারা নির্ণিত সাধনাসহ উচ্চতর ভক্তিভূমিতে অগ্রসর হইতে থাকেন, তখনই তৎকৃত ভক্তি অনুষ্ঠানকে "বৈধীভক্তি" বলা যায়।

দ্বিতীয়, রাগাত্মিকাভক্তি ঃ—উক্ত বৈধীভক্তি-সাধনার ফল-

স্বরূপ তাহার কিঞ্চিৎ রসাস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে যখন সাধকের চিত্ত ইষ্টদেবতার প্রতি অলৌকিক অনুরাগযুক্ত হয় বা অপূর্ব্ব ভাব-বিশেষে যাহা অবগাহন করাইয়া দেয়, তাহাই "রাগাত্মিকা" ভক্তি।

তৃতীয়, পরাভক্তি :—সাধনার শেষ সীমায় সাধকের হৃদয়ে মুখ্যরসপুষ্ট যে পরমানন্দপ্রদা ভক্তির উদয় হয়, তাহাই "পরা-ভক্তি" শব্দে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তাহা অবিরত সাধন-পরায়ণ যোগিগণ তাঁহাদের একমাত্র সাধনার ফলরূপ সমাধি-অবস্থায় অনুভব করিতে পারেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভক্তি সাক্ষাৎ কোনরূপ যত্নসাধ্য বস্তু নহে, কিন্তু সাধনা ব্যতীত তাহা পরিস্ফুট হয় না। ভক্তির পক্ষে জ্ঞান অন্তরঙ্গ-সাধন ও অন্যান্য ক্রিয়াগুলি বহিরঙ্গ-সাধন। যদিও ভক্তির ন্যায় বুদ্ধিও ঠিক কোনরূপ যত্নসাধ্য বিষয় নহে, তথাপি শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি তাহার পরিপুষ্টির কারণ-স্বরূপ। যতদিন সৎবুদ্ধিদ্বারা পরিবর্দ্ধিত ভক্তি দৃঢ়মূল না হয়, ততদিন শ্রবণ, মনন ও মন্ত্রোপাসনাদ্বারা চিত্তমালিন্য বিদূরিত করিবার জন্য জ্ঞানাদির অবিরত অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

সনাতন ধর্ম্মের সকল শাস্ত্রের মধ্যেই একবাক্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই ভক্তিদ্বারাই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভক্তি-দ্বারাই তাঁহার দর্শন লাভ হইয়া থাকে, শ্রীভগবান ভক্তিদ্বারাই ভক্তের বশীভূত হন। অতএব সাধক প্রাকৃতিক গুণের অধীন না হইয়া কেবল জ্ঞান ও বৈরাগ্যযুক্ত হৃদয়ে ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন। সেই কারণ সাধন-মার্গের প্রথম সোপান মন্ত্রযোগের মধ্যে ভক্তিকেই প্রধান করিয়া বা তাহার ষোড়শাঙ্গ-মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অঙ্গ বলিয়া যোগতন্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। এক্ষণে সেই ভক্তিলভ্য পরম বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"রসোবৈ সঃ ॥"

অর্থাৎ তিনি বা সেই পরমাত্মা ব্রহ্মরস স্বরূপ বা

"আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ ॥"

তিনি আনন্দ স্বরূপ। রস ও আনন্দ উভয়ই একার্থবাচক শব্দ। শাস্ত্র আবার বলিয়াছেন :—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানিভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ॥"

অর্থাৎ সেই আনন্দ হইতেই নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি, সেই আনন্দেই বিশ্বের স্থিতি এবং সেই আনন্দেই সমস্ত লয় প্রাপ্ত হয়। সমগ্র বিশ্বই যে জড়-চৈতন্যের সমাহারভূত, তাহা ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলেই উক্ত হইয়াছে। দৈবীমীমাংসা-সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায় :—

"রসরূপঃ পরমাত্মা জড়রূপা মায়া ॥"

পরমাত্মা রসস্বরূপ এবং মায়া জড়রূপা। সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা অবাঙ্মনসোগোচর হইলেও, মুমুক্ষুদিগের বোধের নিমিত্ত—সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপ ত্রিবিধ ভাবের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই ভাবত্রয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় যদিও একই অদ্বিতীয় বস্তু, তথাপি সাধক-হৃদয়ের অবস্থানুসারে কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান-সাধনার অনুকুল ত্রিবিধ মীমাংসা-শাস্ত্রদ্বারা তাঁহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তিন ভাবের প্রতিপাদন হইয়াছে। অর্থাৎ কর্ম্ম মীমাংসাদ্বারা প্রধানতঃ সদ্ভাব, ব্রহ্ম-মীমাংসাদ্বারা চিদ্ভাব এবং ভক্তি বা দৈবী মীমাংসাদ্বারা আনন্দভাব প্রতিপাদিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত জড়-চৈতন্যময় বা সৎ-চিৎময় ব্রহ্মই দ্বিধাভূত হইয়া অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ ভাবে দ্বৈতভাবাপন্ন হইয়াও বিশ্বসৃষ্টির কারণ পুনরায় উভয় ভাবের সম্মিলনের দ্বারা আনন্দভাবে

বিকশিত হইয়াছেন। ব্রহ্মের এই আনন্দ-স্বরূপ জ্ঞাত হইলেই, সাধকের সর্ব্ববিধ ভয় ও দুঃখ বিদূরিত হইয়া যায়।

আনন্দময় পরমাত্মা যে, একাধারে চৈতন্য ও জড়াত্মক, তাহা বলা হইয়াছে। চৈতন্য বা রস জ্ঞানময় এবং জড় অজ্ঞানময়, তাহা দৈবীমীমাংসা-দর্শনের সূত্রেও স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা :—

"রসোজ্ঞানময়ো জড়শ্চাজ্ঞানময়ঃ ॥"

ব্রহ্মেই পরমানন্দের অবস্থিতি হইলেও, প্রাকৃতিক জীবগণ সেই ব্রহ্মানন্দের ছায়ামাত্র উপভোগ করিয়া থাকে। সেই আনন্দচ্ছায়া মহামায়াদ্বারাই আনীত হয়। পক্ষান্তরে মায়া আবার ভ্রমকারিণী হইবার কারণ, মায়া বা অজ্ঞানের আশ্রিত জীব ভ্রান্তিময় বিষয়ানন্দ অর্থাৎ বৈষয়িক সুখকেই ব্রহ্মানন্দ মনে করিয়া তাহাতেই লিপ্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বব্যাপক পরমানন্দরূপ পরমাত্মার আনন্দসত্তা নিখিল সংসারের সকল জীবেরই অন্তর্নিহিত থাকিবার কারণ, জীবের সমস্ত প্রবৃত্তি স্বতঃই সেই আনন্দলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকে। কিন্তু জীব মূলে অজ্ঞানরূপা মায়া বা অবিদ্যার অধীন হইবার কারণ, তৎপ্রদর্শিত আনন্দের ছায়ামাত্রকেই প্রকৃত আনন্দবোধে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল নশ্বর দুঃখপ্রদ ও আপাত-মনোরম বিষয়ানন্দকেই যথার্থ সুখ মনে করিয়া প্রতারিত হয়। যেমন কস্তুরী-মৃগ নিজ নাভিস্থিত কস্তুরীর গন্ধে উন্মত্ত হইয়া তাহার অন্বেষণে ইতস্ততঃ প্রদক্ষিণ করিয়া বিফল মনোরথ হয়, সেইরূপ অন্তরস্থিত পরমানন্দের ছায়া দেখিয়াও জীব অবিদ্যাবশে বাহিরে লৌকিক বিষয়ের মধ্যে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়া থাকে। এই কারণ ভক্তিতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুগণের সন্দেহ দূরীকরণ জন্য এবং তাহাদের লক্ষ্য-স্থির-মানসে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, "পরমাত্মায় জ্ঞানের নিত্য-বিদ্যমানতা প্রযুক্ত 'রসজ্ঞানময়'।"

জ্ঞানের পূর্ণতা হইলেই আনন্দের পূর্ণতা হইয়া থাকে। তাই পরাভক্তি-পরায়ণ জ্ঞানী, যোগীই পরমানন্দ লাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকেন। আনন্দময় পরমাত্মা এক অদ্বিতীয়, সর্ব্বভূতে অবস্থিত, সর্ব্বব্যাপক এবং প্রাণিসমূহের অন্তরাত্মা!

"একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষুগূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥"

জীবের অন্তরাত্মারূপ পরমাত্মার আনন্দসত্তা জগতের সর্ব্বত্র সতত বিদ্যমান থাকিলেও, সকলে একই ভাবে তাহা অনুভব করিতে পারে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সেই আনন্দ সাধারণতঃ প্রকৃতি-প্রতিবিম্বিত হইয়া আনন্দের ছায়ারূপে জীবের অন্তরে প্রভিভাত হইলেও, জীব তাহাকেই প্রকৃত আনন্দ বলিয়া মনে করে, কিন্তু প্রকৃতির অতীত অবস্থায় সেই শুদ্ধ নিত্য প্রকৃত আনন্দ ভূমানন্দ-রূপে অবস্থিত হইবার কারণ, একমাত্র ভক্তি-জ্ঞান বলেই জীব অষ্ট পাশ মুক্ত হইঁয়া তাহা অনুভব করিতে পারে। তাই সূত্রকার মহর্ষি বলিয়াছেন :—

"সৃষ্টেরতীতোবুদ্ধেশ্চ পরঃ স ভক্তিলভ্যঃ॥"

অর্থাৎ সেই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মা বিশ্বসৃষ্টি আদি প্রাকৃতিক সম্বন্ধের অতীত হইলেও, তিনি কেবল ভক্তিদ্বারাই লভ্য। অতএব সাধক তাঁহার প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া আনন্দ-ভাবোন্মত্ত অবস্থায় জ্ঞেয় বস্তুতে চিত্ত সংলগ্ন করিয়া অবশেষে সেই গুণাতীত পদ লাভ করিতে পারেন। সাধক ভক্তিমূলক সাধনাদ্বারাই ক্রমে উন্নত-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণপদ লাভ করিতে পারেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভক্তি অনুরাগাত্মিকা, কিন্তু বিষয়-ভেদে তাহা নানা ভাবাপন্ন। প্রথমতঃ লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে তাহা দ্বিবিধ, এ কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। লৌকিক অনুরাগ আবার বিষয়ভেদে সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। (১) পুত্র, কন্যা ও কনিষ্ঠাদির প্রতি নিম্ন প্রবহমান

যে অনুরাগ, তাহার নাম স্নেহ। (২) মিত্র, কলত্র ও সমান সমান ব্যক্তির প্রতি যে অনুরাগ, তাহাই প্রেম বা প্রীতি। (৩) পিতা, মাতা আদি গুরুজনদিগের প্রতি যে অনুরাগ তাহাকে শ্রদ্ধা বলে। এতদ্ব্যতীত (৪) ধনরত্ন, গৃহ, ভূমি আদি লৌকিক ঐশ্বর্য্যানুরাগ চতুর্থবিধ। এই চারি প্রকার লৌকিক অনুরাগই নশ্বর বিষয়াধারে অবস্থিত হইবার কারণ অচিরস্থায়ী; কিন্তু ভক্তি, পরমাত্মারূপ অবিনশ্বর আধারস্থিত হইবার কারণ তাহা অলৌকিক অনুরাগ স্বরূপ, তাহা লৌকিক অনুরাগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। জীব ধন-জনাদি নশ্বর বিষয়ানুরাগে মত্ত হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া থাকে, কখন কখন কেবল সেই বিষয়-সুখের বৃদ্ধির কারণেই তাঁহাকে মনে করে, তাহার স্বার্থ পরিপুষ্ট অন্তর কেবল তুচ্ছ স্বার্থের জন্যই তাঁহার নিকট অনুনয় বিনয় করে, তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করে, বণিক বুদ্ধিতে কিছু লৌকিক দ্রব্য-বিনিময়ে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করে, অথবা তাহার নিত্য সেব্য বিষয়নাশের আশঙ্কায় প্রবলের নিকট ক্ষণিকের জন্য মৌখিক সম্মান প্রদর্শনের ন্যায় তাঁহার প্রতি কেবল ভয়ে ভক্তির ভাণ করে। এরূপ ভক্তি দ্বারা তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় না, সাধকের মুক্তিমার্গ পরিষ্কৃতও হয় না।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি—ভক্তি অন্তকরণগত স্বাভাবিক ধর্ম্ম। চিত্তের পবিত্রতা আসিলেই ভক্তি আপনা আপনি উৎপন্ন হইয়া থাকে বা ফুটিয়া উঠে। জীবের জ্ঞাতাজ্ঞাত পুঞ্জীভূত পাপ-কালিমাই চিত্তের পবিত্রতা আনয়নে সম্পূর্ণ বাধা প্রদান করে বা সেই পবিত্রতারূপ অগ্নিপ্রভা পাপভস্মে সদা সমাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে; সাধক, প্রাণপণে সেই পাপ বিমোচনের জন্য যত্নপর হও, চিত্তের পবিত্রতা পরিবর্দ্ধিত হইবে, তোমার ভক্তি-স্রোত অবিরতভাবে প্রবাহিত হইবে। অতএব জন্মজন্মার্জ্জিত সেই পাপরাশি বিনাশের নিমিত্ত সাধকের নিত্য প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান

করা একান্ত কর্ত্তব্য। "প্রায়শ্চিত্ত" শব্দান্তর্গত 'প্রায়' শব্দের অর্থ তপস্যা এবং 'চিত্ত' শব্দের অর্থ নিশ্চয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—

"প্রায়োনাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে।
তপোনিশ্চয়সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্মৃতম্॥"

সুতরাং তপোনিশ্চয়ার্থক প্রায়শ্চিত্তই মুখ্য এবং তদর্থে বাহ্যানুষ্ঠান সমূহ গৌণ। শ্রীভগবানের সম্মুখে জ্ঞাতাজ্ঞাত আত্মপাপপুঞ্জ অসঙ্কোচে নিত্য নিবেদনপূর্ব্বক চিত্তবৃত্তি নিগ্রহসহ তাঁহাকে স্মরণরূপ তপস্যা বা উপাসনা করাই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন ঃ—

"প্রায়শ্চিত্তংতু তস্যৈকং ভগবচ্ছরণং পরং॥"

অতএব মুমুক্ষু সাধকগণ ভক্তি সাধনার্থ চিত্তের পবিত্রতা বৃদ্ধিকল্পে নিত্য এই ভাবে আত্মপাপ বিমোচনের জন্য উপাসনাঙ্গ তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

পূর্ব্বকথিত বৈধী আদি ত্রিবিধ ভক্তির ন্যায় গুণত্রয় ভেদে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য অনুসারে, ভক্তও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন। সাধকবৃন্দের অবগতির জন্য এস্থলে তাহারও বিভেদ বর্ণনা করা যাইতেছে। যথা, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী ভেদে ভক্ত তিন প্রকার।

প্রথম,—তমোগুণ প্রধান ভক্তই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত "আর্ত্ত ভক্ত" বলিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট। যাঁহারা সংসার-দুঃখ বা ভবরোগ যন্ত্রণায় নিতান্ত কাতর হইয়া আত্মহিত-কামনায় স্বীয় ইষ্টদেবতারূপ পরমাত্মার সমীপে করুণ প্রার্থনাসহ একান্তভাবে যখন তাঁহার অনুরাগী হইয়া পড়েন, তখন তাঁহাকে আর্ত্ত শ্রেণীর ভক্ত বলা যায়।

দ্বিতীয়,—রজোগুণ প্রধান ভক্তদিগকেই "জিজ্ঞাসু" বলা হইয়াছে। তাঁহারা ভক্তি-রহস্য অনুভব করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভববন্ধন-বিমুক্তি-বিষয়ে পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-

জিজ্ঞাসু হইয়া স্ব স্ব ইষ্টদেবের প্রতি ক্রমেই অভিনব অনু-রাগ দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া থাকেন। ভগবদ্‌বিষয়ে জ্ঞান-প্রাপ্তির জন্য সাধকের স্ববর্ণাশ্রম-বিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠান ও শ্রীগুরু-নির্দ্দিষ্ট উপাসনা-ক্রিয়ার অভ্যাসসহ সতত তাঁহারই চিন্তন ও আলো-চনা পরায়ণ ভক্তকেই জিজ্ঞাসু বলিয়া শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

তৃতীয়,—যাঁহারা কেবল পরমার্থলাভাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া অর্থাৎ আত্মোন্নতির প্রার্থনাসহ সতত আপন আপন ইষ্ট-দেবতার প্রতি অনুরাগী হইয়া থাকেন, তাহাদিগকেই "অর্থার্থী ভক্ত" বলা হইয়া থাকে। ইহা গুণত্রয় ভেদে সত্ত্বগুণ প্রধান ভক্তির লক্ষণ বলিয়া শাস্ত্রে নির্ণীত আছে। কেহ কেহ আবার এই অর্থার্থী ভক্তকে দুই ভাগে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। একরূপ পরমার্থ লাভের জন্য ক্রিয়াবান হওয়া এবং দ্বিতীয় ইহ-লৌকিক বা পারলৌকিক বিষয় অর্থাৎ রাজবৈভব বা স্বর্গাদি লাভের জন্য ভগবৎ কীর্ত্তনাদি সাধন করা, ইহা সকাম ভক্তি, ইহাকে তমোগুণানুগতই বলিতে হইবে।

এই আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী বা তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণ প্রধান ভক্ত ব্যতীত অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত আর এক প্রকার ভক্ত আছেন, তাহাদিগকে চতুর্থ বা জ্ঞানীভক্ত বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই জ্ঞানী ভক্তই পরিণামে পরাভক্তির অধিকারী হইতে পারেন। পূর্ব্ববর্ণিত গৌণী ও মুখ্য বা পরাভক্তির মধ্যে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী এই ত্রিবিধ ভক্তই গৌণী শ্রেণীর অন্তর্গত এবং তদতিরিক্ত কেবল চতুর্থ জ্ঞানী ভক্তকেই মুখ্য শ্রেণীর মধ্যে ধরা হইয়া থাকে।

গৌণী ভক্তির অন্তর্গত বৈধী ও রাগাত্মিকা ভক্তির মধ্যে বৈধীভক্তি সাধনায়, সাধককে ক্রমে নয় প্রকার ভক্তির অঙ্গ সাধন করিতে হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং স্বেষ্ট স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্॥"

অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্ব স্ব ইষ্টদেবতার স্মরণ, পাদ-সেবন, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনরূপ নয় প্রকার সাধনাই বৈধী ভক্তির নব অঙ্গ। এই সকল অঙ্গ সাধনায় যখন সাধক শ্রীভগবদ্‌সেবায় একান্তভাবে নিয়োজিত হন, তখন ক্রমেই তাঁহার ভক্তি স্ফুরণের কারণ স্বরূপ পবিত্রচিত্ত হইবার জন্য তাঁহার জ্ঞাতাজ্ঞাত সমস্ত পাপরাশি সমূলে বিনষ্ট হইতে থাকে। পরব্রহ্মের প্রেমময় পবিত্র যে কোন নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ হইবামাত্রই অন্তরের সকল পাপ বিদূরিত হয়। এইভাবে একাগ্রচিত্তে তাঁহার নামকীর্ত্তন ও স্মরণ করিলেও চিত্র পবিত্র হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন:—"এই স্মরণ কীর্ত্তন ভক্তিমার্গের সকল অবস্থারই প্রধান অঙ্গস্বরূপ।" গীতোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মবাচক প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিলে পরাভক্তিলাভের সুবিধা হইয়া থাকে।" ভক্তি দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়:—

"ভজনীয়ে না দ্বিতীয়মিদং কৃৎস্নস্য তৎস্বরূপত্বাৎ॥"

অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই একমাত্র ভজনীয়, তাঁহাকে বিদিত হইলে সকল বিষয়ই পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। কেননা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই তৎ বা তিনি অর্থাৎ পরম ব্রহ্মস্বরূপ, পরমভক্তের পক্ষে তাহাই ভজনার বস্তু। অতএব তাঁহারই নাম শ্রবণ, তাঁহারই গুণকীর্ত্তন এবং তাঁহারই সর্ব্বদা স্মরণরূপ ভজনাই পরমভক্তের অবলম্বনীয়। জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই এক আত্মা, জীবোপাধি বুদ্ধিও আত্মকৃত। জীব ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব, যখন মূল বস্তুকে ভুলিয়া প্রতিবিম্ব আপনাকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মনে করে, তখনই সেই ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব জীব শব্দ বাচ্য। বিভিন্ন পাত্রস্থিত জলে বা বিভিন্ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত এক বস্তুই যেমন বহুরূপে

প্রতিপন্ন হয়, সেইরূপ এক আত্মাই বহু জীবরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। দর্পণাদি প্রতিবিম্বগ্রাহী বহুবস্তুর অপনয়নে একই চন্দ্র বা সূর্য্য যেমন এক বলিয়াই বোধ হয়, তদ্রূপ জীবের ভ্রান্তি-জ্ঞান অন্তর হইতে নিবৃত্ত হইলে মুখ্য বা পরাভক্তির দ্বারা জীব ও ব্রহ্ম একই অনুভব হইয়া থাকে। কেবল বুদ্ধির ভ্রান্তিতেই পার্থক্য প্রতীত হয়। যখন প্রতিবিম্ব যে মূল বস্তু হইতে জাত বুঝিতে পারে, অর্থাৎ যখন সাধকের বুদ্ধি পরমেশ্বরে বিলীন হইতে থাকে, তখনই ক্রমে পরিবর্দ্ধিত জ্ঞানাগ্নিদ্বারা সকল কর্ম্মেরই ফল সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। তাহা পরাভক্তিরূপ মোক্ষের কারণ হইলেও ভক্তির সাধনা প্রথমাবস্থায় সেই নিগুর্ণ পরব্রহ্মের যে কোন সগুণ ভাবেরই ভজনা করা প্রয়োজন। অতএব বৈধী-ভক্তির সাধনার সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব গুরু নির্দ্দিষ্ট সগুণ ব্রহ্মের যে কোনও তত্ত্বাত্মক ইষ্টদেবতার নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও চিন্তনাদি রূপ ভজনাই বিশেষ ফলপ্রদ বা উন্নতি-প্রদায়ক বলিয়া মন্ত্রযোগাচার্য্য মহাত্মাদিগের অভিমত। সুতরাং সাধক এইভাবে তাঁহার ইষ্টদেবতার পূজা, অর্চ্চনা ও শ্রীচরণ সেবনাদি দ্বারা ক্রমে উন্নত-চিত্ত হইয়া দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন নামক বৈধীভক্তির চরম তিন অঙ্গের অভ্যাস করিতে থাকেন। ইহাই রাগাত্মিকা ভক্তির পূর্ব্বভাব বা পূর্ব্বরাগ। এই অবস্থায় সাধক শ্রীগুরু-নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মের সগুণ-ভাবাত্মক তাঁহার ইষ্টদেবতার সহিত পিতা, মাতা, ও সখা আদি যে কোনও ভাবে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সাধক তাঁহার ইষ্ট-দেবতাকে পিতা, মাতা, মিত্র, স্বামী, স্ত্রী, প্রভু বা পুত্রাদিরূপে যে কোনও একটীভাবে ভাবনা করিয়া, তদনুরূপ সম্বন্ধযুক্ত হইয়া, তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ-সহকারে তাঁহারই ভজনা করিয়া থাকেন। সংসারের সকল কর্ম্ম তাঁহারই; সাধক তাঁহারই নিয়োজিত ভৃত্য, কর্ম্মচারী বা প্রতিনিধিরূপে কর্ম্ম

করিতে করিতে তাহার ইন্দ্রিয়সমূহের যাবতীয় ব্যাপার যখন শ্রীইষ্টদেবতার নানাবিধ সেবায় অভ্যস্থ হইয়া যায়, তখনই সাধকের বৈধীভক্তির অন্তিম সাধনারূপ আত্মনিবেদন-ভাবের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাগত সাধকের মন,—তাঁহার ইষ্ট-দেবতার শ্রীচরণকমলে লীন, বচন—তাঁহারই গুণ গানে, হস্ত—তাঁহারই কর্ম্মসম্পাদনে, কর্ণ—সৎকথা শ্রবণে, নেত্র—তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি-সন্দর্শনে, অঙ্গ—তাঁহার গাত্র-সংস্পর্শে, নাসিকা—তাঁহারই শ্রীচরণ কমলের সদ্গন্ধ আঘ্রাণে, জিহ্বা—তাঁহার চরণামৃত বা প্রসাদাস্বাদনে, চরণ—তাঁহার অধিষ্ঠান-স্থান, পীঠ ও তীর্থাদি-পর্য্যটনে, মস্তক—তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে প্রণত হইতে এবং সর্ব্ববিধ কামনা তাঁহার সেবায় সমর্পিত হইয়া থাকে। এইভাবে বৈধীভক্তি সাধনায় সাধক তাঁহার ইষ্টদেবতারূপ শ্রীভগবানের কৃপায় সম্পূর্ণ একাগ্র হইয়া যান, যখন তাঁহার ধারণাভূমি সুদৃঢ় হইয়া তাঁহার চিত্তে ভক্তির অবিচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন তিনি অন্তরে বাহিরে যে অলৌকিক রসের অনুভব করিতে থাকেন, তাহাই সেই পবিত্রতর রাগাত্মিকা ভক্তি। এ অবস্থায় সাধকের চিত্ত পুলকিত, হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল ও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হইয়া যায় এবং নয়নযুগল হইতে অপূর্ব্ব আনন্দাশ্রু বিগলিত হইয়া সাধকের ঐকান্তিক সাধনার ফলস্বরূপ পবিত্র শান্তি অনুভব হইতে থাকে। এই রাগাত্মিকা ভক্তিতে নিমগ্ন সাধক কখনও মত্ত, কখনও বা স্তব্ধ, কখনও বা হৃদয়কমলস্থিত আত্মাতে অদ্ভুতরতিযুক্তভাবে যোগসম্বন্ধীয় ধারণাভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রসসমুদ্রের বিভিন্নভাবে নিমগ্ন হইয়া থাকেন, তাহার ফলে সর্ব্বদা নব নব আনন্দ ও অনির্ব্বচনীয় শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। সে অবস্থায় সাধকের বিষয়ানুরাগের লেশমাত্রও থাকে না। ইহাই রাগাত্মিকা ভক্তির চরম অবস্থা। ইহার পরই সাধকের পরাভক্তির উদয় হইয়া থাকে। তাহা ইতি-

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

রসরাজ শ্রীভগবানের প্রতি অনুরাগের আধারভূত গৌণ ও মুখ্য ভেদে রস-জ্ঞানেরও দ্বিবিধ বিভাগ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা আবার প্রত্যেকটী সাত সাতটী উপ-বিভাগে বিভক্ত। ভক্তি-মীমাংসা দর্শনে উক্ত হইয়াছে :—

"রসজ্ঞানমপি চতুর্দ্দশধা, তত্র সপ্তমুখ্যাঃ সপ্তগৌণাঃ ॥"

অর্থাৎ রসজ্ঞানও চতুর্দ্দশ প্রকার, তাহার মধ্যে সাতটী মুখ্য বা প্রধান ও সাতটী গৌণ বা অপ্রধান। হাস্যাদি সাতটী গৌণ রস এবং দাস্য, সখ্য, কান্তা, বাৎসল্য, আত্মনিবেদন, গুণকীর্ত্তন ও তন্ময়াসক্তি নামক সপ্তরস মুখ্য। এই সকল প্রকার রসের দ্বারাই সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তবে মুখ্য সাতটী রসের আসক্তির মধ্যে কোন মলিনতার সংস্পর্শ না থাকায়, তাহা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভক্তের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। অন্তে পরাভক্তিও এই মুখ্য রসের সেবা-দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে। ভাবপ্রদ তন্ময়াসক্তিরূপ ভাবসাগরে উন্মজ্জন ও নিমজ্জন দ্বারা পরাভক্তির উদয় হয়। তাই সূত্র-কার মহর্ষি বলিয়াছেন :—

"পরালাভো ব্রহ্মসদ্ভাবিকাত্তন্ময়াসক্ত্যুন্মজ্জননিমজ্জনাৎ ॥"

পরমাত্মার স্বরূপ জ্ঞানকেই পরাভক্তি বলে। এই অবস্থায় ভক্ত সকল ভূতে সচ্চিদানন্দরূপ ভগবৎভাব এবং স্থূল মূর্ত্তির ন্যায় ভগবানেই নিখিল চরাচর জগৎ দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হন। ইহাই জ্ঞান ও ভক্তির সাম্যাবস্থা।

ভক্তি ও ভক্তের অনুরূপ গুণত্রয়ের বিভেদ অনুসারে উপা-সনা-পদ্ধতির তিন প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। পরব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণাদি ভেদে উপাসনার যেরূপ ভেদ নির্ণীত হইয়াছে, সাধকগণের অবগতির জন্য তাহাও বর্ণিত হইতেছে। অনুসন্ধিৎসু সাধকের এসকল বিষয় জানিয়া রাখা

প্রয়োজন। ত্রিবিধ উপাসনা ভেদের মধ্যে ১ম। ব্রহ্মোপাসনা—নির্গুণ, সগুণ বা লীলাবিগ্রহাদির উপাসনা ভেদে ইহা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। ২য়। দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের উপাসনা। ৩য়। ভগবানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি, যথা—উপদেবতা, যক্ষ, রক্ষ, নায়িকা, ক্রমে প্রেত ও পিশাচাদি এবং স্থূল জড়োপাসনাও ইহার অন্তর্গত। ইহাই যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ প্রধান সাধকগণের ত্রিবিধ উপাসনাক্রম। যে কোনও সাধকের আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উপাসনারও উন্নতি হইতে থাকে।

ইহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর উপাসনা অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনাই সাধকের পরম কল্যাণকর ও একমাত্র মুক্তিপ্রদ বলিয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু অধিকার না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা সকলেরই সাধারণভাবে উপাস্য হইতে পারে না। সেই কারণ আর্য্য-শাস্ত্রকার ঋষিমুনিগণ এই ব্রহ্মোপাসনার চতুর্ব্বিধ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গুণাতীত পরব্রহ্মের উপাসনা-প্রণালীর অন্তর্গত নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাই সর্ব্বোচ্চ অধিকারীর বা প্রথম শ্রেণীর পক্ষে অবলম্বনীয়। ব্রহ্মের সগুণ উপাসনা দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকারীর পক্ষে ফলপ্রদ, তৃতীয় শ্রেণীর উপাসকগণ ব্রহ্মবুদ্ধিসহ শ্রীভগবানের অবতার বা লীলাবিগ্রহের উপাসনা করিয়া থাকেন। এই ত্রিবিধ উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা বলিয়া শাস্ত্রসম্মত। তবে এই ব্রহ্মোপাসনার মূল ভিত্তি শ্রীগুরুদেবের উপাসনা, তাহাও ব্রহ্মবুদ্ধিসহ প্রত্যেক সাধকেরই সর্ব্বপ্রথম অবলম্বনীয়। শাস্ত্রে তাহা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ব্রহ্মোপাসনার অতিরিক্ত চতুর্থ শ্রেণীর বা প্রবেশিকা উপাসনা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

গুরু, জগদ্গুরু ও অবতার পূজা।

গুরুকরণ ও গুরুপূজা উপাসকমাত্রেরই প্রথম অবলম্বনীয়; সুতরাং গুরুর আশ্রয় ও উপদেশ ব্যতীত সাধক কিছুতেই উপাসনার কোনও উন্নতকর্ম্মে অগ্রসর

বা অন্তে পূর্ণ-মনস্কাম হইতে পারেন না। এই হেতু সর্ব্বপ্রকার দীক্ষা ও অভিষেকাদি অথবা তদনুরূপ কোন প্রাথমিক কার্য্য উপলক্ষে গুরু কিম্বা আচার্য্য-নির্দ্দেশ জগতের সকল ধর্ম্মোপদেষ্টাই একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আর্য্য-ঋষিবৃন্দ সেই গুরুকরণ প্রথা অতীব গভীর বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মোপাসনার প্রকৃত কেন্দ্র নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। আবার ভক্তিবাদের প্রথম সূত্রও এই স্থান হইতে আরব্ধ হইয়াছে। তুমি তোমার তত্ত্ব-প্রাধান্যমূলক* যে কোনও সম্প্রদায় ভুক্ত হও না, তোমার গুরুদেব এখন তোমার সর্ব্বস্বধন, তোমার ভক্তিপ্রবাহের গঙ্গোত্তরী-ধারা, তোমার ভবপারাবারে পথ-প্রদর্শকরূপ কেবলই একজন বিশিষ্ট মহাপুরুষ নহেন, তিনি তোমার—

"গুরু ব্র্হ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণুঃ গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম × × ×॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি সগুণ দেবতারা এমন কি সূক্ষ্মভাবে নির্গুণ পরব্রহ্মও তিনিই! সেই অবাংমনসোগোচর পরব্রহ্ম যে কি বস্তু, তাহা তদ্বদ্দশাপ্রাপ্ত ও যোগযুক্ত অভিজ্ঞ সাধককুলতিলক মহাপুরুষগণেরই একমাত্র উপলব্ধির বিষয়ীভূত, সাধারণ নবীন সাধকের পক্ষে তাহার ত কোন আস্বাদই পাইবার উপায় নাই। সেই হেতু প্রথম হইতে সেই অনাদি ও অনন্তের একটী অতি সূক্ষ্মতম বিশিষ্ট পরমাণুকে শাস্ত্র পরংব্রহ্মস্বরূপ "কেবলং জ্ঞান মূর্ত্তিং" শ্রীগুরুদেব বলিয়া ধারণা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে যখন সেই লোকনাথ শ্রীভগবানরূপী গুরুদেব শিষ্যের শক্তি ও সামর্থ্যানুসারে উপদেশ দিয়া শিষ্যের কল্যাণ সাধন করিতে থাকেন, তখন শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবান উভয়ের স্থূল ও

* গুরু প্রদীপে "তত্ত্ব বিচার" এবং এই গ্রন্থে "পঞ্চাঙ্গ সেবন" মধ্যে তত্ত্বপতির বর্ণনা দেখ।

সূক্ষ্ম প্রাণতত্ত্বের একপ্রকার অদ্ভুত একতা সংঘটিত হইয়া থাকে এবং তখনই সেই স্থূল গুরুপীঠে ব্রহ্মজ্ঞান কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে। এই কারণ শ্রীগুরুদেবই ভক্তিমান শিষ্যের মুক্তিদাতা মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে শ্রীগুরু মূর্ত্তিতে শিষ্যের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন অনুসারে পূর্ণকলা শ্রীভগবানের ন্যূনাধিক কিয়ৎ পরিমাণ প্রত্যক্ষকলা-বিভূতি বা ভগবচ্ছক্তির আবির্ভাব হইবার কারণ শ্রীগুরুদেবই ভগবদ্দর্শন ও মুক্তি-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষের প্রধান নিদান জানিতে হইবে। ইহাই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মোপাসনার মূল পন্থা। আর ইহাই গূঢ় তন্ত্রশাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। সাধনা শিক্ষা করিতে হইলে যে, গুরুর আবশ্যক তাহা সর্ব্বশাস্ত্রে সকল সম্প্রদায়ে এক বাক্যে স্বীকৃত হইলেও, শ্রীগুরুদেবে ভক্তি ও গুরু পূজা পদ্ধতি তন্ত্র. ভিন্ন আর কোন শাস্ত্রেই পরি-লক্ষিত হইবে না। সকল শাস্ত্র কেবল পাঠ করিয়াই নিজ বুদ্ধি বলে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু সাধন শাস্ত্রে, গুরুর প্রত্যক্ষ উপদেশ ব্যতীত একটী পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। অতএব গুরু পূজাই মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মোপাসনার মূল-ভিত্তি জানিতে হইবে।

ব্রহ্মোপাসনার ক্রমোন্নত দ্বিতীয় পন্থা—জগদ্গুরু অথবা পূর্ণা-ভাস বা পূর্ণকলাবিশিষ্ট ভগবানের কোন কোনও অবতার কিম্বা বিশিষ্ট ব্রহ্মবিভূতির উপাসনা। শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব, শ্রীবুদ্ধ ও শ্রীশঙ্করাদি যে, ভগবান বিষ্ণু বা মহেশ্বরাদি দেবতাদিগের প্রত্যক্ষ অবতার, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অধুনা বৈষ্ণবী-কলা ও প্রভাবপুষ্ট মান্বন্তরীয় যুগে বিষ্ণুর দশাবতারের বিষয়ই সাধারণে বিশেষ অবগত আছেন, কিন্তু শাস্ত্রে আরও অনেক অবতারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্‌বিষ্ণুভাগবতেই বিষ্ণুর চতুর্ব্বিংশতি অবতারের উল্লেখ আছে। শ্রীমন্মহর্ষি ব্যাসও তাঁহাদের অন্যতম। এতদ্ব্যতীত সৌর, শৈব ও গাণপত্যাদি পুরাণ গ্রন্থে যথাক্রমে সূর্য্য,

শিব ও গণেশাদি দেবতাগণেরও বহু অবতারের উল্লেখ আছে। তত্ত্বপ্রাধান্যমূলক উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাদেরও উপাসনার বিধি-নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব সম্প্রদায় মধ্যে জগদ্‌গুরুর স্বরূপ; সুতরাং ব্রহ্মোপাসনা উপলক্ষে তাঁহাদের উপাসনাই পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় পন্থার অন্তর্গত। সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে শ্রীভগবানের কলাবিকাশ সম্বন্ধে এস্থলে কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইতেছে।

কলাভেদে সৃষ্টিক্রম ও অবতার রহস্যাদি

অধ্যাত্মতত্ত্বদর্শী পূজ্যপাদ ঋষিবৃন্দ বলিয়াছেন—অনন্তকলাধার পরব্রহ্মের বা ব্রহ্মশক্তির একটীমাত্র কলা হইতে যোড়শ কলা পর্য্যন্ত এই সংসারে প্রকটিত হইয়া বিশ্বমধ্যে ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ চৈতন্যস্বরূপ প্রতীত হইয়া থাকে। ব্রহ্মবিবর্ত্তন বিষয়ে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়, সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মবস্তুর সৎ ও চিৎ প্রধান সত্তার ন্যূনাধিক্যবশতঃ আনন্দ সত্তার প্রতিরূপ স্থাবর জঙ্গমাত্মক জড় ও চৈতন্যময় যাবতীয় বস্তুর বিকাশ হইয়াছে। তন্মধ্যে চৈতন্য সত্তার অস্তিত্ব প্রকাশক জীবকোটীর অন্তর্গত চতুর্ব্বিধ ভূতবর্গ অনুসারে পৃথিবীতে জীবাদি সৃষ্টির চারিটী ক্রম আছে। যথা—উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ। এই চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রামে ভগবানের চৈতন্য সত্তারূপ জীবকোটী সৃষ্টি ব্যতীত তাঁহার জড়কোটী বা স্থূলাত্মক জড়রাজ্যেও বিবিধ বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতেও তাঁহার ব্যাপক চৈতন্যসত্তা বিদ্যমান আছে। ধাতু, প্রস্তর ও মৃত্তিকাদি পার্থিব জড়বস্তুসমূহ তাঁহার সেই ব্যাপক-চৈতন্যরূপ অধিদৈব শক্তির আশ্রয়ে প্রাকৃতিক গুণযুক্ত হইয়া বিভিন্ন পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"এষু সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠত্যবিরলঃ সদা।"

এই ভগবচ্ছক্তিই সর্ব্বভূতে ব্যাপকরূপে অবস্থিতি করিতেছেন,

এস্থলে তাহার বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই, তবে এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যা-বস্থাময়ী মূল প্রকৃতি পরে ত্রিগুণের বৈষম্য বা বিভিন্নরূপ প্রাধান্য ভেদে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ব্যাপারে ত্রিধারূপিণী হইয়া আছেন; শাস্ত্রে তাহাকেই ত্রিকোটীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রথম,—জড়-কোটী; ইতিপূর্ব্বেই তাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ তমোগুণ-প্রধান, কিন্তু তাহাদের মধ্যে নানা অবস্থা ভেদে বিবিধ অধিদৈব শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়,—জীবকোটী তমো-গুণাশ্রিত হইয়াই রজোগুণ প্রধান এবং তৃতীয়,—দেবকোটী তাহা সত্ত্বগুণ প্রধান। দ্বিতীয় জীবকোটী এবং তৃতীয় দেবকোটী সম্ব-ন্ধেই এইবার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

বিশ্বমধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তমোগুণ প্রধান জড়কোটীকে আশ্রয় করিয়াই রজোপ্রধান জীবকোটীর বিকাশ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই জীবকোটীই "ভূত-গ্রাম চতুষ্টয়" অর্থাৎ স্থূল ভূতাত্মক উদ্ভিজ্জাদি জীবকোটী বিকাশের চারিপ্রকার ক্রম সতত্ঃ জগতে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহজগতে প্রকাশমান শ্রীভগবানের ষোড়শকলা চৈতন্যের এক অংশ বা এক কলা মাত্র হইতে উদ্ভিজ্জের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃতির তমো-প্রধান জড়অঙ্গে পঞ্চভূতের বিচিত্র সমাহারে সেই এক কলা মাত্র ব্রহ্মবি-ভূতি বা চৈতন্যের সংযোগে জীবকোটীর এই প্রথম ক্রমের বিকাশ হইয়াছে। অতি সূক্ষ্ম শিয়ালা (মস্) হইতে ক্রমে মহীরূহ পর্য্যন্ত এই প্রথম ভূতগ্রামের অন্তর্গত। এই গ্রাম হইতেই জীবের জীবনীশক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। সৃষ্টি, পুষ্টি ও বিনষ্টি বা জন্ম, বাল্য, যৌবন, বৃদ্ধ, জরা ও মৃত্যুরূপ জীবসুলভ সকল অবস্থাই এই সময় হইতে প্রতীত হইয়া থাকে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামক পঞ্চ-কোষও এই সময় হইতে অব্যক্ত প্রাকৃতিক বিধানে জীবকোটী বা ভূতগ্রাম মধ্যে সংযো-

জিত হইয়া থাকে। সুতরাং জড় ও জীবের প্রধান পার্থক্য এই-স্থল হইতেই নির্ণয় হইয়া যায়, অর্থাৎ মৃৎ, প্রস্তর ও ধাতু আদি জগতের সমস্ত জড়-বস্তুতে শ্রীভগবানের ব্যাপক-চৈতন্যমাত্রই বিদ্যমান আছে, কোষময়-চৈতন্য আদৌ নাই, কিন্তু জীবে ব্যাপক-চৈতন্য ব্যতীত কোষময়-চৈতন্যেরও পূর্ণ অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে, তবে জীব-সৃষ্টির ক্রম-বিকাশ অনুসারে সেই অস্ফুট কোষ গুলি-রও ক্রমে বিকাশ হইতে থাকে।

শ্রীভগবানের এক কলাবিকাশে উদ্ভিজ্জ-সৃষ্টির ন্যায় তাঁহার দুই অংশ পরিমাণ কলাবিকাশ স্বেদজ বা কীটজাতীয় জীবাণুর (ব্যাসিলি) সৃষ্টি হইয়াছে, এই শ্রেণীর জীব বা কীট এত সূক্ষ্ম আকার-বিশিষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে যে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত সাধারণ চক্ষে তাহা কিছুতেই প্রত্যক্ষ করা যায় না। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এমন কি বায়ু তরঙ্গের মধ্যেও তাহা অদৃশ্যভাবে অসংখ্য অসংখ্য বিচরণ করিতেছে। তাহাই এবং ক্রিমিকীটাদিও সেই ভূতগ্রাম মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রামের অন্তর্গত।

পূর্ব্বোক্তরূপে তাঁহার তিন অংশ পরিমাণ কলাবিভূতিতে অণ্ডজ জীবের আবির্ভাব হইয়াছে। কীটপতঙ্গ হইতে নানা জলচর, স্থলচর ও খেচর আদি জীব যাহারা অণ্ডাধারে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহারাই জীবকোটী বা ভূতগ্রাম-মধ্যে তৃতীয় গ্রাম বা তৃতীয় পর্য্যায়ের অন্তর্গত।

অনন্তর শ্রীভগবানের চারিকলা পরিমাণ বিভূতিতে জরায়ুজ জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারাই জীব পর্য্যায়ে চতুর্থ শ্রেণীর অন্ত-র্গত। ইহারা একেবারেই জীবাকারে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। সমুদয় পশুজাতি হইতে মনুষ্যজাতির নিম্ন পর্য্যন্ত এই চতুর্থ ভূত-গ্রামের অন্তর্নিবিষ্ট। সেই হরিদ্বর্ণ অতি সূক্ষ্ম শিয়ালাটী (মস্) হইতে তৃণ, গুল্ম, লতা, বৃক্ষ, মহীরূহ, চক্ষের অগোচর কীটাণু, ক্রিমি, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, সমুদয় পশু ও বানরজাতি এবং

বন্য মনুষ্য পর্য্যন্ত সগুণ ব্রহ্মের বা শ্রীভগবান ঈশ্বরের কলাচতুষ্টয়ের বিবর্ত্তন মাত্র। অতঃপর জরায়ুজ জীবরূপে চতুর্থ ভূতগ্রামের পরিপুষ্টির বা চরমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবে উক্ত চারি কলার অতিরিক্ত যেমন যেমন ভগবৎ-কলার বিশেষরূপে বিকাশ হইয়াছে, তেমনই উত্তরোত্তর তাহাদের লৌকিক জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রতিভা ও পরে ব্রহ্মজ্ঞানাধিকার বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে। উক্ত চারি কলাবিভূতি-বিকাশের পর পঞ্চকলার পূর্ণত্বের মধ্যেই অর্থাৎ চারিকলা হইতে ক্রমান্বয়ে পাদ, অর্দ্ধ, ও ত্রিপাদাদি কলা-বৃদ্ধি ভেদে, শূদ্রাদি চারিবর্ণে বিভক্ত মনুষ্যের পরিপুষ্টি হইয়াছে। শ্রীভগবানের চারিকলাবিশিষ্ট জরায়ুজ জীব সৃষ্টির পর বিশ্বের ক্রমোন্নতি ধর্ম্মানুসারে বুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রতিভামূলক পুরুষার্থ-শক্তিযুক্ত এবং মোক্ষপ্রদ দেহান্বিত মনুষ্য-সৃষ্টি-বিধানে শ্রীভগবানের সপাদ চারিকলায় শূদ্র, সার্দ্ধ চারিকলায় বৈশ্য, পাদোন পঞ্চকলায় ক্ষত্রিয় এবং পূর্ণ পঞ্চকলায় ব্রাহ্মণ বর্ণের বিকাশ হইয়াছে। উদ্ভিজ্জ হইতে চৌরাশি লক্ষ যোনি ক্রমান্বয়ে পরিভ্রমণ উপলক্ষে উদ্ভিজ্জে বিশ লক্ষ, স্বেদজে এগার লক্ষ, অণ্ডজের মধ্যে মৎস্যাদিতে নয় লক্ষ, পক্ষীতে দশ লক্ষ, জরায়ুজের মধ্যে সমস্ত পশু জাতিতে ত্রিশ লক্ষ এবং বানরে চারি লক্ষ; সর্ব্বশুদ্ধ এই চৌরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণের পর পুনরায় কত সহস্র লক্ষ যোনিতে জন্ম ও জন্মান্তরের কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান যোগাদি সাধনার কর্ম্মফলে জীব পঞ্চ বা পাদোন পঞ্চকলাবিভূতিপুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণের বা শুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অথবা সদ্বংশে জন্ম লাভ করিতে পারে। শ্রীমদ্‌ভগবান গীতোপনিষদে সাধকের জন্ম বিষয়ে তাই বলিয়াছেন :—

"প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥"

যোগানুশীলপর ব্যক্তি সম্পূর্ণ সিদ্ধির পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়া বিবিধ পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগের কারণ পুণ্যকারীগণের উপযুক্ত

লোকসকলে বহু বৎসরকাল ভোগসুখ অনুভব করিয়া পরে শুচি অর্থাৎ শুদ্ধ রজোবীর্য্য-সমন্বিত পবিত্র বংশে অথবা শ্রীমান অর্থাৎ লক্ষ্মীমন্তের গৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন।

"অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥

অথবা তিনি জ্ঞানী যোগিগণেরই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এইরূপ জন্ম, নিশ্চয়ই জগতে দুর্লভতর। এই অবস্থায় সাধকপ্রবর অবিরত যোগাদি সাধনার ফলেই ব্রহ্ম-বিষয়ক বুদ্ধিলাভ পূর্ব্বক যথাক্রমে ষট্ ও সপ্ত কলায় পরিপুষ্ট হইয়া উচ্চ ও উচ্চতর গুরু-পদবীতে বরণীয় হইবার যোগ্য হইয়া থাকেন। এই সময়েই সেই জীব-সাধারণ-সুলভ অন্নময়াদি কোষের অন্তর্নিহিত অতি সূক্ষ্মতম পঞ্চম স্তর বা আনন্দময় নামক পঞ্চম কোষ সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া সাধক জীবন্মুক্তি লাভ করিবার পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। সুতরাং ষট্ কলা ও ক্রমে সপ্ত কলার বিভূতি লাভ করা জীবের সহজ সাধ্য বস্তু নহে। এইরূপ অসাধারণ ব্রহ্ম-বিভূতি-পুষ্ট শক্তি-শালী মহাপুরুষই যথাক্রমে নানা সাধন শাস্ত্রাদির ভাষ্য ও নূতন শাস্ত্র সঙ্কলন করিয়া সাধনাভিলাষী সাধারণ সাধকবৃন্দের তথা জগ-তের প্রভূত কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন। ইহাঁরাই কালে উচ্চ ও উচ্চতর শ্রেণীর গুরুর স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। শ্রীভগ-বানের অষ্ট-কলাবিশিষ্ট মনুষ্যরূপী মহাত্মা উচ্চতম গুরুস্থানীয় ও সর্ব্বদেশপূজ্য, তাঁহারাই জীবকল্যাণপ্রদ বিবিধ সাময়িক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। উদাহরণ স্বরূপে এস্থলে কোন মহাত্মার নাম না করিলেও, এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, এই অষ্টকলা বিভূতি-পুষ্ট হইয়াই কোন কোন মহাত্মা দেশ, কাল ও পাত্রোপ-যোগী উপধর্ম্মের * প্রতিষ্ঠাকল্পেই জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক প্রাচ্য ও প্রতী-চ্যের মধ্যে সাময়িক সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রচার করিয়া অমরত্ব

* উপধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রথমোল্লাসেই বর্ণিত হইয়াছে।

লাভ করিয়াছেন।

এই অষ্টকলা পূর্ণ হইলেই মানব অষ্টপাশ বা জীবমায়া বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন। ইহাই জীব-শিবের সন্ধিস্থল বা মধ্যভূমি। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—

"পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ ॥" †

অর্থাৎ সেই মায়ারূপ অষ্টবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইলেই জীব শিবত্ব বা দেবত্বের গণ্ডীর মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। ষোড়শকলা-বিশিষ্ট ভগবদ্বিভূতির ঠিক মধ্যস্থল অর্থাৎ অষ্টম কলার পর এবং নবম কলার পূর্ব্বে, উভয়ের সন্ধি অবস্থা, এই সঙ্গমস্থল অতিক্রম করিলেই জীব সম্পূর্ণ জীবত্ব নাশ করিয়া দেবকোটীর মধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ তখন তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ত্রিধারূপিণী প্রকৃতির সত্বগুণ-প্রধান দেবকোটীর অন্তর্ভুক্ত হইতে থাকেন। পক্ষান্তরে ইহার পর হইতেই শুদ্ধ রজোবীর্য্যের প্রধান আধার শ্রীভগবানের নিত্য লীলানিকেতন আর্য্যভূমির অভিনব বিচিত্র বিধান—সনাতন-ধর্ম্মোক্ত অবতার-বাদের সূত্রপাত হইয়াছে। অনন্তর নবম কলা হইতে ষোড়শ কলার বিকাশ পর্য্যন্ত যথাক্রমে তাঁহার অংশাবতার ও তাঁহার পূর্ণাভাসে পূর্ণাবতারে তাহা পরিসমাপ্ত হইয়া থাকে। বুদ্ধ, শঙ্কর, রাম ও কৃষ্ণ আদি বহু অবতারে তাহা যুগ যুগান্তরে প্রতীত হইয়াছে। শাস্ত্রে ইহাঁদের প্রত্যেকরই কলা-পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। বাহুল্য বোধে ও বৃথা সাম্প্রদায়িক বিরোধ আশঙ্কায় তাহা এস্থলে বর্ণিত হইল না।

জীবের ক্রমোন্নতিবাদ ও দশাবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রে অন্যভাবেও বর্ণিত আছে যে, ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির গুণ বৈষম্যানুসারে প্রথমে আকাশতত্ত্ব * সৃষ্ট হয়, পরে সেই আকাশে ইচ্ছাময়ী প্রকৃতির

† সপ্তমোল্লাসে মুক্তিতত্ত্ব অধ্যায়ে পাশ ও পাশমুক্তি অংশ দেখ।

* আকাশাদি তত্ত্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে পঞ্চমোল্লাসে "তন্ত্রে সৃষ্টির ক্রম ও তন্মাত্রাদি বিচার" দেখ।

ইচ্ছাবশে বায়ুর সঞ্চার হইল, বায়ুর বিভিন্ন গতির প্রবাহে বা তাহার পরস্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ গতির সংঘর্ষে আবর্ত্তময়ী তেজ-শক্তি বা অগ্নি উৎপন্ন হইল, অনন্তর অগ্নির তাপ ও বায়ুর শৈত্য-সহযোগে জলকণিকাত্মক বাষ্পের উদ্ভব হইল, তাহার পর সেই জলসমষ্টি হইতেই ক্ষিতি বা পৃথিবী সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবী হইতে উদ্ভিজ্জ বা বনস্পতি, ইহাকে ওষধিও বলে। এই ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে পুরুষ সৃষ্টি হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও এই কথা স্পষ্ট ভাবে উক্ত হইয়াছে :—

"আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ।
তদ্ভ্য পৃথিবী। পৃথিবীভ্যোবনস্পতি। বনস্পতিভ্যঃ ওষধিঃ।
ওষধিভ্যোঽন্নং। অন্নাদ্রেতঃ। রেতসঃ পুরুষঃ॥"

এইভাবে আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হইতে স্থূল পঞ্চভূতাত্মক জল ও পৃথিবীর সৃষ্টি হইলেই তাহাতে উদ্ভিজ্জ পরমাণুরূপে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীভগবানের এক কলা পরিমাণ বিভূতি বা জীব-চৈতন্যের বিকাশ হইল। অনন্তর তাঁহার দুই কলা বিভূতি-বিকাশের দ্বারা ক্রমে সেই স্থূল জল, বায়ু ও পৃথিবী আশ্রয় করিয়াই অগণ্য বিবিধ কৃমি-কীটাদিরূপ দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ স্বেদজ জীবের সৃষ্টি হইল। তখন হইতেই সেই উদ্ভিজ্জাণু ও কীটাণুগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কীট বা জীবগুলির দ্বারা ভক্ষিত হইতে লাগিল। ইহাই সংসারে জীব জীবের ভক্ষ্যরূপে তাঁহারই আসুরী-লীলার প্রথম বিকাশ! ইহাই শ্রীভগবানের অসৎ বা তমোগুণাত্মক মলিন-চৈতন্যসত্তা। ইহা-কেই পৌরাণিকী-ভাষায় তাঁহার কর্ণমল-সম্ভূত মধু বা জল-কীট-রূপ মধুকৈটভ নামক মহারাক্ষস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার অসৎ-শক্তি-পরিতুষ্ট মহাপরাক্রান্ত সেই মধুকৈটভই ক্রমে তাহার অতীব ভীষণ রাক্ষসী-লীলার চরম অবস্থায় যেন প্রথমে বিশ্ব-সৃষ্টি গ্রাসের বা বিলয়ের উপক্রম করিয়া তুলিল বা বিশ্বসৃষ্টির মূলাধার ভগবান ব্রহ্মাকেই বুঝি গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

তখন বিশ্বসৃষ্টির ক্রম অক্ষুণ্ণ রাখিবার আশায় ব্রহ্মা অনন্যোপায় হইয়া বিশ্বজননী মহামায়ার তপস্যা করিয়া বিশ্বরক্ষক ও বিশ্ব প্রতিপালক ভগবান বিষ্ণুর যোগনিদ্রা অপনোদন করিলেন। কারণ তাঁহারই দৃষ্টির অভাবে এই ভীষণ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। ভগবান বিষ্ণু জাগ্রত হইয়াই সেই ভীষণ মধু-কৈটভকে সম্মুখে দেখিয়া আর কাল বিলম্ব করিলেন না, তখনই মৎস্যাবতার-রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন ও সেই রাক্ষ-সের মেদে এই মেদিনীর সৃষ্টি এবং পরিপুষ্টির সহায়তা করিলেন। অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত রূপ জল সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জলে থাকিবার উপ-যুক্ত কীট, ক্রমে মৎস্যাদি সকল জলচর জঙ্গম-জীবের প্রথম সৃষ্টি হইল। সেই কীট ও মৎস্যাদির অস্থি এবং মেদাদি সঞ্চিত হইয়া কত কোটী কোটী বৎসরে যে এই মেদিনীর সৃষ্টি হইয়াছে তাহা তিনিই জানেন। যাহাহউক জলতত্ত্বের মধ্যে কীটাদি হইতে ক্রমে তাহার সর্ব্বশেষ পরিণতি সুবৃহতায়তন মৎস্য সৃষ্টি হইল। শ্রীভগ-বানের সৃষ্টি মধ্যে তাঁহার চৈতন্য কলা বিকাশ সম্বন্ধে এই স্থলেই তাঁহার একটী স্তবের পরিসমাপ্তিস্বরূপ তিনি মৎস্যাবতাররূপে মধুকৈটভরূপী বিশ্ববিধ্বংসী সেই প্রথম রাক্ষসী-লীলার একবার অবসান করিয়া সৃষ্টি ব্যাপারে নূতন ভাবের সূত্রপাৎ করিয়া দিলেন; অথবা দুষ্টের দলন ও শিষ্টের পালনার্থে তাঁহার অলৌ-কিক বিভূতি-বিকাশে প্রথমেই মৎস্যরূপে একবার সংসারে আপনাকে ধরা দিলেন।

অতঃপর যখন সেই জলের মধ্যে ধীরে ধীরে উক্ত জীব-মেদ-সমুদ্ভূতা মেদিনী বা স্থূল মৃত্তিকার সঞ্চয় হইতে লাগিল, তখন মৎস্যাদির ন্যায় কেবল সন্তরণশীল জীব ব্যতীত একাধারে সন্তরণ ও সেই মৃত্তিকার উপরে পদ-সঞ্চালন দ্বারা চলিবার উপযোগী দ্বিতীয় শ্রেণীর জীবেরও সৃষ্টি হইল। অর্থাৎ সেইরূপ জীবশ্রেণীর পরিপুষ্টি ও পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দ্বিতীয়

লীলার অনুকূল কূর্ম্মাবতারের আবির্ভাব হইল। এইভাবে জলস্তর ছাপাইয়া যখন মৃত্তিকা আরও উচ্চ হইল, স্থানে স্থানে ভূমি জল-সিক্ত পঙ্কিল কর্দ্দমে পরিণত হইল, তাহাতে কচুী বা কচু জাতীয় উদ্ভিদ ও নানা জলজতৃণের উদ্ভব হইল, তখন সেইরূপ স্থলের বাসোপযোগী জীবেরও সৃষ্টি হইল। শ্রীভগবানের তিন অংশ কলা-বিকাশের পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার তৃতীয় লীলার অনুকূল বরাহা-বতারের আবির্ভাব হইল। এইরূপ জরায়ুজ শ্রেণীর অন্তর্গত পশু-সৃষ্টির শেষ সময়ে এবং মনুষ্য-সৃষ্টি-বিধানের প্রারম্ভে পশুরাজ সিংহ-স্বভাববিশিষ্ট নররূপে তাঁহার চৈতন্য-কলার চতুর্থ লীলা-ব্যাপারে নরসিংহ-বিগ্রহ অবতারের আবির্ভাব হইল। তাহার পরই তিনি পূর্ণ নরাকারে আবির্ভূত হইলেন, কিন্তু তখনও তিনি সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট দেহে সংসারে দেখা দিলেন না, তিনি স্বীয় অপূর্ব্ব পঞ্চম লীলা-প্রসঙ্গে অতি খর্ব্বাকার বামনরূপেই সৃষ্টির চিরন্তন ক্রমোন্নত ধারা জগৎকে প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর পূর্ণ নরাকারে শারীরিক উন্নতি, বল ও বীর্য্যের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ পরশুরামরূপে তিনি একবিংশতিবার জগতের তেজাধার ক্ষত্রশক্তিকেও বিদলিত করিয়া আত্মলীলা বিকাশ করিলেন। এই শারীরিক বলের পরিবর্ত্তে যখন জগতে ক্রমে নৈতিক বলের প্রয়োজন হইল, তখন তিনি নীতিনিপুণ রামচন্দ্ররূপে জগতে আদর্শ নীতি-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ও উপদেশ প্রদানের ছলে অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করিয়া যাইলেন। আবার তাহার পরই অর্থাৎ বল ও বুদ্ধিবৃত্তির পরি-পুষ্টির পরবর্ত্তী অবস্থায় আত্মার সম্পূর্ণ উন্নতি বা মুক্তিমূলক জ্ঞান-বৈরাগ্যের উপদেশক্রমে বলরাম সম্বলিত কৃষ্ণলীলায় তাঁহার কলা-পূর্ণত্বের প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনিই পরে যজ্ঞ-ধর্ম্মাচরণের আবরণে নিয়ত ঘোর পশুহিংসা-বৃত্তির নিবারণো-দ্দেশ্যে বুদ্ধরূপে পুনরায় জগতে অবতীর্ণ হইলেন। কালে তিনিই কল্কিরূপে জগতে আবির্ভূত হইবেন। জগতে পরিদৃশ্যমান

ষোড়শকলাবিশিষ্ট শ্রীভগবানের অসাধারণ দৈবীকলা বিকাশে বিশ্বসৃষ্টির ক্রমোন্নত ধারা প্রদর্শনচ্ছলে ও জীবের নিত্য কল্যাণ-কল্পে তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবানের এই অলৌকিক লীলাবিগ্রহ বা অবতারের উপাসনাই প্রোক্ত ব্রহ্মোপাসনার দ্বিতীয় পন্থা। ইহাকেই জগদ্‌গুরুর উপাসনা বলিয়া সাধুরা বর্ণনা করেন।

অতঃপর ঋষিনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মোপাসনার তৃতীয় পন্থা দেবো-পাসনা। শাস্ত্র বলিয়াছেন,--

"গুরোর্জাতাশ্চ মন্ত্রাশ্চ মন্ত্রাজ্জাতাতু দেবতা॥"

গুরু হইতে মন্ত্র এবং মন্ত্র হইতে দেবতা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাস্তবিক আর্য্যের অসংখ্য দেবতার মধ্যে ব্রহ্মের কত অপ্রত্যক্ষ, অপূর্ব্ব, অনন্ত ও অনির্ব্বচনীয় লীলা বিভূতি সাধক তাহার কঠোর সাধনার সাহায্যে যে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক, দ্বাদশ হইতে ষোড়শকলা বিশিষ্ট অতীত অবতারগুলিও ক্রমে উপাস্য দেবতার মধ্যেই মূলদেবতার সহিত অভিন্ন ও স্থায়ীভাবে পরিগণিত হইয়াছেন। সাধকের ঐকান্তিক ভক্তি ও ক্রিয়ার আধিক্যানুসারে তাঁহাদের মন্ত্র ও প্রতিমার মধ্যেও ব্রহ্মের দেববিভূতি সেইরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাই প্রথমোল্লাসে কথিত সগুণ ব্রহ্মোপাসনা বা পঞ্চোপাসনা। এতদ্‌সম্বন্ধে মন্ত্রযোগের চতুর্থ অঙ্গ বা "পঞ্চাঙ্গসেবন" বিষয়ে বর্ণন-প্রসঙ্গে পরে বিস্তৃতভাবে বলা হই-য়াছে। ইহার পরই আর্য্যের বড় আদরের অব্যক্ত, অচিন্তনীয় ও অতুলনীয় বস্তু নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা; ইহাই আর্য্যশাস্ত্রসিদ্ধ ঋষি ও দেবতাদিগেরও একমাত্র বাঞ্ছনীয়, শেষ আকাঙ্ক্ষার বস্তু, ইহাই উপাসনার চতুর্থ পন্থা। কতবার বলিয়াছি "ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং," ইহা সেই শেষ উত্তম জ্ঞানমার্গেরই বিষয়ীভূত।

সদসৎ কলাভেদে সুরাসুরের আবির্ভাব

উক্ত কলা-বিভূতি বা অবতার-রহস্য-প্রসঙ্গে আর একটী কথা মনে আসিয়াছে, বলিয়া রাখি। বিশ্ব-প্রকৃতির একই আধারে সঞ্জাত অতি প্রত্যক্ষ আলোক ও আঁধার প্রান্তের ন্যায় ব্রহ্মবস্তুর সৎ ও অসৎ ভেদে দুইটী প্রান্ত। কলাধার চন্দ্রের কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ ভেদে যেরূপ এক এক কলার হ্রাস বা বৃদ্ধি আমরা নিত্য দেখিতে পাই; অর্থাৎ শুক্লপক্ষে আলোকের কলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আঁধার বা ছায়ার কলাংশ যেমন হ্রাস পাইতে থাকে এবং কৃষ্ণপক্ষে আলোকের কলাংশ কমিতে কমিতে তেমনি চন্দ্রের আঁধারাংশ ক্রমে পূর্ণ হইতে দেখা যায়; চন্দ্রদেব পূর্ণিমায় যেমন পূর্ণকলা হন, অমাবস্যাতেও তিনি একেবারে লুপ্ত না. হইয়া অন্যভাবে তেমনি পূর্ণত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তবে সে পূর্ণত্ব আলোকের পরিবর্ত্তে আঁধারের—সতের পরিবর্ত্তে অসতের; সেইরূপ সৎ ও সদাত্মক ব্রহ্মবস্তুর প্রান্তদ্বয়ের মধ্যে সৎ প্রান্তের কলাসমূহ হইতে যেমন আংশিক ও পূর্ণভাবে সত্ত্ব-গুণাত্মক বিভূতি পুষ্ট হইয়া প্রোক্ত সুর-অবতারে দৈবীশক্তির বিকাশ হইয়া থাকে, তেমনই তাঁহার অসৎ প্রান্তে কলাসমূহ হইতেও অল্পবিস্তর তমোগুণাত্মক বিভূতি পরিপুষ্ট হইয়া শত শত অসুরাবতারে তাঁহার আসুরী বা তামসিকী শক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। সেই কারণ সময় সময় তাঁহারা সুরভীতি উৎপাদনেও সমর্থ হইয়া থাকেন। তখন আবার তাঁহার সত্ত্বাধিক্য তমোগুণের সমাহারভূত অদ্ভুত রাজসিকী শক্তির সহায়তায় সেই অমিত তেজসম্পন্ন অসুরাবতারের বিনাশসাধন করিতে হয়। কারণ আসুরীশক্তিও ত সামান্য নহে! তাহাও যে তাঁহারই ভিন্ন প্রান্তের কলাদ্বারা পরিপুষ্ট! যাহাহউক তাঁহার সেই পূর্ব্বোক্ত জরায়ুজ জীব-লীলা বা অধিকতর কলাযুক্ত ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও যে সময় সময় হিংসা দ্বেষাদির অতি জঘন্য আসুরী বৃত্তিসমূহ পরিলক্ষিত হয়,

তাহা তাঁহারই অসৎ বা আসুরী কলার প্রভাবজাত জানিতে হইবে। মানবরূপধারী জীবদেহ উক্ত সৎ ও অসৎ উভয়বিধ কলারাশির পরিপোষক ক্ষেত্রমাত্র। কর্ম্মফলে তাহাতেই সদ্‌অসৎ গুণের বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং যিনি গুরূপদিষ্ট সাধন-প্রণালী দ্বারা যতোধিক সৎ বা সত্ত্বগুণের পুষ্টি বিধান করিতে পারিবেন, সেই অনুপাতে তাঁহার পূর্ব্ব সঞ্চিত অসৎগুণগুলিও তেমনই বিনষ্ট হইতে থাকিবে। ভক্তিমান ও ক্রিয়াশীল সাধক কেবল মন্ত্রাদি যোগ-কর্ম্মের সহায়তায় ক্রমে প্রচুর সৎ বা সত্ত্ব-গুণের অথবা ভগবদ্‌-কলাবিভূতি-পুষ্ট হইয়া চিরবাঞ্ছিত স্বীয় মুক্তিপথ পরিষ্কৃত করিতে পারেন।

মুক্তি ভেদে অবতারের ও ব্রহ্মসাযুজ্য অবস্থা

ইতিপূর্ব্বে " সাধন প্রদীপ " ও " গুরুপ্রদীপ " এর মধ্যে বলা হইয়াছে, মুক্তি চতুর্ব্বিধ * যথা—(১) সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য। সালোক্য অর্থাৎ সাধকের অভীষ্ট দেবতার লোকে (যেমন বিষ্ণু-লোক, রুদ্রলোক, সৌরলোক আদি) অবস্থান। (২) সামীপ্য, অর্থাৎ সর্ব্বদা অভীষ্ট দেবতার সান্নিধ্যে বাস করা, (৩) সারূপ্য অর্থাৎ ইষ্টদেবতার রূপ প্রাপ্তি এবং (৪) সাযুজ্য অর্থাৎ তাঁহাতে মিলিত হওয়া বা দেবত্ব লাভ করা। সাধক শুদ্ধ-ভক্তি ও অবিরত সাধন ক্রিয়ার বলে দেহান্তে এই চতুর্ব্বিধ ভাবের যে কোনও এক ভাবে মুক্তি লাভ করিতে পারেন। দেহী অবস্থাতেও কোন কোন কঠোর তপোপরায়ণ ও জ্ঞানী সাধক জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন; তাঁহাদের বিষয় পরে বলিব। এক্ষণে শ্রীভগবানের অবতাররূপে যাঁহারা কখন কখন ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন তাঁহারা কোথা হইতে কি ভাবে আগমন করেন, তাহাই বর্ণন করিব।

বিষ্ণু ও রুদ্র আদি দেবতার অবতারবৃন্দ যুগে যুগে যখনই

* সপ্তমোল্লাসে মুক্তিতত্ত্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের রক্ষা ও অধর্ম্মের বিলয় সাধন করিতে থাকেন, তখন বিষ্ণু ও রুদ্রাদি লোকসমূহ কি তাঁহাদের অভাবে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থায় শূন্য পতিত থাকে, অথবা তথায় তাঁহাদের কোনও প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়? এইরূপ প্রশ্ন কাহারও কাহারও পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হইবে না। ইহার উত্তরে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ঠাকুর বলেন, "তা" নয় রে পাগল, তা' নয়! দেবতারা স্ব স্ব লোক পরিত্যাগ করিবেন কেন? তাঁহাদের বিভূতি যে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত; তাঁহাদের ইচ্ছামাত্রেই জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্যে তাঁহাদের আংশিক বা পূর্ণকলা-বিভূতি সংসারে অদ্ভুত লীলা-বিন্যাস করিতে সমর্থ হন। সুতরাং তাঁহাদের স্বীয় লোক পরিত্যাগ করিবার ত আদৌ প্রয়োজন হয় না! ভক্ত সাধক যাঁহার যেমন ইচ্ছা সেইরূপ বা পৌরাণিক ভাষায় সেই দুর্জ্ঞেয় বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করিয়া জগতের সাধারণ ব্যক্তিবর্গের ভক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন মাত্র! তবে একটী অতি গুহ্য কথা এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিও। লীলা-বতারে দেবতাদিগের সারূপ্য মুক্তি প্রাপ্ত পরমভক্ত মহাপুরুষগণ তাঁহাদের আংশিক বা পূর্ণকলা বিভূতিযুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ বিষ্ণুত্ব বা রুদ্রত্ব আদি দেবত্ব লাভ করিয়া তাঁহাদেরই অভিলাষক্রমে সংসারে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ও অপূর্ব্ব দেবলীলা বিন্যাস করণানন্তর দৈবী ইচ্ছায় পুনরায় সেই মূল দেব অঙ্গেই বিলীন হইয়া যান। ইহাই তোমার লীলা অবতারের প্রাকৃতিক গূঢ় বিধান।"

সাযুজ্যমুক্তি—সাধারণতঃ দেব অঙ্গে লীন হওয়া অর্থাৎ জলবিন্দু মহাসমুদ্রে বিলীন হওয়ার ন্যায় কিংবা দেব অঙ্গের অণু পরমাণু-রূপে ভক্তের সর্ব্বদা মিশিয়া থাকা। ইহাকে সূক্ষ্মভাবে দেবত্ব বা দেব-সাযুজ্য-মুক্তি বলে। দেবতাদিগের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত আর তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং তাঁহারা দেবাঙ্গীভূত হইবার কারণ তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণপূর্ব্বক সংসারে

গমনাগমন বৃত্তিও রহিত হইয়া যায়। তাহার পর মহা প্রলয়ের কালে যখন সমুদয় বিশ্ব বা মহাভূত প্রতিলোম ক্রিয়াবশে একে অন্যের মধ্যে লীন হইয়া, উপদেবতাবৃন্দ দেবতায়, দেবতারা ব্রহ্মায়, ব্রহ্মা বিষ্ণুতে, বিষ্ণু রুদ্রে, রুদ্র ব্রহ্মের আদ্যাশক্তিতে, আদ্যাশক্তি যোগমায়ারূপ মুলপ্রকৃতিতে এবং মূলপ্রকৃতিও মহাপুরুষে বা তুরীয় ব্রহ্মে বিলীন হইতে থাকেন তখনই সেই দেব-সাযুজ্য-প্রাপ্ত মহাত্মারা পূর্ণব্রহ্ম-সাযুজ্য-প্রাপ্তিরূপ পরমমুক্তি লাভ করিয়া ধন্য হন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, দেহী অবস্থাতেও কোন কোন উচ্চতম সাধক পরমমুক্তি বা জীবন্মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সংসারের কল্যাণ-কামনায় নিষ্কাম কর্ম্মানুরত থাকেন তাঁহাদের ঈশকোটি এবং কর্ম্মবিরত শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানানন্দে যাঁহারা বিভোর হইয়া থাকেন তাঁহাদের ব্রহ্মকোটি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলা হয়। একথা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ঈশকোটি জীবন্মুক্তস্বরূপ মহাপুরুষ যাঁহারা পূর্ব্ব ইচ্ছাবশে কোন বিশেষ দেবতা বা সগুণ-ব্রহ্ম-সারূপ্য লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাও প্রয়োজন হইলে, পূর্ণাভাষ বা পূর্ণকলাপুষ্ট হইয়া যুগে যুগে অংশ বা পূর্ণাবতার রূপে অবতীর্ণ হইতে পারেন।

ব্রহ্মকোটি জীবন্মুক্ত পুরুষ সেরূপ লীলা-পরায়ন অবতার-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতের কল্যাণদ্বারা ধন্য হইতে না পারিলেও তাঁহারা চতুর্থ বা শেষ রাজযোগের সমাধির ফলে একেবারেই ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন। সংসারের কেহই হয় ত তাঁহাদের কোন সন্ধান রাখেন না, তাঁহারাও সংসারের কোন সংবাদই রাখেন না, একথা পূর্ব্বে আরও একবার বলিয়াছি—তাঁহারা বনজাত কুসুমের মতই লোক-নয়নের অন্তরালে নিভৃতে প্রস্ফুটিত হইয়া নির্জ্জনেই তাঁহাদের অবশিষ্ট জীবলীলার পরিসমাপ্তি করেন। অথবা কোন অজ্ঞাত কারণ ও কর্ম্মবশে জগতের কোন্ উদ্দেশ্য

াধনার্থে তাঁহারা এইভাবে প্রারব্ধ ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা াহারাই জানেন আর সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মাই জানেন। াহাহউক সাধারণদৃষ্টিতে তাঁহারা জগতের কল্যাণবিধানে বা ীলাব্যাপারে অবতারবৃন্দ অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ না হইলেও মুক্তি-্যাপারে তাঁহারা যে প্রধান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মন্ত্রযোগ-নির্দ্দিষ্ট প্রথম অঙ্গ "ভক্তি" বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে ক্ত, উপাসনারহস্য, গুরু, জগদ্‌গুরু ও অবতার-রহস্যক্রমে ভগবানের কলাভেদ, মুক্তি ও ব্রহ্মসাযুজ্য অবস্থা পর্য্যন্ত যে কল বিষয় সংক্ষেপে বলা হইল, সে সমস্তই সেই মূল ভক্তি-বিটপীর াখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প ও ফলস্বরূপ। পূর্ব্ববর্ণিত জ্ঞান-পুষ্ট চ্চতম পরাভক্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ বা প্রাথমিক ৈধীভক্তির কথাই বলিতেছি; সেই প্রাথমিক ভক্তি হইতেই চ্চতর ভক্তির ক্রমে বিকাশ হয়। সুতরাং সেই ভক্তি ব্রহ্মবুদ্ধি-ক্ত হইয়া প্রথমেই শ্রীগুরুদেবে, পরে তদুপদিষ্ট জগদ্‌গুরু বা ীলাবিগ্রহাবতারে কিম্বা কোনও সগুণ-ব্রহ্মস্বরূপ অভীষ্ট দেব-ার উপাসনা দ্বারা মুক্তি-কামী সাধক তাঁহার সাধনপথে একাগ্র-াবে অগ্রসর হইবেন। প্রত্যেক সাধকের সর্ব্বদাই স্মরণ খা কর্ত্তব্য যে, মন্ত্রযোগের মূলই ভক্তি, সেই ভক্তিই জ্ঞান-ার্গের বা যোগচতুষ্টয়ের শেষসীমায় যাইয়া পরাভক্তি ও দনুগত স্বরূপজ্ঞানের পুষ্টিসাধন করিবে। উপাসনা বা ক্রিয়া-হীন শুষ্ক পণ্ডিতগণ রাগাত্মিকা কিম্বা পরাভক্তির কোনরূপ াস্বাদ না পাইয়াই বৃথা তার্কিক হইয়া পড়েন ও জ্ঞান, ক্রিয়ার যথা নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। এই ভক্তিত্রয়মূলক ব্রহ্ম-দ্ধিযুক্ত উপাসনা-কাণ্ডের কতক কতক ক্রিয়ার লোপ হইয়াছে লিয়াই অধুনা আর্য্য সাধন-শাস্ত্রসমূহের এতাধিক দুর্দ্দশা হইয়াছে উহা এত সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বপরায়ণ হইয়া রহিয়াছে। এই তু মুক্তিকামী সাধকগণকে পুনরায় বলিতেছি যে, বৈধীভক্তির

সহায়ক গুরুমুখাগত যথাবিধি উপাসনা-পদ্ধতি সকলের পক্ষেই নির্ব্বিবাদে প্রথম অবলম্বনীয়। এই বৈধীভক্তিই সমস্ত উপাসনার মূলভিত্তি। এইজন্য অনেকেই একবাক্যে বলিয়া থাকেন—ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে ভক্তিই প্রধান। অর্থাৎ প্রকৃত ভক্তি না হইলে ক্রিয়া বা জ্ঞান কিছুই যথার্থভাবে উপলব্ধ হয় না। উক্ত ভক্তিমূলক ক্রিয়া বা জ্ঞানসিদ্ধির ফলেই যথাক্রমে রাগাত্মিকা ও পরাভক্তির উদয় হয়, এ সকল কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। সুতরাং কোন সাধন-পন্থাতেই ভক্তি একেবারে পরিত্যজ্য হইতে পারে না। এই ভক্তি-সাধনারও ত্রিবিধ পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা মন্ত্রযোগাঙ্গের চতুর্থ অঙ্গ 'পঞ্চাঙ্গসেবন' অংশে পাঠক দেখিতে পাইবেন।

২য়। শুদ্ধিঃ—মন্ত্রযোগরহস্যের দ্বিতীয় অঙ্গ শুদ্ধি। কায়, স্থান, দিক, ও চিত্তের শোধনভেদে শুদ্ধি চারি প্রত্যঙ্গে বিভক্ত। *

"কায়স্থান দিশাচিত্ত ভেদাচ্ছুদ্ধিশ্চতুর্ব্বিধা॥"

(১) কায় বা বাহ্যশুদ্ধির দ্বারা আত্মপ্রসাদ ও ইষ্টদেবতার কৃপা অনুভব হয়। (২) স্থান শুদ্ধি দ্বারা পবিত্রতা ও পুণ্যবৃদ্ধি

---

* কুলার্ণবে শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঃ—

"আত্মস্থানমন্ত্রদ্রব্যদেবশুদ্ধিস্তু পঞ্চমী।"

অর্থাৎ আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি ও দেবশুদ্ধি ভেদে শুদ্ধি পাঁচ প্রকার।

১। ভূতশুদ্ধি, স্নান, প্রাণায়াম ও ন্যাসাদিতে আত্মশুদ্ধি হয়।

২। সম্মার্জ্জন ও গোময়-লেপন, গঙ্গোদক বা মন্ত্রপূত সলিল-সিঞ্চন দ্বারা স্থানশুদ্ধি হয়।

৩। ইষ্টমন্ত্র মাতৃকাবর্ণে পুটিত করিয়া গুরুনির্দ্দিষ্ট নিয়মে অনুলোম বিলোমে জপদ্বারা মন্ত্রশুদ্ধি হয়।

৪। মূলমন্ত্রে পূজাদ্রব্যোপরি জল-প্রোক্ষণ দ্বারা দ্রব্যশুদ্ধি হয়।

৫। দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও সকলীকরণাদি প্রক্রিয়া দ্বারা দেবশুদ্ধি হয়।

হইয়া থাকে। (৩) দিকশুদ্ধি দ্বারা সাধনায় শক্তিলাভ হয়। (৪) চিত্তশুদ্ধি বা অন্তরশুদ্ধি দ্বারা ইষ্টদেবের দর্শন ও সমাধিপর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে।

(১) কায়শুদ্ধি—মান্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ, ও মানসরূপ সপ্তবিধ স্নানের † দ্বারা দেহ পবিত্র করাই কায়শুদ্ধি; ইহা দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ হয় ও চিত্তের একাগ্রতা আনয়নে সহায়তা করে। সাধকগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বিধানানুসারে যে কোনবিধ স্নান করিয়া প্রথমেই কায়শুদ্ধি সম্পাদন করিবেন। এতদ্ব্যতীত ইষ্টদেবতার প্রীতির জন্য তাম্র-পাত্রে তিল, দূর্ব্বাদল ও জলসংযুক্ত করিয়া স্নান বা মার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। প্রথমে গুরুপঙ্‌ক্তির, পরে ইষ্টদেবতার তর্পণ পূর্ব্বক নিত্য মন্ত্রস্নান করা সাধকমাত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য।

(২) স্থানশুদ্ধি—গোময়াদি লেপন বা পূত সলিল-মার্জ্জন-দ্বারা সাধনার স্থান শোধন করা সাধকের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। পঞ্চ-শাখ বা পঞ্চবটীযুক্তস্থান, গোশালা, গুরুগৃহ, দেবমন্দির, বনভূমি, তীর্থাদি পুণ্যক্ষেত্র ও নদীতট সতত পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। সাধক এইরূপ যে কোনও শুদ্ধস্থানে বসিয়া সাধনা করিবে। ইহাদ্বারা সাধকের সহজে সিদ্ধিলাভ হয়। এতদ্ব্যতীত, অবস্থা ও গুরুদেবের আদেশ অনুসারে শ্মশান, শব ও পঞ্চমুণ্ডাদিযুক্ত স্থান, কোন কোন সাধনায় বিশেষ সিদ্ধিপ্রদ।

(৩) দৈব ও পিতৃকার্য্যাদির প্রভেদ অনুসারে বিশেষ বিশেষ

† তন্ত্রান্তরে ব্রাহ্ম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও যৌগিক এই ষড়্‌বিধ স্নানের বিধি আছে। যথা :—

"ব্রাহ্মন্তু মার্জ্জনং মন্ত্রৈঃ কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ। আগ্নেয়ং ভস্মনা পাদ-মস্তকাদি বিধূননং॥ গবাং হি রজসা প্রোক্তং বায়ব্যং স্নানমুত্তমং। যত্তু সাতপ-বর্ষণ স্নানং দিব্যং তদুচ্যতে। বারুণং চাবগাহস্তু মানসন্ত্বাত্মবেদনং। যৌগিকং সমাখ্যাতং যোগে-স্বেষ্টবিচিন্তনং॥ আত্মতীর্থমিতিখ্যাতং সেবিতং ব্রাহ্মণা-দিভিঃ। মনঃ শুচিকরং পুংসাং নিত্যং স্নানং সমাচরেৎ॥"

দিকে সম্মুখ করিয়া কার্য্য করিতে হয়। পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া সাধক নিত্য যথাবিধি জপকার্য্য করিবে। সাধারণতঃ দিবাভাগে পূর্ব্বমুখ ও রাত্রিকালে উত্তরমুখ হইয়া জপের ব্যবস্থা সর্ব্বত্র নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুনির্দ্দিষ্ট দৈবক্রিয়া বা ইষ্টদেবতার উপাসনা এবং যোগাদি ক্রিয়াও এই নিয়মে সাধক সম্পন্ন করিবে। ইহাই মন্ত্রযোগের দিক্‌শুদ্ধি। ইহা দ্বারা চিত্ত স্থির হয় ও সাধকের সিদ্ধির যথেষ্ট সহায়তা করে।

(৪) চিত্ত বা আত্মশুদ্ধি—ইহা সাধকের মন্ত্রযোগ সাধনার পক্ষে বিশেষ সহায়তা প্রদান করে। সুতরাং প্রত্যেক সাধকের এই আত্মোন্নতিলাভ করিবার জন্য নিম্নলিখিত বৃত্তির অভ্যাস করা বিধেয়। ভয়শূন্যতা, চিত্তপ্রসন্নতা, জ্ঞানযোগ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিবার কারণ তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও যত্ন; দান, ইন্দ্রিয়সংযম, যজ্ঞক্রিয়া, বেদ বা বেদসম্মত শাস্ত্রাদির আলোচনা, তপ, সরলতা, অহিংসা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে কাহারও প্রতি হিংসা না করা; সত্য, অক্রোধ, কর্ম্মফলে অনাসক্তি, চিত্তের শান্তি, খলবৃত্তি পরিত্যাগ, সর্ব্বভূতে দয়া, অলোভ, অহঙ্কার, কুকর্ম্ম করিতে লজ্জানুভব, অচঞ্চলতা, তেজ, ক্ষমা অর্থাৎ সামর্থ্য থাকিতেও অন্যের দোষ দেখিয়া তাহাকে দণ্ডের পরিবর্ত্তে উপেক্ষা করা; ধৈর্য্য, শৌচ, সকলের সহিত নির্ব্বিরোধ হওয়া, আত্মগৌরবের ভাব পরিত্যাগ করা, এই সমস্ত বৃত্তি দৈবসম্পত্তি বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। নিয়মিতরূপে এই সকলের সাধ্যমত অভ্যাসের দ্বারা সাধকের চিত্ত নির্ম্মল হইয়া থাকে। সুতরাং সাধক দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অবিবেকাদি জীবের বন্ধনের কারণস্বরূপ এই আসুরী সম্পদগুলি হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিয়া মোক্ষের কারণভূত পূর্ব্বোক্ত দৈবীসম্পদগুলির অবিরত সাধনাদ্বারা মোক্ষপথে অগ্রসর হইতে যত্নবান হইবে। ইহাই মন্ত্রযোগনির্দ্দিষ্ট আত্মশুদ্ধিক্রিয়ার অনুষ্ঠান-বিধি।

চিত্ত বা অন্তরশুদ্ধি ক্রিয়ার আর একটী প্রধান ও অতি গুপ্ত সাধনা আছে, তাহা প্রায়ই কেহ উপদেশকালে শিষ্যকে বুঝাইয়া দেন না বা বুঝাইয়া দিবার অবসরও পান না। তাহা কেবল পূর্ব্বকৃত বা আজন্মকৃত জ্ঞাতাজ্ঞাত অশেষ পাপ-পুঞ্জের ক্ষয়করণ ও নিত্য-প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান মাত্র। ইতিপূর্ব্বে 'ভক্তি' অঙ্গ বর্ণনার সময়ে উক্ত হইয়াছে যে, প্রায়শ্চিত্ত অর্থে তপোনিশ্চয়াত্মক অনুষ্ঠান। এস্থলে 'প্রায়ঃ' শব্দের ভাবার্থ পাবন বা পবিত্রীকরণ এবং চিত্ত' শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ, অর্থাৎ চিত্তের পাপকালিমা বিধৌতকরণ। সাধক তাহার জ্ঞাতাজ্ঞাত অশেষ-কৃত-পাপ চিত্তের মলিনতা বিনাশের নিমিত্ত নিত্য তাহার ইষ্ট-দেব সমীপে অতি কাতরভাবে কিয়ৎকালের জন্য অনুশোচনাসহ তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে প্রার্থনা করিবে। গুরু বা ইষ্টদেবতার নিকট যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধক অসঙ্কোচে তাহার পাপসমূহ নিবেদন করিতে না পারিবে, ততক্ষণ চিত্ত কিছুতেই নির্ম্মল হইবে না, বা তাহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধিতার দিকে অগ্রসর হইবে না। কেবল তিলকাঞ্চন উৎসর্গ করিলেই চিত্ত পাপমুক্ত হয় না। এই কারণ অভিষেক-দীক্ষার সময়ে পাপবিমোচনের নিমিত্ত তিলকাঞ্চন উৎসর্গ ও দান করিবার সময় শিষ্য শ্রীগুরু-সমীপে আত্মপাপসমূহ অসঙ্কোচে নিবেদন করিবে। এই গূঢ় আদেশ পরম পূজ্যপাদ বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ-প্রবর্ত্তিত আনন্দমঠের গুরুপরম্পরায় অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। শিষ্য গুরুকে মানবদেহধারী কেবল একজন জ্ঞানী জীবমাত্র মনে করিলে অবশ্যই আত্মভাব গোপন করিতে পারিবে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি মনে করিলে আর গোপন করিতে সমর্থ হইবে না। মানব, মানবের নিকট বস্ত্রের আবরণে লজ্জা রক্ষা করিতে পারে, কিন্তু যাঁহার নিকট দেহ, মন ও চিত্তের অন্তর হইতে অন্তর পর্য্যন্ত উন্মুক্ত, জীব স্বয়ং যাহা জানিতে পারেনা, যিনি তাহাও সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত; জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি

সকল সময় যিনি চিত্তের সাক্ষী, তাঁহার নিকট কি মনের কোনভাব গোপন করা যায়? তিনি সমস্তই ত জানেন! তবে আর সঙ্কোচ কেন? কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তরূপে অসঙ্কোচে আত্মনিবেদন কর, তদ্ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি কখনই সম্ভবপর নহে।

সপ্তমোল্লাসে "মুক্তিতত্ত্ব" আলোচনা সময়ে যে অষ্টপাশ-বিমুক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে লজ্জাই একটী ভীষণ পাশ। শ্রীভগবানের সম্মুখে, অভীষ্টদেবতার সম্মুখে বা অষ্ট-পাশমুক্ত সাক্ষাৎ শিবসদৃশ মহাপুরুষের সম্মুখে অসঙ্কোচে বা লজ্জাশূন্য হইয়া আত্মপাপ নিবেদন করিতে পারিলেই পাপবিমুক্তির যথেষ্ট সহায়তা হয়। যতক্ষণ চিত্তের মধ্যে পূর্ব্বকৃত পাপের কালিমা বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ নিত্য অবসরসময়ে বা সাধনার সময়ে একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে যে, অন্তরের মধ্যে এখনও সেই সকল পূর্ব্বকৃত পাপের স্মৃতি অথবা অন্তরের আসুরী সম্পদগুলি বিদ্যমান আছে কি না; যদি থাকে, তবে তাঁহার নিকট বা শ্রীভগবান ইষ্টদেবতার নিকট 'অষ্টগোপিনীদিগের বস্ত্র হরণের ন্যায়' আত্মলজ্জার বস্ত্র বিসর্জ্জন করিয়া অসঙ্কোচে তাঁহারই চরণে সমস্ত সমর্পণ করিবে। ইহাই চিত্তশুদ্ধির সর্ব্ব-প্রধান গুপ্ত-ক্রিয়া, ইহাই বৈষ্ণবীতন্ত্রের বস্ত্রহরণ-লীলানুষ্ঠান। সাধক এই শুদ্ধিক্রিয়ায় কৃতকার্য্য হইলে তাহার দৈবসম্পদরূপ অন্তরের উন্নতক্রিয়াসমূহ আপনা আপনি বিকশিত হইতে থাকিবে। সুতরাং সাধকমাত্রেই এই আত্মশুদ্ধিক্রিয়ার গুপ্ত সাধনায় যেন কোন দিন অবহেলা না করেন।

৩য়। আসন ঃ—সকাম ও নিষ্কাম বিচার এবং বিভিন্ন উপাসনা-পদ্ধতি অনুসারে, ইহার নানাপ্রকার ভেদ হইয়া থাকে। পট্টবস্ত্র, কম্বল, কুশাসন, সিংহ, ব্যাঘ্র বা মৃগচর্ম্মের আসন অত্যন্ত শুদ্ধ ও সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কম্বলাসন কাম্য-কর্ম্মের পক্ষে শ্রেষ্ঠ, তবে রক্তবর্ণ কম্বলাসন আরও উত্তম।

কৃষ্ণ-কম্বল ও কৃষ্ণাজিন জ্ঞানসিদ্ধির জন্য প্রশস্ত, সিংহ ও ব্যাঘ্র চর্ম্মে মোক্ষ, কুশাসনে আয়ুর্বৃদ্ধি, চৈলে অর্থাৎ রেশমজাত চেলীর আসনে ব্যাধিবিনাশ হইয়া থাকে। চৈলাজিন-কুশোত্তর আদি ত্রিতয় আসনগুলিই সাধনার পক্ষে শ্রেষ্ঠ। "সাধন-প্রদীপ" ও "গুরুপ্রদীপে" আসন সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে, পাঠক তাহা পুনরায় দেখিয়া লইবেন এবং গুরুদেবের আদেশক্রমে স্ব স্ব অবস্থা ও অধিকারভেদে যথা প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন আসনের ব্যবস্থা করিয়া লইবেন। এক্ষণে সাধকগণের অবগতির জন্য শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি নিষিদ্ধ আসনের উল্লেখ করিতেছি।

ভূমি-আসনে দুঃখ, কাষ্ঠাসনে দুর্ভাগ্য, বংশজাত আসনে দারিদ্র্য, প্রস্তরাসনে চিত্তবিভ্রম, বস্ত্রাসনে জপ, ধ্যান ও তপের হানি হইয়া থাকে। অতএব সাধক সতত সাবধানতার সহিত এই সকল আসন পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ অদীক্ষিত ও গৃহস্থব্যক্তিগণের পক্ষে কখনও সিংহ, ব্যাঘ্র বা কৃষ্ণাজিন আসনে উপবেশন করা উচিৎ নহে। তবে স্নাতক ব্রহ্মচারিগণের পক্ষে উদাসীন সাধুদিগের ন্যায় উক্ত আসনে উপবেশন করিবার বিধি আছে।

আসনে উপবেশন করিবার প্রণালী ও শোধন-মন্ত্রাদি সকলেই গুরুমুখে অবগত হইবেন। "সাধন প্রদীপেও" তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

৪র্থ। পঞ্চাঙ্গ সেবন ঃ—গীতা, সহস্রনাম, স্তব, কবচ, ও হৃদয় এই পাঁচটী পঞ্চাঙ্গসেবন বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সাধক স্ব স্ব ইষ্টদেবতার গীতা ও সহস্র-নামাদির নিত্য পাঠ করিবেন, ইহাই পঞ্চাঙ্গসেবনের প্রধান উদ্দেশ্য। পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ও ব্যোম এই পাঁচের মধ্যে কোন এক তত্ত্বের আধিক্য অনুসারেই সাধকের প্রাথমিক উপা-

সনা-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। "গুরুপ্রদীপেও" একথা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। উপযুক্ত গুরু দীক্ষাপ্রদানকালে শিষ্যের উক্তরূপ তত্ত্বাধিক্য বিচার করিয়া মন্ত্রপ্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহার যে তত্ত্ব প্রধান, তাঁহাকে সেই তত্ত্বের অধিপতি-দেবতার কোনও এক মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হয়। কারণ যে কোনও মন্ত্র প্রথম হইতেই সকলের পক্ষে ইষ্টপ্রদ হইতে পারে না। তাই শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন ঃ—

"নভসোহধিপতির্বিষ্ণুরগ্নেশ্চৈব মাহেশ্বরী।
বায়োঃ সূর্য্য ক্ষিতেরীশো জীবনস্য গণাধিপঃ॥"

অর্থাৎ আকাশতত্ত্বের অধিপতি বিষ্ণু, অগ্নিতত্ত্বের অধিপতি মাহেশ্বরী বা শক্তি, বায়ুতত্ত্বের অধিপতি সূর্য্য, পৃথ্বিতত্ত্বের অধিপতি শিব এবং জলতত্ত্বের অধিপতি গণপতি। এই বিষয়টী একটু বিস্তৃত করিয়া না বলিলে বোধ হয় সকলে ঠিক বুঝিতে পারিবে না। নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা আর্য্য সাধনশাস্ত্রের যে অতি উচ্চতম বিষয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে অনেকস্থলেই উক্ত হইয়াছে। সাধনাবস্থায় সগুণ ব্রহ্মোপাসনা সকল সাধকেরই একমাত্র অবলম্বনীয়। উক্ত পঞ্চোপাসনাই সেই সগুণ ব্রহ্মোপাসনা। সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের সৎ, চিৎ ও আনন্দরূপ ত্রিভাবের প্রাধান্যবশে তিনি প্রথমে নিজ ইচ্ছায় দ্বিধাভূত হইয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণের সাম্যাবস্থায় অর্দ্ধ অঙ্গে আত্মশক্তি বা প্রায় নির্গুণসম ব্রহ্মশক্তি মূলপ্রকৃতিরূপে প্রতিভাত হন *। শাস্ত্র বলিয়াছেন— "যখন ব্রহ্মে গুণের অধিষ্ঠানত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি সগুণ, তখনই তাঁহার অর্দ্ধ অঙ্গে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় প্রকৃতিত্ব এবং অপরার্দ্ধে তিনি পুরুষপ্রধানরূপে নির্গুণ পরশিব বা পরব্রহ্ম। ব্রহ্ম সগুণ বা শক্তিমান অবস্থায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণের মধ্যে এক একটী গুণের প্রাধান্যে এবং তাঁহার সৎ, চিৎ ও

* পঞ্চম ও ষষ্ঠোল্লাসে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাইবে।

আনন্দরূপ ত্রিভাবের মধ্যে এক একটী ভাবের প্রাধান্যে তিনিই তাঁহার সগুণরূপা আত্মশক্তি বা মহাপ্রকৃতি হইতে প্রথমে সৎ-ভাবে তমোগুণের প্রাধান্যে শিব, চিৎভাবে সত্বগুণের প্রাধান্যে বিষ্ণু এবং আনন্দভাবে রজোগুণের প্রাধান্যে তিনিই রজোরূপা জগজ্জননী আদ্যাশক্তিরূপে প্রকটা হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার উভয়পার্শ্বে জ্ঞান ও তেজঃরূপে আরও দুইটী সগুণ ব্রহ্মসত্তার আবির্ভাব হইল। তাহাই যথাক্রমে গণপতি ও সূর্য্য ভগবান।

সগুণব্রহ্ম বা মূলপ্রকৃতির এক প্রান্ত সত্ব ও অন্য প্রান্ত তমঃ এবং মধ্যস্থল বা তাহার হৃদয় সত্ব ও তমঃ উভয় গুণের সমাহার বা উভয় গুণের বিকাশরূপ রজঃ-গুণময়ী, আবার সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের বা ব্রহ্ম-প্রকৃতির এক প্রান্ত সৎ ও অন্য প্রান্ত চিৎ এবং তাঁহার অন্তর আনন্দভাবস্বরূপ। সেই আনন্দই বিশ্ব-সৃষ্টির কারণ বলিয়া তিনি সকলেরই কেন্দ্র বা শক্তি-স্বরূপা হইয়া আছেন।

ব্রহ্মের সৎভাবের অর্থ নিত্য, স্থির বা যাঁহার বিনাশ নাই; তাহাতে তমোগুণ-প্রাধান্যযুক্ত হইয়া তিনি প্রায় নিষ্ক্রিয়, অচঞ্চল, স্থির বা জড়-সদৃশ শবস্বরূপ ও লয় বা মোক্ষপ্রদ; সুতরাং তিনি মঙ্গলময় ব্রহ্মের সৎসত্তা-প্রধান শ্রীভগবান শিবরূপে প্রতিভাত হইয়াছেন।

ব্রহ্মের চিৎভাবের অর্থ চৈতন্য, তাহাতে সত্বগুণ-প্রাধান্যযুক্ত হইয়া তিনি চৈতন্যময়, ক্রিয়াবান, বিশ্ব-প্রতিপালক, বিশ্বের পুষ্টি ও উন্নতি প্রদায়ক, ব্রহ্মের চিৎসত্তা-প্রধান শ্রীভগবান বিষ্ণুরূপে প্রকট হইয়াছেন।

ব্রহ্মের আনন্দভাবের অধিষ্ঠাত্রী রজোগুণ-প্রাধান্যযুক্ত হইয়া বিশ্বের অন্তরে ব্রহ্মের শক্তি বা আনন্দ-সত্বা-প্রধানা বিশ্বশক্তিময়ী হইয়া শ্রীশ্রীভগবতী আদ্যাশক্তিরূপে তিনিই প্রকটা রহিয়াছেন।

এই আনন্দভাবময় ব্রহ্মশক্তি বা দেবীর বাম দিকে ও পূর্ব্ব-কথিত ব্রহ্মের চৈতন্য-ভাবময় বিষ্ণুর দক্ষিণদিকে, আনন্দ ও চৈতন্ত রূপ উভয় সত্তার সমাহার-যোগে, সত্ত্বাধিক্য রজোগুণান্বিত অপূর্ব্ব ব্রহ্মতেজঃ, সত্তা-প্রাধান্যযুক্ত হইয়া, ব্রহ্মের প্রকট বিভূতি, বিশ্বের সৃষ্টি ও পুষ্টিপ্রদ আদিত্যরূপে শ্রীভগবান সূর্য্য বিকশিত হইয়াছেন।

এইরূপে আনন্দভাবময় ব্রহ্মশক্তি বা দেবীর দক্ষিণদিকে ও প্রথমোক্ত ব্রহ্মের সদ্‌ভাবময় শিবের বাম দিকে, আনন্দ ও সৎ স্বরূপ উভয় সত্তার সমাহারযোগে তমোধিকরজোগুণান্বিত অভিনব ব্রহ্মজ্ঞান বা বুদ্ধি-সত্তা-প্রাধান্যযুক্ত হইয়া শ্রীভগবান গণ-পতিরূপে বিশ্বের নিত্য জ্ঞানমূর্ত্তিতে বিরাজিত হইয়াছেন।

বাক্য ও মনের অগোচর অপ্রকট নির্গুণ ব্রহ্ম এই ভাবে সগুণ পঞ্চবিধ রূপে প্রকট হইয়া পঞ্চোপাসনার উপাদানভূত হইয়াছেন। পাঠক এই অংশ স্থিরচিত্তে আলোচনা ও চিন্তা করিলে সগুণ উপাসনা-পঞ্চকের বহু তত্ত্ব ও রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পাঠকের বোধ সৌকর্য্যার্থে ইহা অন্যভাবেও দেখান যাইতেছে।

নির্গুণ ব্রহ্ম :—যখন ব্রহ্মে ব্রহ্মশক্তির আদৌ বিকাশ থাকে না।

সগুণ ব্রহ্ম :—যখন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি-রূপে তিনি দ্বিধাভূত।

তিনি = সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ।

তাঁহার সৎ ও চিৎ-ভাবের মিলনেই আনন্দ-ভাবের বিকাশ। এই সৎ, জ্ঞান, শক্তি, তেজঃ ও চিৎ সত্তারূপ শিব, গণেশ, দেবী, সূর্য্য ও বিষ্ণু স্বরূপ পঞ্চ সগুণ ব্রহ্মই যথাক্রমে পঞ্চভূতাত্মক জীবের ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ তত্ত্বের প্রাধান্য অনুসারে প্রাথ-মিক উপাস্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞ ও তত্ত্বাভিজ্ঞ গুরু শিষ্যের অবস্থা ও উক্ত ক্ষিত্যাদি তত্ত্ব-প্রাধান্য বিচার এবং উপলব্ধি করিয়া তদুপযুক্ত বা তাহার অনুকূল অভিষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া দিলেই মন্ত্র-

যোগী প্রাথমিক সাধকের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে, ফলে অচির-কালমধ্যে তাহারা উন্নত সাধনায় অগ্রসর হইবার উপযুক্ত হইতে পারে। সাধারণ দীক্ষা ও শাক্তাদি প্রাথমিক দীক্ষা প্রদানকালেও এই নিয়ম সতত প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। যাহা হউক পঞ্চ-তত্ত্বাত্মক উক্ত পঞ্চদেবতার মধ্যে যে সাধক যখন যাঁহা-রই উপাসনা করিবেন, তখন তিনি তত্তদ্ দেবতার গীতাদি * পাঠ-রূপ পঞ্চাঙ্গসেবন অবশ্যই করিবেন। ইহাই মন্ত্রযোগ সাধনার চতুর্থ অঙ্গ।
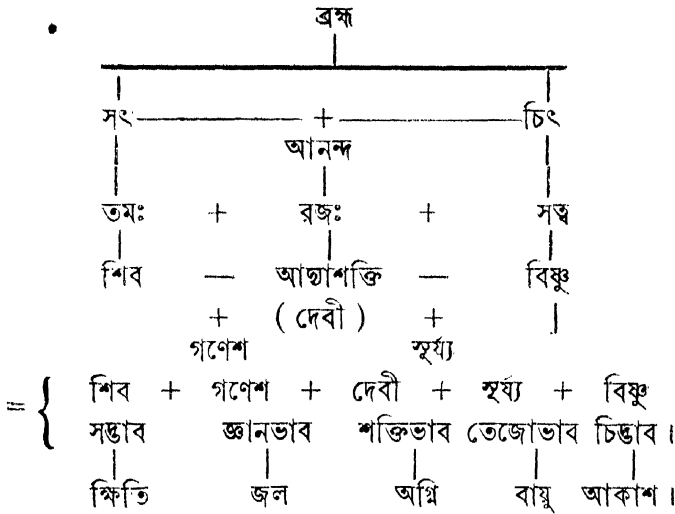
এই পঞ্চোপাসনা আবার নিম্ন, মধ্য ও উত্তম অধিকার অনু-সারে তিন প্রকার, সাধকগণের অবগতির জন্য এই স্থলেই সেকথা বলিয়া রাখি। নিম্ন অধিকারীর সাধক স্ব স্ব তত্ত্ব-প্রাধান্য মূলক

* পঞ্চদেবতার উপাসনা বা সম্প্রদায় ভেদে পঞ্চ-গীতা; যথা বিষ্ণুগীতা, সূর্য্য-গীতা, দেবীগীতা, গণেশগীতা ও শিবগীতা ও তাঁহাদের সহস্রনাম, স্তব, কবচাদি স্ব স্ব গুরুদেবের নিকট জানিয়া লইবে।

ইষ্টদেবতাকেই অন্য দেবতাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ অভীষ্ট দেবতার প্রাধান্য রক্ষা ও অন্যের অভীষ্ট বা অন্য দেবতাকে অপ্রধান বলিয়া নিন্দা করিয়াও থাকেন। প্রথম অবস্থায় ভক্তি ও নিষ্ঠা-বৃদ্ধির জন্য আপনার ইষ্টকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া চিন্তা করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও শাস্ত্রোপদেশ আছে। কিন্তু শিক্ষা বা উপদেশের অভাবে ইহা দ্বারা সাধকের উন্নতির পথ ক্রমে রুদ্ধ হইয়া যায় ও পরিণামে অযথা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যাঁহারা উন্নত গুরুর উপদেশক্রমে সাধনপথে ক্রমে উন্নতিলাভ করিতে থাকেন, তাঁহারা পরিণামে উক্ত সাম্প্রদায়িক নিন্দাবাদ হইতে দূরে থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত মধ্য ও উত্তম অধিকারের সাধক শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারেন। মধ্য অধিকারের সাধক তখন ইষ্টদেবতার সৎ, চিৎ, শক্তি, তেজঃ ও বুদ্ধি বা জ্ঞান সত্তার আশ্রয়ে অন্যের অভীষ্ট বা অন্যান্য দেব-প্রতিমার মধ্যেও তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। অর্থাৎ তখন তিনি যে কোনও দেবমূর্ত্তির মধ্যেই তাঁহারই ইষ্ট-দেবতার সত্ত্বা অনুভব করেন, তখন কোনও দেবমূর্ত্তিই তাঁহার আর নিন্দনীয় বা অপ্রধান বলিয়া মনে হয় না। ইহার পর উত্তম অধিকারে সাধক সকল দেবমূর্ত্তিই তাঁহার ইষ্টদেব হইতে অভিন্ন, যে কোনও মূর্ত্তি যে তাঁহার ইষ্টদেবতারই রূপান্তর মাত্র বা ইনিও তিনিই, তাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন। তখনই তিনি ব্রহ্মানুভূতির সমীপবর্ত্তী হইয়া পড়েন। আর সাম্প্রদায়িক ভ্রান্তির ছায়া তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় না। সুতরাং এই পঞ্চোপাসনা যে ব্রহ্মোপাসনার সর্ব্বপ্রধান সোপান তাহা বলাই বাহুল্য। ফল কথা যে কোনও তত্ত্ব প্রধান সাধক তাঁহার উপযোগী ইষ্ট-সাধনার সময় পূর্ব্বকথিত পঞ্চবিধ সগুণ ব্রহ্মোপাসনার মধ্যে প্রথমে একটীকে প্রধান বা মুখ্যরূপে গ্রহণ করিয়া অন্য চারিটীকে গৌণরূপেই উপাসনা করিবেন। তাঁহার স্থূল দেহ যেমন

একটী তত্ত্বের আধিক্য সত্ত্বেও আর চারিটী তত্ত্ব অপেক্ষাকৃত অল্প অল্প অংশে মিলিত হইয়া পূর্ণরূপে গঠিত হইয়াছে, সেই অনুপাতে দৈবরাজ্যে অধিপতি-প্রধান দেবতাপঞ্চকের একটী তাঁহার তত্ত্বাধিক্য-বশে সর্ব্বাপেক্ষা সমীপবর্ত্তী হইয়া এবং অন্য চারিটী অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত হইয়াই তাঁহার সূক্ষ্ম দেহ সতত রক্ষা করিতেছেন। অতএব পঞ্চীকৃত পঞ্চতত্ত্বাত্মক * সাধককে ঐ পাঁচটী লইয়া উপাসনা করাই সনাতন সাধন বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব রহস্য। এইরূপ সাধনায় পূর্ব্বোক্তরূপে পঞ্চতত্ত্বের সাম্যাবস্থা হইলে, তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার † পথ মুক্ত হইয়া থাকে।

* পঞ্চীকৃত পঞ্চতত্ত্ব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পঞ্চমোল্লাসে দেখ।

† শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য দেবও সগুণ বা সাকার পূজার বিধি-সম্বন্ধে ভারতের চারি প্রান্তে চারিটী ব্যক্ত মঠ স্থাপনপূর্ব্বক তদীয় শিষ্যবর্গকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে,—

"নাপ্রামাণ্যং সাকার-প্রতিপাদক-শ্রুতিনাং।"

অর্থাৎ সাকারপ্রতিপাদক শ্রুতিসকল অপ্রামাণ্য নহে। তিনি অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পেই প্রিয় শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন—"মূর্ত্তামূর্ত্তং উভয়াত্মকং ব্রহ্ম" এইরূপ ঐক্যবাদীকেই অদ্বৈতবাদী কহে। অতএব "সগুণ ব্রহ্মস্বরূপ পঞ্চদেবতার প্রতি দ্বেষরহিত হইয়া অর্চ্চনা কর, যথেচ্ছাচার বিধির নিষেধ কর।" তিনি শিষ্যদিগকে এইরূপ উপদেশ দিয়া চতুর্থাম্নায় তুঙ্গভদ্রা তীর্থে তাঁহার অন্তিম মঠ প্রতিষ্ঠার পর নীলসরস্বতী বা তারাদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। এতদ্ সম্বন্ধে "শঙ্কর বিলাসে" শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রার্থনামন্ত্রে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়:—

"সাকার শ্রুতিমুল্লঙ্ঘ্য নিরাকার প্রবাদতঃ।
যদঘং মে কৃতং দেবি, তদ্দোষং ক্ষন্তু মর্হসি॥
ত্বমেব জগতাং ধাত্রী সারদে স্ব স্বরূপিণি।
তব প্রাসাদাদ্দেবেশি মুকো বাচালতাং ব্রজেৎ॥
বিচারার্থে কৃতং যচ্চ বেদার্থস্য বিপর্য্যয়ং।
বেদানাং জপযজ্ঞাদি খণ্ডিতং দেবতার্চ্চনং॥
স্বমতং স্থাপনার্থায় কৃতং মে ভূরি দুষ্কৃতং
তৎ ক্ষমস্ব মহামায়ে পরমাত্মস্বরূপিনী॥

এই কারণ শাস্ত্রে পঞ্চায়তনী সূর্য্য, গণপতি, শিব, শক্তি ও বিষ্ণু মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাসহ উপাসনার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। পরম পূজ্যপাদ আদি-গুরুদেব বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত সাধনমার্গে প্রথম অভিষেকের অনুষ্ঠানসহ এইরূপ পঞ্চায়তনী দীক্ষারই ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। পঞ্চদেবতার মধ্যে যে দেবতার মন্ত্র শিষ্যকে দেওয়া হইবে, সেই দেবতার যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার উপর ঘটস্থাপনা করিতে হইবে এবং তাহার চারি-কোণে অন্য চারি দেবতার যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া ঘটে ও যন্ত্রে পঞ্চ-দেবতার পূজা করিতে হইবে এবং সেই ঘটেই মধ্য-দেবতার বিশেষ পূজা করিতে হইবে। বিভিন্ন যন্ত্র স্থাপনের ক্রম যথা :—

বায়ু উত্তর ঈশান

পশ্চিম পূর্ব্ব

শক্তি / শিব	সূর্য্য / বিষ্ণু	শক্তি / বিষ্ণু	শক্তি / বিষ্ণু	শক্তি / শিব
বিষ্ণু	শক্তি	শিব	গণেশ	সূর্য্য
সূর্য্য / গণেশ	গণেশ / শিব	গণেশ / সূর্য্য	সূর্য্য / শিব	বিষ্ণু / গণেশ
বিষ্ণু পঞ্চায়তন	শক্তি পঞ্চায়তন	শিব পঞ্চায়তন	গণেশ পঞ্চায়তন	সূর্য্য পঞ্চায়তন

নৈঋৎ দক্ষিণ অগ্নি
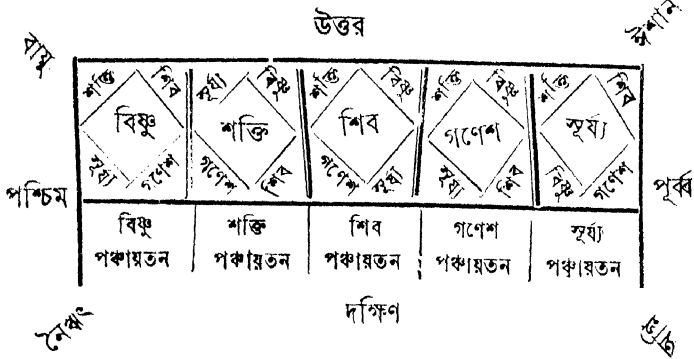
কৃতঘাং পরিহারায় তবার্চ্চা স্থাপিতা ময়া।
অত্র তিষ্ঠ মহেশানি যাবদাহূতসংপ্লবঃ॥"

হে দেবী, সাকার প্রতিপাদক শ্রুতিকে তিরস্কার করিয়া নিরাকার প্রতিপাদক বচনার্থ প্রতিপন্ন করাতে যে পাতক করিয়াছি তাহা ক্ষমা কর। তুমি জগন্মাতা, তোমার প্রসাদে মুক্ ব্যক্তি বাক্-পটুতা লাভ করে। বিরুদ্ধধর্ম্মীদিগের সহিত বিচার জন্য বেদার্থকে বিপরীত করিয়াছি এবং দেবতাদির জপ, যজ্ঞ, অর্চ্চনাদি যাহা খণ্ডন করিয়াছি, স্বমত-স্থাপনের জন্য যে যে দুষ্কার্য্য করিয়াছি, হে সারদে,

যাহা হউক সাধক প্রথম দীক্ষার পর দৃঢ়া ভক্তিসহযোগে পঞ্চাঙ্গসেবনাদি রীতিমত ইষ্ট-উপাসনার দ্বারা উন্নতিলাভ করিলে, পূর্ণাভিষেকাদি ক্রমোন্নত ব্রহ্মোপাসনা-মুলক ব্রহ্মশক্তি-বিষয়ক মন্ত্র-সাধনা-সম্বন্ধেও উপদেশ দেওয়া সিদ্ধগুরুর অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাতেও আংশিক পঞ্চাঙ্গসেবন-বিধির ব্যবস্থা আছে। এই কারণেই সর্ব্ব-বর্ণ-গুরু ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রহ্মশক্তির উপাসনাসহ নিত্য পঞ্চোপাসনা সাম্প্রদায়িকতাপরিশূন্য উন্নত ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচায়ক বিধান। অতএব মন্ত্রযোগীর পক্ষে নিত্য পঞ্চাঙ্গসেবন একটী অপরিত্যজ্য ক্রিয়া, ইহার নিত্য অভ্যাসদ্বারা যোগী ক্রমে উন্নত ও আশু যোগ-সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

৫ম। আচার ঃ—দিব্য, দক্ষিণ ও বাম এই ত্রিবিধ আচার শাস্ত্রসম্মত। "সাধনপ্রদীপে" বিস্তৃত ভাবে ইহার উল্লেখ আছে। পাঠক পুনরায় তাহা দেখিয়া লইবেন।

৬ষ্ঠ। ধারণা ঃ—বাহ্য ও অন্তর ভেদে ধারণা দুই প্রকার। মন্ত্রযোগে ধারণা পরম সহায়ক। বহির্ব্বস্তুতে চিত্ত যোগ করাকে বাহ্য-ধারণা এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অন্তর্জগতে চিত্ত-নিয়োগ করাকে অন্তর্ধারণা বলা যায়।

শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—"এই ধারণার সিদ্ধি, শ্রদ্ধা ও যোগ-মূলক।" ধারণাসিদ্ধি হইলে যোগী মন্ত্রসিদ্ধি ও ধ্যানসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিত্য ক্রিয়াশীল মন্ত্রযোগী, ভক্তি, আচার, প্রাণসংযম, জপসিদ্ধি, দেবতাসান্নিধ্যতা, দিব্যদেশাদিতে দৈব-

---

সেই সমুদায় অপরাধ আমার ক্ষমা কর। কৃতপাতকের পরিহারার্থ তোমার জাগ্রত প্রতিমা মৎকর্ত্তৃক স্থাপিতা হইয়াছে। হে মাতঃ এই প্রতিমায় আপনি কল্পকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করুন। অতএব সাকার বা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা পথেই সাধক নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় পৌছিতে পারেন। আর সেই নির্গুণ অদ্বৈত-ভাব কেবল যোগযুক্ত সমাধি অবস্থাতেই অনুভব হয়। যে সময় আহারবিহারাদি লৌকিক জ্ঞান বিদ্যমান থাকে, সে সময় দ্বৈত ভাবেই আনন্দ হয়।

শক্তির আবির্ভাব * এবং ইষ্টরূপ দর্শন এই সমস্ত ধারণাসিদ্ধি-দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে।

ধারণা-সিদ্ধিমূলক বহু স্থূল ও সূক্ষ্ম ক্রিয়ার বিধান আছে, তাহা শিষ্যের অবস্থানুসারে গুরুমুখেই জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। "সাধন-প্রদীপ" ও "গুরুপ্রদীপেও" এতদ্‌সম্বন্ধে বহু রহস্য প্রদত্ত হইয়াছে। সাধনাকাঙ্ক্ষী তাহা হইতেও যথেষ্ট সহায়তা পাইবেন।

৭ম। দিব্যদেশসেবন ঃ—উপাসনার উপযুক্ত স্থান। "সাধনপ্রদীপে" স্থান-মাহাত্ম্য ও "গুরুপ্রদীপে" যোগসাধনার উপযোগী স্থান বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠক তাহা পুনরায় পাঠ করিলে সহজে সমস্তই বুঝিতে পারিবেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—ধারণার সহায়তায় দিব্য-দেশে ইষ্টদেবতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। সেই কারণ মন্ত্রযোগে দিব্যদেশসেবন পরম হিতপ্রদ অঙ্গ বলিতে হইবে।

দিব্যদেশে যে প্রণালীতে ইষ্টদেবতার আবির্ভাব হয়, তাহার রহস্য অতীব বিচিত্র ও গভীর দার্শনিকও বিজ্ঞান-সম্মত। মন্ত্রযোগ-নির্দ্দিষ্ট পরবর্ত্তী অষ্টম অঙ্গ "প্রাণক্রিয়ার" সহিতও ইহার বিশেষ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের অবগতির জন্য প্রাণক্রিয়া-প্রসঙ্গেই সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইবে।

৮ম। প্রাণক্রিয়া ঃ—মন, প্রাণ ও বায়ু এই তিন একই সম্বন্ধযুক্ত। বায়ু এবং প্রাণ, কার্য্য ও কারণ-স্বরূপ। এই হেতু প্রাণায়াম-ক্রিয়ার সহিত ন্যাস-ক্রিয়া মন্ত্রযোগের একত্ব-সম্বন্ধ-যুক্ত হইয়াছে। মাতৃকাদি ন্যাস উপাসনা-কার্য্যে অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ইতিপূর্ব্বে এই "মন্ত্রযোগ" অংশের প্রথমেই মন্ত্রযোগের ব্যুৎপত্তি বিচারস্থলেও মাতৃকান্যাস যে, মন্ত্রযোগ সিদ্ধির

* 'প্রাণক্রিয়া' অংশে এই বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে।

একমাত্র উপায়, তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত তাৎপর্য্য "সাধন ও গুরুপ্রদীপে" পাঠক দেখিতে পাইবেন। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুক্তির আর প্রয়োজন নাই। তবে 'প্রাণক্রিয়ার' সহিত 'দিব্যদেশসেবন'-দ্বারা ইষ্টদেবতার আবির্ভাব-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

পাঠক পঞ্চমোল্লাসে দেখিতে পাইবেন, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামক পঞ্চ কোষের রহস্যবিষয়ে তথায় বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জীবের অন্নময়কোষ ব্যষ্টিভাবে জগতে স্থূলশরীর বা পিণ্ড বলিয়া অভিহিত। এইরূপ পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড বা সমগ্র সংসারই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক স্থূল-রাজ্যরূপ অন্নময় কোষ-বিশিষ্ট জানিতে হইবে এবং তাহার প্রাণময় ও মনোময় কোষ হইতে আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত কোষ-চতুষ্টয় যথাক্রমে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণ-জগতের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। সেই কারণ ব্যষ্টি-জীবেরও মনোময়াদি কোষগুলিকে সূক্ষ্ম-শরীর বলা হইয়াছে। বিশ্বের এই সূক্ষ্ম-দেহ শাস্ত্রে আবার দৈবরাজ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। অসীম দৈবরাজ্যের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদির সর্ব্বোত্তম লোকগুলির সহিতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণ-শরীরাত্মক আনন্দময় কোষের সম্বন্ধ সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহা হউক, দৈব-জগতরূপ সূক্ষ্ম কোষগুলির সহিত স্থূল-জগৎস্বরূপ অন্নময় কোষের সংযোগ বা সম্বন্ধস্থাপন ব্যাপারে প্রাণময়কোষই প্রাণক্রিয়া-রূপে সতত কার্য্য করিতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে "প্রাণায়াম" ও "প্রাণায়ামের গূঢ় উপদেশ"-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—প্রাণ, অপান, সমানাদি, প্রাণের পঞ্চবিধ বিভাগ আছে; তাহাদের মধ্যে প্রাণ ও অপানই প্রধান, অবশিষ্ট তিনটী উহাদের অনুবর্ত্তী মাত্র। এই হেতু প্রাণ ও অপান ভেদে প্রাণের দুইটী ক্রিয়া বা শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। একটীর বিকর্ষণী শক্তি, অন্যটীর আকর্ষণী শক্তি। অর্থাৎ একটীর গতি সর্ব্বদা বাহিরের দিকে, অন্যটীর

গতি সততঃ অন্তরের দিকে ; এ সকল বিষয় "গুরুপ্রদীপের" প্রাণায়ামের 'গূঢ়-উপদেশ' অংশ দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন। পিণ্ড বা স্থূল-শরীরের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডেরও সর্ব্বত্র প্রাণক্রিয়ার এই উভয় শক্তি পরিব্যাপ্ত থাকিয়া স্থূলের সহিত সূক্ষ্মের সম্বন্ধ-বিনিময় করিতেছে বা উভয়ের বিচিত্র সম্বন্ধ-স্থাপন করিয়া সমগ্র বিশ্বের সকলক্রিয়াই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। প্রাণ ও অপানরূপ বিকর্ষণ ও আকর্ষণের ফলে যে অলৌকিক চিরন্তন আবর্ত্ত সৃষ্টি হইতেছে, জীবপিণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডেও সেই বিরাট আবর্ত্ত-রূপ চক্র অনন্ত-পথে অবিরোধ গতিতে পরিচালিত হইতেছে ; অর্থাৎ গ্রহ, উপগ্রহ ও তারকাদি সকলেই সেই আবর্ত্তে স্ব স্ব কক্ষে পতিত হইয়া অবিরতভাবে অহর্নিশ বিঘূর্ণিত হইতেছে ও পরস্পরের কেন্দ্র হইতে আপন আপন শক্তির যথা-প্রয়োজন আদান প্রদান করিয়া কি এক বিচিত্র কৌশলে প্রত্যেকের অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। এই বিকর্ষণ ও আকর্ষণ শক্তি-সম্ভূত অলৌকিক আবর্ত্তই শাস্ত্রে "পীঠচক্র" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—স্থূল-জগৎ ও সূক্ষ্ম-জগতের মধ্যে প্রাণক্রিয়াই সতত উভয়ের সংযোগ সাধন করিতেছে। প্রাণের সেই বিকর্ষণ ও সংকর্ষণ-জাত আবর্ত্তের **অন্তর্গত মধ্য-বিন্দুতে বা তাহার কেন্দ্রে উভয় গতির সমতার কথঞ্চিৎ স্থিরতা সম্পাদিত হইলেই "পীঠ" স্থাপিত হয়। উদাহরণরূপে বিভিন্নমুখী-গতি-বিশিষ্ট বায়ু বা জলপ্রবাহ দেখিলে প্রত্যেকেই সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, ঘূর্ণিবায়ু বা ঘূর্ণিজলের মধ্যে কাটী, কুটী ও ধূলা কত কি পতিত হইয়া প্রবলবেগে ঘুরিতে থাকে, কিন্তু ঠিক তাহার মধ্যস্থলে যে তৃণ বা কুটী আদি পড়ে, সেটী আর স্থানচ্যুত না হইয়া বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত না হইয়া তাহারই মধ্যে থাকিয়া অর্থাৎ সেই আবর্ত্তচক্রের কেন্দ্রস্থিত হইয়া অপেক্ষাকৃত স্থিরভাবেই ধীরে ধীরে ঘুরিতে থাকে। এইভাবে প্রাণ, মন ও মন্ত্রাদিরূপ জীবপিণ্ডস্থিত সূক্ষ্ম অংশ ও পূর্ব্বকথিত দৈবী বা সূক্ষ্ম-**

জগতের পরস্পর বিভিন্ন গতিবিশিষ্ট প্রাণক্রিয়ার সহায়তায় উভয়ের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-শক্তিসম্ভূত আবর্ত্ত সৃষ্টি হইলে, দিব্যদেশসমূহে পরস্পরের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তখন অভীষ্ট-দেবতা বা দেবতাবৃন্দ তাহারই মধ্যে ঘট, পট, প্রতিমা অথবা সাধকের স্থূল-শরীরেই, তাঁহার প্রাণময় কোষকে আশ্রয় করিয়া সেই অলৌকিক আবর্ত্তের কেন্দ্রস্থ বা পীঠস্থ হইয়া বিরাজিত হন। অতএব এস্থলে বলা বাহুল্য যে, সাধকের প্রাণক্রিয়ার পবিত্রতা ও প্রবলতা অনুসারে উন্নত অভীষ্ট-দেবতার সদা আবির্ভাব ও অধিকক্ষণ স্থিতি হইয়া থাকে এবং সেই দিব্যদেশে দৈবশক্তির অপূর্ব্ব লীলা তখন হইতে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে অধিকাংশ সমুন্নত ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণের গভীর ঐকান্তিকতাপূর্ণ প্রাণক্রিয়ার ফলেই পৃথিবীর নানাস্থানে কত শত তীর্থ, পীঠ ও মহাপীঠের সৃষ্টি হইয়া সতত অদ্ভুত দৈবশক্তির কতই না বিচিত্র লীলা বিকশিত হইতেছে। যাহা হউক, ক্রিয়াবান সাধক শ্রীগুরু-নির্দ্দিষ্ট প্রাণক্রিয়া অর্থাৎ প্রাণাপানের সংযোগরূপ প্রাণ-সংযম বা প্রাণায়াম-সাধনার দ্বারাই মনস্থিরপূর্ব্বক দিব্যদেশে আপনার অভীষ্ট-দেবতার আহ্বান করণানন্তর মন্ত্রাদির যথাবিধি অনুষ্ঠান দ্বারা সেই দেবতার প্রীতি-সম্পাদন করিতে সমর্থ হন। এই কারণ মন্ত্রযোগে প্রাণ-ক্রিয়ার এতাধিক প্রয়োজন। সাধারণ ব্যক্তি প্রাণক্রিয়ার এই রহস্য অবগত না হইবার কারণ ভগবৎ-কৃপালাভে অনেক সময় বঞ্চিত হইয়া থাকেন। নিম্ন-শ্রেণীর অথবা উন্নত-শ্রেণীর যে কোন সাধকই জ্ঞাতভাবে বা অজ্ঞাতভাবে হউক এই প্রাণ-ক্রিয়ার সাহায্যেই স্ব স্ব দিব্যদেশে দৈবীশক্তি-বিশিষ্ট দিব্যপীঠ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই কারণেই মন্ত্রযোগী-দিগের ঘটে, পটে বা প্রতিমাদিতে নবীন পীঠ উৎপাদন করিবার নিমিত্ত "প্রাণ-প্রতিষ্ঠা"-ক্রিয়ার অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থা আছে। যে কোনও মন্ত্র-সিদ্ধি বা তাহার সাধনার জন্য এই প্রাণপ্রতিষ্ঠারূপ

তৎকাল-প্রয়োজনীয় নবীন পীঠের স্থাপনা অবশ্য কর্ত্তব্য। চিতা, শব ও শ্মশানাদি-সাধনার জন্যও তত্তৎস্থলে চিতা ও শবাদিতে পীঠ স্থাপিত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই প্রাণক্রিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম-জগতের সম্বন্ধ স্থাপনা করিয়া দেয়; অতএব সূক্ষ্ম-জগতের অতি সামান্য নিম্ন-আত্মা হইতে বিরাট দেবতাত্মা পর্য্যন্ত যে কোনও আত্মা পীঠাধারের উপযোগিতা ও পবিত্রতা অনুসারেই যে, সমাবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা বলাই বাহুল্য। অনেক সময় সাধকের চিত্ত-দৌর্ব্বল্য, অমন্ত্রক ও বিধিবিহীন প্রাণক্রিয়ার ফলে যে পীঠ সৃষ্ট হয়, তাহার আবর্ত্তপথে অন্তরীক্ষস্থিত ঘূর্ণায়মান নিম্নস্তরেরই বহু আত্মা আকৃষ্ট হইয়া সেই পীঠদেশে আবিষ্ট হইয়া থাকে ও পীঠ-কর্ত্তার নানা প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহাতে সময় সময় সাধকের সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট হানি হয়। এই হেতু সমন্ত্রক ও যথাবিধি দিগ্বন্ধনাদিদ্বারা পীঠ-বিন্যাস করাই সনাতন শাস্ত্র-সঙ্গত। অধুনা এই প্রাণক্রিয়া-লব্ধ পীঠরহস্য-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও কিছু কিছু আলোচনা করিতেছেন, তবে তাহা সম্পূর্ণ অমন্ত্রক ও অতি নিম্ন অঙ্গের সামান্য প্রক্রিয়া-সম্ভূত হইবার কারণ তাহাতে উন্নত দৈবী-জগতের সম্পর্ক না হইয়া সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর আত্মা বা উপদেবতা অথবা প্রেতাদির সম্বন্ধই হইয়া থাকে। এদেশীয় অতি নিম্নশ্রেণীর বা তামসিক-সাধনার অন্তর্গত প্রেত, পিশাচ, দৈত্য, পরি ও নায়িকাদি সাধনাতেও পীঠ-সৃষ্টির সুন্দর বিধিনিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে।

এই প্রাণক্রিয়ার স্থূল অনুষ্ঠান ও বিনিময়েই সম্মোহন (Hypnotism) বা "হিপনোটিস্‌ম্‌" বিদ্যার আবিষ্কার হইয়াছে। তাহা-দ্বারা একে অন্যের উপর কেবল প্রাণ-শক্তির প্রয়োগপূর্ব্বক অন্যের দেহে পীঠ উৎপাদন করিয়া অর্থাৎ তাহাকে পীঠোপযোগী পাত্র বা "মিডিয়ম্‌" (Medium) করিয়া তাহাতেই সন্নিহিত ঘূর্ণায়মান

কোন কোন আত্মার আবির্ভাব করাইয়া সূক্ষ্মজগতের কিছু কিছু তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন। ইহাকে "মেস্‌ম্যারিসিম্"ও Mesmerisim) বলে। তবে এই সমুদয় নবীন ক্রিয়ানুষ্ঠান এখনও অমন্ত্রক ও বিধিবিহীন ভাবেই সম্পন্ন হয় বলিয়া বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট চক্রানুষ্ঠান এই শ্রেণীরই অতি উন্নত প্রাণক্রিয়ার সমন্ত্রক উপাসনা-পদ্ধতি মাত্র। তাহা উন্নত সাধক-গণেরই গুপ্ত অধিকারের বিষয়। এস্থলে তাহার বিশেষ আলো-চনার প্রয়োজন নাই।

৯ম। মুদ্রা:—দেবতাদিগের মোদন বা আনন্দপ্রদ ও উপাসকের পূর্ব্বসঞ্চিত পাপরাশির দ্রাবণ অর্থাৎ বিনাশকারক বলিয়া তন্ত্র-বেদবিৎ মুনিগণ কর্ত্তৃক এই 'মুদ্রা' শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন :—

"মোদনাৎ সর্ব্বদেবানাং দ্রাবণাৎ পাপসন্ততেঃ।
মুদ্রাস্তাঃ কথিতাঃ সদ্ভিঃ দেবসান্নিধ্যকারিকাঃ॥"

অর্থাৎ দেবতাদিগের আনন্দ-উৎপাদন ও পাপরাশি বিনাশ করিবার জন্য উপাসকগণ দেবতাদিগের সান্নিধ্যকারক যে সকল মুদ্রা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা প্রায় সর্ব্বতন্ত্রেই অল্পবিস্তর উক্ত হইয়াছে। দেবার্চ্চনা-পদ্ধতি-অনুসারে এই মুদ্রা-সাধন করিলে মন্ত্রাত্মক দেবতা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। অর্চ্চনা ও জপকালে, ধ্যান, কাম্যকর্ম্ম, স্নান, আবাহন, শঙ্খপ্রতিষ্ঠা এবং নৈবেদ্য-সমর্পণ সময়ে যে যে রূপে হস্তের অঙ্গুলি-বিরচন সহ মুদ্রা-সাধন করিতে হয়, তাহা মন্ত্রসাধক স্ব স্ব অধিকার অনুসারে অভিজ্ঞ গুরুদেবের নিকট জানিয়া লইবেন। কারণ, সম্প্রদায় ও উপাসনা-ভেদে তাহার বহুবিধ বিধি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। যথা বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসনায়—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বেণু, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা, জ্ঞান, বিশ্ব, গরুড়, নারসিংহী, বারাহী, হায়গ্রীবা, ধনুঃ, বাণ, পরশু, জগন্মোহনিকা

এবং কাম মুদ্রা ; শিবমন্ত্রের উপাসনায়—লিঙ্গ, যোনি, ত্রিশূল, মালা, ইষ্টাবর, অভয়, মৃগ, খট্টাঙ্গ, কপাল এবং ডমরু মুদ্রা ; সূর্য্যের উপাসনার জন্য—পদ্মমুদ্রা ; গণপতি উপাসনায়—দণ্ড, পাশ, অঙ্কুশ, বিঘ্ন, পরশু, লড্ডুক ও বীজপুর মুদ্রা ; শক্তিমন্ত্রের উপাসনায়—পাশ, অঙ্কুশ, বর, অভয়, খড়্গ, চর্ম্ম, ধনুঃ, শর, মৌষলী এবং দৌর্গী ; লক্ষ্মীর অর্চনায়—লক্ষ্মীমুদ্রা। বাক্‌দেবীর নিমিত্ত—অক্ষমালা, বীণা, ব্যাখ্যা, এবং পুস্তকমুদ্রা ; বহ্নিপূজায়—সপ্তজিহ্বামুদ্রা ; সর্ব্বকর্ম্মে—মৎস্য, কূর্ম্ম, লেলিহা ও মুণ্ড মুদ্রা। এতদ্ভিন্ন বিশেষ শক্তির অর্চনায় মহাযোনি ; শ্যামা প্রভৃতির অর্চনায় মুণ্ড, মৎস্য, কূর্ম্ম, এবং লেলিহা মুদ্রা ; তারার অর্চনায়—যোনি, ভূতিনী, বীজাখ্যা, দৈত্যধূমিনী এবং লেলিহা ; ত্রিপুরাসুন্দরী পূজনে সংক্ষোভণী, দ্রাবণী, আকর্ষণী, বশ্যা, উন্মাদিনী, মহাঙ্কুশা, খেচরী, বীজ, যোনি, ত্রিখণ্ডমুদ্রা ; মুণ্ড, পদ্ম, কালকর্ণী ও গালিনীমুদ্রা অনেকস্থলে ব্যবহৃত হয় ; শ্রীগোপাল-অর্চনায়—বেণুমুদ্রা ; নরসিংহপূজনে—নারসিংহী ; বরাহপূজনে—পরশুমুদ্রা ; বাসুদেব-পূজায়—আবাহনী মুদ্রা ; অভিষেক ও রক্ষা-বিষয়ে—কুম্ভমুদ্রা ; প্রার্থনা-বিষয়ে—প্রার্থনা মুদ্রা ; এতদ্ভিন্ন সংহারাদি অন্য বিবিধ মুদ্রার ব্যবস্থা আছে ; তাহা প্রয়োজন মত আচার্য্য ও গুরুর নিকটেই সাধক জানিয়া লইবেন।

১০ম। তর্পণ ঃ—দেবতাবৃন্দ তর্পণ-ক্রিয়া-দ্বারা শীঘ্র তুষ্ট হইয়া থাকেন বলিয়া, যোগিগণ ইহার তর্পণ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

"তর্পণাদ্দেবতাপ্রীতিস্ত্বরিতং জায়তে যতঃ।
অতস্তর্পণং প্রোক্তং তর্পণত্বেন যোগিভিঃ॥"

নিষ্কাম ও সকাম-ভেদে তর্পণ দ্বিবিধ। কামনানুসারে তর্পণ

করিবার ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যও নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহা প্রয়োজনমত অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জানিয়া লইলেই হইবে।

তর্পণের সাধারণ বিধি এই যে, প্রথমে ইষ্টতর্পণ, তাহার পর দেবতর্পণ, অনন্তর ঋষিতর্পণ ও পরিশেষে পিতৃতর্পণ করিবার বিধিই শাস্ত্রসঙ্গত।

তর্পণের বিশেষত্ব এই যে, বিধিপূর্ব্বক তর্পণ করিলে দেবযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ করিবার আবশ্যকতা থাকে না। আপনার ইষ্টদেবতার আশু-প্রসন্নতা লাভ করিতে হইলে নিত্য যথাবিধি তর্পণ করা বিধেয়।

১১শ। হবন :—দেবাদিদেব শ্রীভগবান শঙ্কর বলিয়াছেন, "জপ বিনা যেমন মন্ত্র-সিদ্ধি হয় না, তেমনই হবন বিনা সাধনার ফল-লাভ হয় না এবং ইষ্টপূজন ব্যতীত কামনা পূর্ণ হয় না। অতএব এই কার্য্য ত্রিতয় মন্ত্রযোগীর অবশ্য কর্ত্তব্য। হবনদ্বারা বিভূতি ও নিখিল-সিদ্ধি উপলব্ধ হইয়া থাকে। হবন-প্রণালী পূজাপদ্ধতির মধ্যে দ্রষ্টব্য।*

১২শ। বলি :—ইষ্ট-উপাসনায় বিঘ্নশান্তি ব্যতীত কিছুতেই সফলতা লাভ হয় না। সেই বিঘ্ন-শান্তির জন্যই বলিদান-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সাধকের অধিকার ও উপাসনার সত্ত্বরজাদি গুণ-ভেদে শাস্ত্রে নানাবিধ বলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা সাধক প্রয়োজনমত স্ব স্ব গুরুদেবের নিকট জানিয়া লইবেন। তবে বলি-সাধনায় আত্মবলিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বত্র কথিত হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"বলিদানাদ্বিঘ্নশান্তিঃ স্বেষ্টদেবস্য পূজনে।
বলিদানেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ শ্রেষ্ঠ আত্মবলি স্মৃতঃ॥"

---

* চতুর্থ উল্লাসে বিরজাবহ্নি স্থাপনাদি দেখ।

আত্মবলিদ্বারা অহঙ্কার নাশ হইয়া সাধক কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। "সাধনপ্রদীপে" দক্ষিণকালিকা-রহস্যে কাম ক্রোধাদি রিপুসমূহের যে বলি দিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় স্থানীয় অধিকারীরই উপযোগী। সম্প্রদায়বিশেষে ও নিম্ন অধিকারীর পক্ষে ফল ও পশু আদি বলি দিবার ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত পূজাকালে ভূতাদির বলি প্রদানের ব্যবস্থা সাধক পূজাপদ্ধতির মধ্যে দেখিয়া লইবেন।

১৩শ। যাগঃ—বহির্যাগ ও অন্তর্যাগ-ভেদে যাগ দুই প্রকার। "সাধন ও গুরুপ্রদীপের" মধ্যে এ সকল বিষয় বিস্তৃত-ভাবে উক্ত হইয়াছে। সাধকের অবস্থা অনুসারে প্রথমে বহির্যাগ পরে অন্তর্যাগ বা মানসপূজা ও জপাদির ব্যবস্থা শাস্ত্রসম্মত।

যাগ-সিদ্ধির দ্বারা ধ্যান-সিদ্ধি হয় এবং ধ্যান-সিদ্ধি হইলে সমাধি-সিদ্ধি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহাদ্বারা দেবতার সাক্ষাৎ-কার লাভ হয় ও দিব্যদেশে ইষ্টদেবতার আবির্ভাব হইয়া থাকে। দৈবশক্তি সর্ব্বব্যাপিনী হইলেও ক্রিয়াবান সাধকের বিশ্বাসপুষ্ট যথাবিধি ক্রিয়া-সাধনার দ্বারা বা পূর্ব্বকথিত প্রাণক্রিয়াদির ফলে ঘট, পট ও প্রতিমাদি স্থূল-কেন্দ্রেই দেবশক্তি প্রকট বা আবির্ভূতা হইয়া থাকেন।

এই যাগ-ক্রিয়া ব্যতীত ব্রহ্মযাগ ও জীবযাগ ভেদে শাস্ত্রে আবার দ্বিবিধ উপযাগের নির্দ্দেশ আছে। বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রাদি নিয়মিত পাঠ করাকেই ব্রহ্মযাগ-সাধনা বলে। ব্রহ্মযাগ-সাধনায় সাধক স্ব স্ব ইষ্টদেবতার স্বরূপ অবগত হইয়া থাকেন। সর্ব্ব-জীবে দয়া, সাধু, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও অভ্যাগতগণের সেবা ও অর্চ্চনা আদি জীবযাগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই উভয় উপযাগ-দ্বারা সাধক ইহ-পরকালে অনন্ত কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং ইহাও মন্ত্রযোগী সাধকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

১৪শ। জপ :—

"মননাত্ত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
জপাৎসিদ্ধি র্জপাৎসিদ্ধি র্জপাৎসিদ্ধি র্নসংশয়ঃ ॥"

যাহা মনন করিবামাত্র ত্রাণ করে, তাহাই মন্ত্র। অর্থাৎ যাহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি বা জপদ্বারা সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহাই মন্ত্র ; সেই কারণ শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ জপ করিবার কথা বলিয়াছেন। "সাধন ও গুরুপ্রদীপের" মধ্যেও অনেকস্থলে এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। পাঠক প্রয়োজনমত তাহা পুনরায় দেখিয়া লইতে পারেন। দেবাদিদেব শ্রীভগবান "শিবাগমে" বলিয়াছেন :—

"জপেন দেবতা নিত্যং স্তূয়মানা প্রসীদতি।
প্রসন্না বিপুলান্ কামান্ দদ্যান্মুক্তিঞ্চ শাশ্বতীম্ ॥"

জপের দ্বারা দেবতা প্রসন্ন হন এবং প্রসন্ন হইয়া বিপুল কাম্যবস্তু ও শাশ্বতী-মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন যে, নিয়মিত জপ করিলে যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ, গ্রহ, সর্প ও শ্বাপদ-ভীতিও বিদূরিত হয়। শিবাগমে এবং পদ্ম ও নারদীয় পুরাণে উক্ত আছে :—সর্ব্ববিধ যজ্ঞ অপেক্ষা জপ-যজ্ঞই মহা-ফলপ্রদ।

জপ তিন প্রকার, যথা—মানস, উপাংশু ও বাচিক। মন্ত্র জপ করিবার সময় যখন সাধক মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ বা আবৃত্তি করেন, অর্থাৎ সাধক নিজেও যখন সেই মন্ত্রোচ্চারণ-শব্দ শুনিতে পান না, তখনই মানস-জপ হইল। যখন মন্ত্রের উচ্চারণ-শব্দ সাধক নিজ কর্ণে শুনিতে পান, কিন্তু তাহা অন্যের শ্রুতিগোচর হয় না, তাহাই উপাংশু-জপ এবং যে সময় মন্ত্রোচ্চারণ শব্দ অন্যেরও শ্রুতিগোচর হয়, তাহাই বাচিক-জপ। এই শেষোক্ত বাচিক-জপ অপেক্ষা উপাংশু-জপ দশগুণ ফলপ্রদ, কিন্তু উপাংশু-জপ যদি

কেবল জিহ্বার আন্দোলনেই পরিসমাপ্ত হয়, অর্থাৎ এত মৃদু শব্দ যে সাধকের নিজেরও ঠিক শ্রুতিগোচর হয় না, তাহা শতগুণ ফলপ্রদ, এবং মানস-জপ সহস্রগুণ ফলপ্রদ।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঃ—

"মানসঃ সিদ্ধিকামানাং পুষ্টিকামৈরুপাংশুকম্।
বাচিকো মারণে চৈব প্রশস্তো জপ ঈরিতঃ।"

সিদ্ধি-কামনায় মানস জপ, পুষ্টি-কামনায় উপাংশু-জপ এবং মারণাদি ক্রিয়ায় বাচিক-জপ প্রশস্ত। সুতরাং মানস—সাত্ত্বিক জপ, উপাংশু—রাজসিক জপ এবং বাচিক—তামসিক জপ বলা যাইতে পারে। সাধক স্ব স্ব অধিকার অনুসারে উক্ত নিয়মে জপ করিলেই সুফল পাইবেন।

জপকালে অতি দ্রুত কিম্বা অতি ধীরভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করা উচিত নহে। অতি সাবধানে সমব্যবধানে মন্ত্র উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। এই সম্বন্ধে "গুরুপ্রদীপে" বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। পাঠক তাহাও একবার দেখিয়া লইবেন। এস্থলে শ্রীগুরুমণ্ডলীর কৃপা-প্রদত্ত একটী অতি গুপ্ত উপদেশ বলিয়া দিতেছি। জপ-সিদ্ধিকামী সাধক ইহা প্রত্যক্ষ শিববাক্য জানিয়া অতি সাবধানে ইহার আচরণ ও অভ্যাস করিলে অচিরে সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন।

প্রত্যেক সাধক চিকিৎসা-শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট নাড়ী পরীক্ষার ন্যায় নিজ হস্তের মণিবন্ধে অন্য হস্তের অঙ্গুলি স্থাপনপূর্ব্বক নাড়ীর গতি অথবা বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া নিজ হৃদ্‌পিণ্ডের গতি লক্ষ্য করিবেন, তাহাতে যখন যে ভাবে ধুক্ ধুক্ করিয়া নাড়ী অথবা হৃদ্‌পিণ্ড স্পন্দিত হইতেছে অনুভব করিবেন, ঠিক সেইভাবেই বা সেই স্পন্দনের গতির সঙ্গে সঙ্গে এক একটী মন্ত্র উচ্চারণ-সহযোগে, সঙ্গীতের অনুগত তাল বা তদন্তর্গত মাত্রার নিয়মের ন্যায় মন্ত্র-জপ করিবেন। ইহাই মন্ত্র-জপের মাত্রা বা কালগতির গুপ্তরহস্য।

যে সাধক জপকালে এই নিয়মে মন্ত্র জপ করিতে করিতে মন্ত্রাধীশ দেবতায় মনোসংযোগ বা মন্ত্রাত্মক ধ্যানমূর্ত্তি-অনুসারে অন্তরে তাঁহার ধ্যান করিতে না পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বায়ু-সংযম করিতে না পারেন, তাঁহার জপকার্য্য সুফলপ্রদ হয় না অর্থাৎ সহজে তাঁহার মন্ত্র-সিদ্ধি হয় না। এই সঙ্গে মন্ত্রের অর্থ, রহস্য বা চৈতন্যাদি দশবিধ সংস্কার-বিষয় শ্রীগুরুদেবের নিকট বিধিপূর্ব্বক অবগত হইয়া জপকার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। মন্ত্র-সংস্কার-বিষয়ে পরে কিছু কিছু উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে।

শ্রীভগবান জপরহস্যে বলিয়াছেন ঃ—

"গুরুং শিরসি সংচিন্ত্য হৃদয়ে দেবতাং স্মরন্।
মূলমন্ত্রময়ীং ধ্যায়েৎ জিহ্বায়াং দীপরূপিণীং॥
ত্রয়াণাং তেজসাত্মানাং তেজোরূপং বিভাব্য চ।
জপেদনেন বিধিনা শীঘ্রং দেবি প্রসীদতি॥"

শ্রীগুরুদেবকে নিজ মস্তকে বা সহস্রার-মধ্যে, ইষ্টদেবতাকে হৃদয়-মধ্যে অনাহত কমলে এবং জিহ্বায় মূলমন্ত্র বা ইষ্টমন্ত্রকে তেজোময় চিন্তা করিবে। গুরু, দেবতা ও মন্ত্র এই তিনের ঐক্য করিতে হইবে। একথা "গুরুপ্রদীপে" * বলা হইয়াছে, বোধ হয় পাঠকের তাহা স্মরণ আছে। অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের ও শ্রীইষ্টদেবতার ধ্যানময়ী-মূর্ত্তি এবং মন্ত্রের বর্ণময়ী মূর্ত্তি, এই তিনই স্থূল-মূর্ত্তি। গুরু, দেবতা ও মন্ত্রের উক্তরূপ ত্রিবিধ স্থূলমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া সাধক তাঁহাদের তেজোত্রয় বা তিনের সমাহারে একটী তেজসাত্মক বা তেজোময়ী রেখামূর্ত্তি চিন্তা করিবেন এবং আপনাকেও তেজোময় অভিন্ন ভাবনা করিয়া সেই একমাত্র তেজোমূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্যপূর্ব্বক পূর্ব্বকথিত বিধি-অনুসারে জপানুষ্ঠান করিলে, সাধক

* "গুরোর্জ্জাতাশ্চ মন্ত্রাশ্চ মন্ত্রাজ্জাতা তু দেবতা।
গুরুস্ত্বমসি দেবেশি মন্ত্রোপি গুরুরুচ্যতে।
অতো মন্ত্রে গুরৌ দেবে ন ভেদশ্চ প্রজায়তে॥"

শীঘ্রই দেবপ্রসন্নতা লাভ করিতে পারিবেন। এইরূপ ভাবে নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক ইষ্টমন্ত্র-জপদ্বারা পুরশ্চরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহাতেই সাধকের মন্ত্র-সিদ্ধি হয় —ফলে সে সময় সাধকের হৃদয়-গ্রন্থিভেদ বা হৃদয় যেন উন্মুক্ত হইয়া যায়, সর্ব্বাবয়ব প্রবৃদ্ধ হয় বা দেহ উৎফুল্ল হইয়া উঠে, আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে থাকে এবং তাঁহার রোমাঞ্চ হইয়া দেহে দেবাবেশ হইয়া থাকে। তখন সাধকের কণ্ঠস্বরও অপূর্ব্ব ভাবমদে গদগদ হইয়া উঠে। নতুবা কেবল কলের পুতুলের মত মন্ত্র জপ করিলে অর্থাৎ মুখে মন্ত্র উচ্চারণ হইতেছে, হয়ত হাতেও মালা ঘুরিতেছে, কিন্তু মন সংসারের নানা-কার্য্যে বিচরণ করিতেছে ; মন্ত্রাত্মক দেবতায় ধ্যান নাই, মন্ত্ররহস্যেও লক্ষ্য নাই, কখনও বা সত্বর কার্য্যান্তরে যাইবার জন্য শীঘ্র শীঘ্র জপকার্য্য সম্পন্ন করিবার অভিলাষে মন্ত্রের যেন ঘোড়দৌড় আরম্ভ হইয়াছে অথবা তন্দ্রালস্যে মন্ত্রগুলি কণ্ঠে যেন জড়াইয়া যাইতেছে বা উচ্চারণও বুঝি ঠিক হইতেছে না ; এইরূপ জপের কোনও ফল নাই ; তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিফল-প্রযত্ন মাত্র! সাধক জপকালে এই সকল বিষয়ে মনোযোগ রাখিয়া বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবেন।

সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি স্ব স্ব অধিকার বা তত্ত্বপ্রধানমূলক ইষ্টমন্ত্র যাহা সদ্‌গুরুর কৃপায় লাভ করিয়া থাকেন, তাহাই পূর্ব্বকথিতমত বিধানানুসারে সাধন করিবেন। গুরূপদেশ ব্যতীত কোন মন্ত্রই ফলপ্রদ হয় না, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। পাঠকের একথাও যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে।

বাসনা জীবের স্বভাবসিদ্ধ বস্তু। সেই বাসনার বিনাশ ব্যতীত জীবের মুক্তি কখনই সম্ভবপর নহে। কিন্তু তাহা ত সাধারণ সাধকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব! তাহা যে, সাধকের অতি উচ্চ অবস্থার বিষয়ীভূত, একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বাসনার অপূর্ব্ব সম্বন্ধহেতু মধ্যম অধিকারী পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহা হইতে

বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। এই হেতু প্রাথমিক ও মধ্য-অধিকারী দিগের পক্ষে সততই কোন না কোনও সংকল্প বা অভিলাষ-সিদ্ধির প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব অভিলাষানুরূপ সঙ্কল্পসহ দৃঢ়-চিত্তে জপ-সাধন করা কর্ত্তব্য। মন্ত্রযোগে মন্ত্র-সিদ্ধি, হঠযোগে তপঃ-সিদ্ধি এবং লয়যোগে সংযম-সিদ্ধিদ্বারা সাধক নানাবিধ সাধন-বিভূতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধ গুরুদেবের কৃপায় সাধক উচ্চ যোগত্রয়ের এমন সুন্দর সমন্বয়যুক্ত উপদেশ প্রাপ্ত হন, যাহাতে ক্রমান্বয়ে অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্ম এই ত্রিবিধ সিদ্ধিই লাভ করিয়া থাকেন। মন্ত্র ও ক্রিয়া সাধনা-দ্বারা দেবতারাও বশীভূত হইয়া থাকেন, অতএব মন্ত্রাদি সিদ্ধ-যোগীর পক্ষে সংসারে সকল বৈভবই যে সুলভ হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? দেবাদিদেব শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন:—"মন্ত্রশুদ্ধি, ক্রিয়াশুদ্ধি ও ব্রহ্মশুদ্ধি-সহযোগে যে সাধক সাধনা করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে উক্ত কোন সিদ্ধিরই অভাব থাকে না এবং তাহা কোনকালে বিফল-প্রয়াস বলিয়া বোধ হইবে না।

'সাধনপ্রদীপে" মন্ত্ররহস্য-সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে, তাহা পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে; এক্ষণে মন্ত্রবীজ-সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিয়া এই জপাংশ সমাপ্ত করিব।

মন্ত্রসমূহের মধ্যে 'প্রণব' মন্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শাস্ত্র এই প্রণবকে সকল মন্ত্রের সেতুস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ উহা হইতেই সকল মন্ত্র পূর্ণশক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার এই প্রণবকেই শাস্ত্রে শব্দরূপ ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।* বীজমন্ত্র "প্রণব"রূপে মূলে এক, পরে অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূতরূপ একে তিনের অপূর্ব্ব মিশ্রণে "ওঁ তৎ সৎ", হইয়াছে। অনন্তর ইহারই অষ্টবিধ প্রধান বীজরূপে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে অষ্ট বীজ-

* 'প্রণব-রহস্য' দেখ।

মন্ত্র পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা—গুরুবীজ, শক্তিবীজ, রমাবীজ কামবীজ, যোগবীজ, তেজোবীজ, শান্তিবীজ এবং রক্ষাবীজ। সকল উপাসনাতেই এই শ্রেষ্ঠ বীজাষ্টক বিশেষ সহায়ক। কিন্তু ইহার রহস্যজ্ঞান ব্যতীত বিচারপূর্ব্বক যথাযোগ্য সংযোগ করা সাধারণ সাধকের পক্ষে অত্যন্তই কঠিন। যোগচতুষ্টয়াভিজ্ঞ সিদ্ধ-যোগীরাই তাহা যথাযথভাবে নিশ্চয় করিয়া দিতে পারেন। অনুসন্ধিৎসু সাধকগণের অবগতির জন্য নিম্নে উক্ত অষ্ট প্রকার বীজমন্ত্রের প্রকৃতিমাত্র প্রদত্ত হইতেছে।

১ম। গুরুবীজ—ঐঁ = আ + এ + ম্ = ঐঁ। *
২য়। শক্তিবীজ—হ্রীঁ = হ্ + র্ + ঈ + ম্ = হ্রীঁ। †
৩য়। রমাবীজ—শ্রীঁ = শ্ + র্ + ঈ + ম্ = শ্রীঁ।
৪র্থ। কামবীজ—ক্লীঁ = ক্ + ল্ + ঈ + ম্ = ক্লীঁ।
৫ম। যোগবীজ—ক্লীং = ক্ + ল্ = ঈ + ম্ = ক্লীঁ।
৬ষ্ঠ। তেজোবীজ—ট্রীঁ = ট্ + র্ + ঈ + ম্ = ট্রীঁ।
৭ম। শান্তিবীজ—স্ত্রীঁ = স্ + ৎ + র্ + ঈ + ম্ = স্ত্রীঁ।
৮ম। রক্ষাবীজ—হ্লীঁ = হ্ + ল্ + ঈ + ম্ = হ্লীঁ।

যেমন কারণ-ব্রহ্মের আট প্রকার প্রকৃতি, অর্থাৎ পঞ্চ তত্ত্ব ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার; যাহাতে কার্য্যব্রহ্ম উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ শব্দব্রহ্মের উক্ত অষ্টবীজই অষ্ট প্রকৃতিস্বরূপ। সকল উপাসনাতেই উহা পরম কল্যাণপ্রদ। তন্ত্রান্তরে এই মন্ত্রাষ্টকের অন্যরূপ নামও দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণই প্রণবাত্মক 'ম'কার সংযোগে বিবিধ মন্ত্রের জনয়িত্রী। শব্দরূপ ব্রহ্ম-প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতেই সকল মন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। মন্ত্র-রহস্যজ্ঞ মহাত্মগণ তাহার যথা-প্রয়োজন সংযোগ করিয়া বিবিধ

* ইহাকে বাগ্‌ভব বীজও বলে।
† তন্ত্রান্তরে ইহাকে সৌর, শক্তি ও মায়াবীজও বলা হইয়াছে।

সিদ্ধি-কার্য্যে বিনিয়োগ করিয়াছেন। মন্ত্রশাস্ত্রের নানা স্থানে তাহা অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এক্ষণে পুনরায় বলিতেছি—শব্দ-ব্রহ্মরূপী প্রণব-মন্ত্র, সকল মন্ত্রেরই রত্নাকরস্বরূপ। সকল মন্ত্রই নদীর প্রবাহের ন্যায় উহাতেই যাইয়া বিলীন হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, প্রধান-প্রকৃতিরূপী উক্ত অষ্ট বীজ-মন্ত্রের সিদ্ধিই প্রণব-জ্ঞান। যে সাধক এই বীজ-মন্ত্ররূপী নদীপথে আত্মচিত্ত ভাসাইয়া ক্রমে জলধিস্বরূপ প্রণবে লয় করিতে পারেন, তিনিই ধন্য! তাই শ্রীভগবান মন্ত্রচৈতন্য-রহস্যের উপদেশ-ক্রমে বলিয়াছেন :—

"চিচ্ছক্ত্যা ধ্বনিতং দেবি পরিণামক্রমেণ তু।
বর্ণভাবং পরিত্যজ্য নির্ম্মলং বিমলাত্মকং॥
ষট্চক্রঞ্চ তথা ভিত্ত্বা শব্দরূপং সনাতনং।
নাদবিন্দু সমাযুক্তং চৈতন্যং পরিকীর্ত্তিতং॥"

অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরস্থিত চিৎশক্তি, যাহা ষট্চক্রভেদ করিয়া ব্রহ্ম-বিবর হইতে অনাহত-প্রণবধ্বনিরূপে সমুত্থিত হয়, তাহার বা মন্ত্রসমূহের মূলীভূত প্রথম বর্ণভাব পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিশুদ্ধ অবিরত ধ্বন্যাত্মক শব্দ-ব্রহ্ম অনুভব করার নাম মন্ত্রচৈতন্য। সর্ব্বমন্ত্রই এই ভাবে সাধনা করিয়া চৈতন্যশালী করিতে হয়।

"মন্ত্রাক্ষরাণি চিচ্ছক্তৌ গ্রথিতানি মহেশ্বরি।
তামেব পরমব্যোম্নি পরমানন্দবৃংহিতে।
দর্শয়ত্যাত্মসদ্ভাবং পূজাহোমাদিভির্ব্বিনা॥"

মূলাধার চক্রের অন্তর্গত ব্রহ্মনাড়ী এবং তদন্তর্গত স্বয়ম্ভুলিঙ্গ আছেন, তাঁহাতেই কুণ্ডলিনী-শক্তি বেষ্টিত হইয়া আছেন। গুরু-নির্দ্দিষ্ট উপায়ে সেই চৈতন্য-স্বরূপিণী কুণ্ডলিনী-শক্তিকে উত্থাপিত করিয়া সহস্রারান্তর্গত পরমানন্দময় পরমশিবের সহিত একাত্ম্য করিতে পারিলেই মন্ত্রচৈতন্য হইয়া থাকে। এইরূপ ক্রিয়া-সিদ্ধ হইলে আর বাহ্য-পূজা-হোমাদির প্রয়োজন হয় না। তন্ত্রাচার্য্যগণ

মন্ত্রযোগের সহিত এইরূপ উন্নত যোগ-ক্রিয়ার উপদেশ দিয়া সাধকের প্রভূত কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন।

যাঁহারা এইরূপ মন্ত্রচৈতন্য-কার্য্যে অসমর্থ বা অনধিকারী, তাঁহারা নিম্নলিখিতরূপে গুরু-নির্দ্দিষ্ট নিয়মে মন্ত্রে-চৈতন্য সাধন করিবেন।

"ঈং বীজেনৈব পুটিতং মূলমন্ত্রং জপেদ্ যদি।
তদেব মন্ত্রচৈতন্যং ভবত্যেব সুনিশ্চিতং॥"

ঈং বীজ সাধকের মূল-মন্ত্রের পূর্ব্বে ও পরে সংযুক্ত করিয়া জপ করিলেও মন্ত্র-চৈতন্য হইয়া থাকে। তন্ত্রান্তরে এই ক্রিয়ার আরও অনেক প্রকার নিয়ম আছে।

শ্রীভগবান মন্ত্রার্থ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

• "শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং পূর্ণব্রহ্মময়ং খগং।
মূলাদি-ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং কুলং ধ্যাত্বা পুনঃ পুনঃ॥
বিচিন্তয়েৎ সূক্ষ্মরূপাং মহাগুর্ব্বীং স্বদেবতাং।
মন্ত্রার্থঞ্চেতি তজ্জ্ঞানং তজ্জ্ঞানান্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥"

মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত কুণ্ডলিনীকে শুদ্ধস্ফটিক-সন্নিভ আকাশবৎ পূর্ণব্রহ্মময় ধ্যান করিয়া তন্মধ্যে ইষ্টদেবতার বর্ণময়-দেহ ভাবনা করাকে মন্ত্রার্থ কহে। এই প্রকার মন্ত্রার্থজ্ঞান হইলে সাধকের মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অথবা—

"কেবলং ভাববুদ্ধ্যা চ মন্ত্রার্থং প্রাণবল্লভে।"

অর্থাৎ মন্ত্রের মূলীভূত তাহার বর্ণাকার রূপ পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাহার ভাবার্থ বা সেই মন্ত্রের ধ্যান-প্রতিপাদ্য দেবতার ভাববিশেষে তন্ময় হওয়াই মন্ত্রার্থ-সিদ্ধি জানিবে।

এইরূপ মন্ত্রের শিখা, কুল্লুকা, সেতু, মহাসেতু, নির্ব্বাণ, সূতক, দীপনী, প্রাণযোগ ও নিদ্রাদোষাদিহরণ-রূপ মন্ত্রের দশ-সংস্কার-বিষয়ে নানা উপদেশ-ছলে শব্দব্রহ্ম-স্বরূপ মন্ত্র-প্রকৃতির পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে।

যোগতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিবৃন্দ সগুণমন্ত্র ও ব্রহ্মমন্ত্রের যে ভেদ-নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও সাধনাভিলাষীর জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। কারণ, পূর্ণাভিষেক-কালেই পূজ্যপাদ শ্রীগুরুমণ্ডলী-কর্ত্তৃক উক্ত ব্রহ্মমন্ত্রের দীক্ষা প্রদত্ত হইলেও, সেই সময় সগুণ-মন্ত্রেরই উপাসনা তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। তথাপি তাঁহাদের শেষ গন্তব্য যে কোথায়, তাহারই এক ইঙ্গিত মাত্র সে সময় দেওয়া হয়; অর্থাৎ সগুণ-মন্ত্রের উপাসনা লইয়াই যাহাতে তাঁহারা আবদ্ধ বা শেষ পর্য্যন্ত ভুলিয়া না থাকেন, দেবাদিদেব শ্রীমৎ সদাশিবের ইহাও অন্যতম উদ্দেশ্য। তবে প্রথম হইতে সেই সগুণ-মন্ত্রের সাধনাদ্বারাই সাধক ক্রমে উন্নত হইয়া সবিকল্প সমাধি লাভ করিতে পারেন। উপাসনা-ভেদ-অনুসারে অর্থাৎ তত্ত্বপঞ্চকের প্রাধান্যমূলক ভেদ-অনুসারে এবং অবতারদিগের উপাসনাভেদে, উক্ত মূল অষ্ট-বীজের অতিরিক্ত শিববীজ, সূর্য্যবীজ, গণেশবীজ এবং রামবীজ, কৃষ্ণবীজ, ইত্যাদি অন্য অনেক বীজ-মন্ত্র সাধন-শাস্ত্রের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত মূল বীজের সহিত যোগ করিয়া অথবা এক বীজ অন্য বীজের সহিত সংযোগ করিয়া বিবিধ মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে; সে সমস্তই সগুণ বীজমন্ত্র, বিভিন্ন সাধকের অবস্থা অনুসারে সেগুলিও সিদ্ধিপ্রদ। ইহাদ্বারাও সাধক সবিকল্প সমাধি লাভ করিতে পারেন। অনন্তর ব্রহ্মমন্ত্র-সাধনাদ্বারা উন্নততম সাধক চিরাকাঙ্ক্ষিত নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মমন্ত্রের মধ্যেও প্রণবই যে সর্ব্বপ্রধান, * তাহা বলাই বাহুল্য। তবে ভাবময় অন্য ব্রহ্মমন্ত্রের বিষয়ে শাস্ত্রে মহাবাক্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বেদচতুষ্টয়ের অনুসারে চারিটী মহাবাক্যই প্রধান। তাহাদের আবার সত্ত্বাদি গুণপার্থক্য অনুসারে তিন তিনটী করিয়া মন্ত্রের সমাহারে দ্বাদশটী মহাবাক্য বলিয়াও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। তদ্ব্যতীত প্রত্যেক বেদের শাখা অনুসারেও এই বর্ত্তমান কল্পে এক হাজার এক শত আশিটী

---

* 'প্রণবরহস্য' দেখ।

ব্রহ্মমন্ত্রের সংখ্যা রাজযোগী মন্ত্রাচার্য্যদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। গায়ত্রী-মন্ত্র, সকল ব্রহ্মমন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উক্ত সংখ্যা-সমূহের অতিরিক্ত ব'লিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। সমস্ত ব্রহ্মমন্ত্রই স্বরূপদ্যোতক ও আত্মজ্ঞান-প্রকাশক। মহাপূর্ণ-দীক্ষিত রাজ-যোগীদিগের পক্ষেই তাহা একমাত্র অবলম্বনীয়। মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজযোগের অধিকার পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই মন্ত্রের সহায়তা প্রয়োজন হইয়া থাকে।

১৫শ। **ধ্যান** :—পরম পূজ্যপাদ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন :—

"অত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।"

ধারণাদ্বারা ধারণীয় পদার্থে চিত্তের যে একাগ্রভাব জন্মে, তাহার নাম ধ্যান। সগুণ ও নির্গুণ-ভেদে ধ্যান দুই প্রকার। শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

সগুণং নির্গুণং তচ্চ সগুণং বহুশঃ স্মৃতং ॥"

নির্গুণ-ধ্যান একই প্রকার, তাহা উচ্চতম অধিকারের বিষয়ীভূত ; কিন্তু সগুণ-ধ্যান নানাপ্রকার, তাহাই মন্ত্রাদি-যোগের অন্তর্গত ও অবলম্বনীয়। শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বহুপ্রকার সগুণ-ধ্যানের মধ্যে পঞ্চোপাসনা-মূলক পাঁচ প্রকার ধ্যানই উত্তম। তাহার পর ত্রিবিধ সন্ধ্যোক্ত ধ্যান মুখ্য বা অত্যুত্তম, তাহা অপেক্ষাও মহাসন্ধ্যোক্ত ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং নির্গুণ ব্রহ্ম-ধ্যান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধ্যান বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ আচার্য্যগণের উপদেশক্রমে ইহাই নিশ্চয় হইয়াছে যে, অধ্যাত্ম-ভাব হইতেই মন্ত্রযোগে বর্ণিত ধ্যানাঙ্গের আবির্ভাব হইয়াছে। অতীব গভীর, অতীন্দ্রিয়, নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পরমানন্দময় ভাবরাজ্যমধ্যে অবিরত ভ্রমণের ফলে পঞ্চোপাসনার অধিকার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অধ্যাত্ম ভাবপুঞ্জের আদর্শ লইয়া আত্মতত্ত্ববেত্তা মহর্ষিগণ বিভিন্ন সাধন-পরায়ণ মন্ত্রযোগীদিগের

কল্যাণের জন্যই বেদ, তন্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্রের মধ্যে এই অপূর্ব্ব ধ্যান-বিধির বর্ণনা করিয়াছেন। মন্ত্রযোগ-কথিত এই ধ্যানাঙ্গ সম্পূর্ণ ভাব-প্রধান। কার্য্যব্রহ্ম ও কারণব্রহ্মও ভাবময় জানিতে হইবে। কার্য্যব্রহ্ম স্বতঃই ত ভাবময় আছেনই, কিন্তু মন ও বাক্যের অগোচর কারণব্রহ্মও ভাবগম্য। কারণ, শব্দের সহিত তদাত্মক রূপের সম্বন্ধ সদা অবিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। আবার নাম ও রূপ ব্যতীত কোনও প্রকার ধ্যানই অসম্ভব! অতএব মন্ত্র-যোগের সকল ধ্যানই অভ্রান্ত ভাবময় হইবার কারণ সম্পূর্ণ সমাধিপ্রদ বলিয়া যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উপাসনা-তৎপর সাধক শ্রীগুরুদেবের উপদেশানুসারে স্ব স্ব অধিকারের যে কোনও ধ্যান দৃঢ়ভক্তি-সহকারে অভ্যাস করিলে নিশ্চয়ই ধ্যান-সিদ্ধ হইয়া সমাধি-লাভে সমর্থ হইতে পারিবেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মন্ত্রাদি-যোগভেদে ধ্যান চতুর্ব্বিধ। স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম ; অর্থাৎ মূর্ত্তিধ্যান, জ্যোতির্ধ্যান, বিন্দুধ্যান ও ব্রহ্মধ্যান। ব্রহ্মধ্যান রাজযোগের অন্তর্গত এবং তাহা যোগযুক্ত ও ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন না হইলে কাহারই উপলব্ধি হইতে পারে না বলিয়া, পূজ্যপাদ আচার্য্যবৃন্দ সাধারণতঃ ত্রিবিধ ধ্যানেরই উল্লেখ করেন, যথাঃ—

> "স্থূলং জ্যোতি স্তথা সূক্ষ্মং ধ্যানস্য ত্রিবিধং বিদুঃ।
> স্থূলং মূর্ত্তিময়ং প্রোক্তং জ্যোতিস্তেজোময়ং তথা॥
> সূক্ষ্মং বিন্দুময়ং ব্রহ্ম কুণ্ডলী পরদেবতা॥"

অর্থাৎ স্থূলধ্যান, জ্যোতির্ধ্যান ও বিন্দুধ্যান-ভেদে ধ্যান তিন প্রকার। যাহাতে মূর্ত্তিমান অভীষ্টদেব কিম্বা গুরু, পরমগুরু প্রভৃতিকে চিন্তা করা যায়, তাহার নাম স্থূল ধ্যান। যাহাদ্বারা তেজোময়-ব্রহ্মকে চিন্তা করা যায়, তাহার নাম জ্যোতির্ধ্যান এবং যে ধ্যানদ্বারা বিন্দুময়-ব্রহ্ম বা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সাক্ষাৎ লাভ হয়, তাহার নাম সূক্ষ্ম ধ্যান। স্থূল ধ্যান সম্বন্ধে শাস্ত্র বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"স্বকীয় হৃদয়ে ধ্যায়েৎ সুধাসাগরমুত্তমম্।
তন্মধ্যে রত্নদ্বীপস্তু সুরত্নবালুকাময়ং॥
চতুর্দ্দিক্ষু নীপতরুর্বহুপুষ্পসমন্বিতং।
নীপোপবনসংকুলে বেষ্টিতং পরিখা ইব॥
মালতী-মল্লিকা-জাতী-কেশরৈশ্চম্পকৈস্তথা।
পারিজাতৈঃ স্থলৈঃ পদ্মৈ গন্ধামোদিতদিঙ্মুখৈঃ॥
তন্মধ্যে সংস্মরেদ্ যোগী কল্পবৃক্ষ মনোহরং।
চতুঃশাখা চতুর্ব্বেদং নিত্যপুষ্পফলান্বিতং॥
ভ্রমরাঃ কোকিলাস্তত্র গুঞ্জন্তি নিগদন্তি চ।
ধ্যায়েত্তত্র স্থিরোভূত্বা মহামাণিক্য-মণ্ডপং॥
তন্মধ্যে তু স্মরেদ্ যোগী পর্য্যঙ্কং সুমনোহরং।
তত্রেষ্টদেবতাং ধ্যায়েদ্ যদ্ধ্যানং গুরুভাষিতং॥
যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনং।
তদ্রূপং ধ্যায়তে নিত্যং স্থূলধ্যানমিদং বিদুঃ॥"

সাধক নয়ন মুদ্রিত করিয়া হৃদয়মধ্যে এই প্রকার চিন্তা করিবে যে, উত্তম সুধাসাগর তথায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার মধ্যে একটী সুশোভিত রত্নময় দ্বীপ, সেই দ্বীপের রত্নময় বালুকারাশি সর্ব্বত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহার চারিদিকে পরিখারূপে কদম্বতরুসমূহ অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে, অসংখ্য অসংখ্য কদম্ব-পুষ্প বিকশিত হওয়াতে বৃক্ষগণের শোভার পরিসীমা নাই। তাহার সহিত মালতী, মল্লিকা, জাতী, নাগকেশর, বকুল, চম্পক, পারিজাত, স্থলপদ্ম বা গোলাপ প্রভৃতি নানা প্রকার তরুরাজির সুমনোহর পুষ্পগন্ধে চারিদিক আমোদিত রহিয়াছে, ভ্রমরগণ গুন্ গুন্ স্বরে পরিভ্রমণ করিতেছে, কোকিলকুল কুহু কুহু স্বরে দিগ্ দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে, সেই মনোমুগ্ধকর পবিত্রস্থলে, সেই কল্পবৃক্ষের মুলদেশে মহামাণিক্য-বিনির্ম্মিত মণ্ডপোপরি এক অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্ক সুশোভিত রহিয়াছে, মন্ত্রযোগাভিলাষী যোগী তাহারই

উপর স্বীয় অভীষ্টদেবতা বিরাজ করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিবেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ গুরুদেব অভীষ্টদেবতার যেরূপ ধ্যান, রূপ, তাঁহার ভূষণ ও বাহনাদির উপদেশ দিয়াছেন, সেই রূপেই এই স্থানে ধ্যান করিবেন। ইহাকেই আচার্য্যবৃন্দ "স্থূল-ধ্যান" বলিয়াছেন।

স্থূল ধ্যান-সম্বন্ধে অধিকারী-ভেদে অন্য প্রকার উপদেশও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, সাধকের অবগতির জন্য তাহাও নিম্নে বর্ণন করিতেছি।

"সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকায়াং বিচিন্তয়েৎ।
বিলগ্নসহিতং পদ্মং দ্বাদশৈর্দ্দলসংযুতং॥
শুক্লবর্ণং মহাতেজো দ্বাদশৈর্বীজভাষিতং।
হসক্ষমলবরয়ূঁ হসখফ্রেঁ যথাক্রমং॥
তন্মধ্যে কর্ণিকায়ান্তু অকথাদি রেখাত্রয়ং।
হলক্ষকোণসংযুক্তং প্রণবং তত্র বর্ত্ততে॥
নাদবিন্দুময়ং পীঠং ধ্যায়েত্তত্র মনোহরং।
তত্রোপরি হংসযুগ্মং পাদুকা তত্র বর্ত্ততে॥
ধ্যায়েত্তত্র গুরুদেবং দ্বিভুজঞ্চ ত্রিলোচনং।
শ্বেতাম্বরধরং দেবং শুক্লগন্ধানুলেপনং॥
শুক্লপুষ্পময়ং মাল্যং রক্তশক্তিসমন্বিতং।
এবম্বিধগুরুধ্যানাৎ স্থূলধ্যানং প্রসিদ্ধতি॥"

ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রার নামে সহস্রদলবিশিষ্ট মহাপদ্ম বিরাজিত আছে, মন্ত্রযোগী-সাধক তাহারই বীজকোষ-মধ্যে বিলগ্নভাবে আর একটী দ্বাদশদলযুক্ত কমল চিন্তা করিবেন। সেই শুক্লবর্ণ কমলের দ্বাদশদলে মহাতেজোবিশিষ্ট দ্বাদশ-বীজাত্মক নিম্নলিখিত দ্বাদশটী বর্ণ যথাক্রমে দক্ষিণাবর্ত্তে বিরাজিত রহিয়াছে। হ স খ ফ্রেঁ হ স ক্ষ ম ল ব র য়ূঁ। সেই পদ্মের কর্ণিকামধ্যে অ ক থ বর্ণত্রয়-রূপ ত্রিরেখা এবং সেই রেখা-তিনটীর পরস্পর সংযোগে অপূর্ব্ব

ত্রিকোণাকার যন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। উহার তিনটী কোণ যথাক্রমে হ ল ক্ষ এই ত্রি-বর্ণস্বরূপ এবং তাহারই মধ্যস্থলে (ওঁ) প্রণবরূপ শব্দব্রহ্ম বা নাদ-বিন্দুযুক্ত ব্রহ্ম বিদ্যমান রহিয়াছেন। মন্ত্রযোগী ঐরূপ সুমনোহর নাদ-বিন্দুরূপে পীঠ বা আসন চিন্তা করিবেন। তাহার উপর হংস-যুগ্মরূপ শ্রীগুরু-পাদুকা ভাবনা করিবেন। অনন্তর সেই পাদুকার উপর নিম্নলিখিতরূপ ধ্যানানুসারে শ্রীগুরু চিন্তা করিবেন। সুমঙ্গলময় বরাভয়যুক্ত দ্বিভুজ ও ত্রিনেত্রবিশিষ্ট, শুক্লাম্বরধারী শ্বেত-শাশ্বতবর্ণ শ্রীগুরুদেব শুক্লগন্ধাদিদ্বারা প্রলিপ্ত, শ্বেত পুষ্পমালায় সুশোভিত এবং তাঁহার বামপার্শ্বে বা বামাঙ্গরূপে লোহিতবর্ণা তদীয় শক্তি বিরাজিতা রহিয়াছেন। এই প্রকার ধ্যানই স্থূলধ্যান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্রমে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মচিন্তার অধিকারী হইলে, সাধক কেবল নাদবিন্দুময় প্রণব-পীঠ বা শব্দব্রহ্ম চিন্তা করিতে সমর্থ হইবেন। "বিশ্বসার", "কঙ্কালমালিনী" ও "নীলতন্ত্রা"দিতেও এইরূপ স্থূল-ধ্যানের নানা প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধক স্ব স্ব শ্রীগুরুমুখেই তাহা শ্রবণ করিবেন। যাহা হউক, মন্ত্র-যোগের উক্তরূপ স্থূল ধ্যান সিদ্ধ হইলেই সাধকের সমাধি-অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে।

১৬শ। সমাধিঃ- ইহাই ষোড়শাঙ্গ মন্ত্র-যোগের অন্তিম অঙ্গ। সুতরাং পূর্ব্বকথিত সকল অঙ্গের সাধনায় মন্ত্র-সহিত ধ্যান-সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রাত্মক দেবতায় মন্ত্রযোগীর মন লয় হইয়া সমাধির উদয় হয়। সাধনাবস্থায় প্রথম হইতেই সাধকের মনে মন্ত্র ও দেবতার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ বিদ্যমান থাকে। ক্রমে পূর্ব্বকথিত মন্ত্রযোগের প্রথমাঙ্গ 'ভক্তি' হইতে 'ধ্যান' পর্য্যন্ত পঞ্চদশবিধ ক্রিয়া সাধনার ফলে মন, মন্ত্র ও দেবতার পরস্পর পার্থক্যবোধ বিলুপ্ত হইয়া থাকে। মন্ত্রই তখন মধ্যস্থ হইয়া মন ও দেবতার সংযোগসহ স্বয়ংও লয়প্রাপ্ত অথবা কি এক অপূর্ব্ব-ভাবে তদ্গত হইয়া ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয়রূপী ত্রিপুটী সমস্তই

কোথায় লয় হইয়া যায়। তখন আর সাধকের সেই তিনের পার্থক্যজ্ঞান থাকে না। সেই অবস্থায় প্রথমে তাঁহার পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চ হইতে থাকে, নয়নে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে থাকে, আরও কত অপূর্ব্ব লক্ষণসমূহের প্রকাশ হইতে থাকে, তাহা বর্ণনাতীত। অনন্তর সে ভাবও ক্রমে লয়-প্রাপ্ত হইলে, বিমল সমাধির উদয় হয়। সাধক তখন সেই অবস্থা লাভ করিয়া পরম কৃতার্থ হইয়া যান।

মন্ত্রযোগের এই সমাধিকে যোগতন্ত্রে "মহাভাব" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যতক্ষণ পূর্ব্বকথিত জ্ঞাতা, ধ্যান ও ধ্যেয়রূপী ত্রিপুটী বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ সাধকের ধ্যানাধিকার জানিতে হইবে। তাহার পর ত্রিপুটীর লয় হইলেই এই মহাভাবের উদয় হইয়া থাকে। মহাভাবরূপ মন্ত্রযোগের এই সমাধি অবস্থায় প্রধানতঃ ভাবময় রূপ এবং শব্দময় নামের বা মন্ত্রের সহিত মনের ঐক্য-সমাধানেই সাধকের বহিরঙ্গ ক্রিয়া একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, অন্যের দৃষ্টিতে সাধককে তখন শবরূপে বা জড়ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। এইরূপ হঠযোগের সমাধিকে "মহাবোধ" এবং লয়যোগের সমাধিকে "মহালয়" শব্দে তত্তদ্ যোগতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী যোগ-রহস্যে তাহা ক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

মানব সুষুপ্তি অবস্থায় যেমন ভয়, ভাবনা, দ্বন্দ্ব, হিংসা, দ্বেষ ও অনুরাগাদি হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যায়, তখন ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া একেবারে বন্ধ থাকে, তমোভাবাপন্ন দেহ প্রায় শবের ন্যায় পতিত থাকে, সমাধি অবস্থাতেও সাধকের বহির্দ্দেহে প্রায় সেই ভাবেরই লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ তখনও সাধক নির্ভয়, নির্ভাবনা ও দ্বন্দ্ববিরহিত অবস্থায় আত্মানন্দে অভিভূত হইয়া থাকেন, সে সময় তাঁহারও ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া বাহিরে কিছুই লক্ষিত হয় না, তবে সুষুপ্তিকালের ন্যায় তখন তাঁহার তমোমূলক অজ্ঞান অবস্থা নহে, তখন পূর্ণ সত্ত্বগুণমূলক জাগ্রত অবস্থারই

পরিণতিতে তিনি বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়াও আত্মজ্ঞানে বিভোর হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন।

মন্ত্রযোগই সকল যোগের মূল। মন্ত্রযোগই সকল সাধনা ও উপাসনার মূলভিত্তি; সুতরাং কোন সাধকেরই মন্ত্রযোগাধিকারে অবহেলা করা উচিত নহে। ভিত্তি অসম্পূর্ণ বা অপরিপুষ্ট থাকিলে কোন উন্নত যোগই কাহারও সিদ্ধ হইবে না। সেই কারণ জ্ঞানাধিকারী বা জ্ঞানপন্থী সাধক ও সাধুদিগের পক্ষেও এই মন্ত্রযোগবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ রাখা কর্ত্তব্য। "গুরুপ্রদীপের" মধ্যে মন্ত্রযোগ-গ্রহণাধিকার-সম্বন্ধে "অভিষেকাদি" অংশে তাহার প্রক্রিয়া বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব সেই সময়েই যোগমন্ত্রের দীক্ষাসহ দেবাদিদেব শ্রীপঞ্চানন তাঁহার পাঁচমুখে যে দশবিধ যোগের উপদেশ দিয়াছেন, তাহারও ইঙ্গিতরূপ (১) তৎপুরুষ, (২) অঘোর, (৩) সদ্যোজাত, (৪) বামদেব এবং (৫) ঈশান মন্ত্রের উপদেশ দিয়া থাকেন। যোগসিদ্ধাভিলাষী সাধক ভক্তিসহকারে নিত্য তাহার চিন্তা করিবেন। পরবর্ত্তী অংশে হঠাদিযোগের অনুষ্ঠান সময়েও উক্ত মন্ত্র-পঞ্চকের চিন্তা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

যোগসাধনার্থী সাধকের অবগতির জন্য এস্থলে সেই অপূর্ব্ব মন্ত্রপঞ্চক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১ম। তৎপুরুষ মন্ত্র :—

"ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নোরুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥"

ইহা গায়ত্রী-সম্ভব, হরিদ্বর্ণ, বশ্যাকারক, কলাচতুষ্টয়যুক্ত ও চতুর্ব্বিংশতি-বর্ণাত্মক।

২য়। অঘোর মন্ত্র :—

"ওঁ অঘোরেভ্যোহথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ সর্ব্ব সর্ব্বেভ্যো নমস্তেহস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ ॥"

ইহা অথর্ব্ববেদোক্ত, ত্রয়স্ত্রিংশৎ-অক্ষরাত্মক, অষ্টকলাযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, অঘাপহ ও আভিচারিক।

৩য়। সদ্যোজাত মন্ত্র :—

"ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ ভবে ভবেঽনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় বৈ নমঃ॥"

ইহা যজুর্ব্বেদীয়, শান্তিকর, সদ্যোজাত, অষ্টকলাসংযুক্ত, পঞ্চত্রিংশৎ-অক্ষরাত্মক ও শ্বেতবর্ণ।

৪র্থ। বামদেব মন্ত্র :—

"ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলাধিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ।

ইহা সামবেদসম্ভূত, লোহিতবর্ণ, বালাপ্রকৃতি, ত্রয়োদশকলাসমন্বিত, প্রথম পাদে জগতীচ্ছন্দোযুক্ত এবং জগতের বৃদ্ধি ও সংহারের কারণ।

৫ম। ঈশান মন্ত্র :—

"ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোধিপতির্ব্রহ্মা শিবোমেঽস্তু সদাশিব ওঁ॥"

ইহা ওঁকার-বীজোদ্ভব, শুদ্ধ-স্ফটিকসঙ্কাশ, পঞ্চকলা-সংযুক্ত, অষ্টত্রিংশৎ-অক্ষরাত্মক, মেধাবৃদ্ধিকর ও সর্ব্বার্থসাধক।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—"মন্ত্রজপান্মনোলয়ো মন্ত্রযোগঃ।" অর্থাৎ যে বিধানের দ্বারা মন্ত্রজপ করিতে করিতে মন সেই মন্ত্রাত্মক দেবতায় লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই মন্ত্রযোগ। ফলকথা এই, মন্ত্রযোগের সাধনা হইতেই মনকে বশীভূত করিবার জন্য শ্রীগুরুপ্রদর্শিত বিধানে প্রাণপণে যত্ন করিতে হইবে। মন বড়ই দুর্নিবার, মনই এই স্থূল দেহরাজ্যের অধিপতি হইয়া দেহস্থিত কর্ম্ম ও জ্ঞানইন্দ্রিয়গুলির শতবিধ বৃত্তির সহিত এতই অনুরক্ত যে, সতত তাহাদেরই ইঙ্গিতে মন বিশ্বচরাচর পরিভ্রমণ করিতে থাকে।

তুমি ধারণা-ধ্যানে চিত্ত-নিয়োগ করিতে বসিয়াছ, মনকে নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছ ভাবিতেছ; কিন্তু সে ইন্দ্রিয়বৃত্তিবশে এমনই চতুরচূড়ামণি—তোমাকে কেমন ভুলাইয়া যেন ঘুম পাড়াইয়া এমনই ধীরে ধীরে বিষয়ান্তরে লইয়া যাইবে যে, তুমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিবে না, কখন যে কেমন করিয়া সরিয়া গিয়াছে, তাহা টেরও পাইবে না। তাহার পর যখন তোমার তাৎকালিক প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিরোধী কোন ভাবের সম্মুখীন হইবে, তখনই সহসা তন্দ্রাভঙ্গের ন্যায় বুঝিতে পারিবে, মন তোমায় ফাঁকি দিয়া এতক্ষণ কোথায় কত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়াছে; তখন নিশ্চয় তোমার লজ্জা হইবে, তোমার দুর্ব্বলতা তখনই বুঝিতে পারিবে, তখন পুনরায় যেন সাজ গোছ করিয়া মনকে দৃঢ়ভাবে নজরবন্দী করিতে যত্ন করিবে। কিন্তু সহসা মনকে জয় করিতে পারিবে কি? কিছুতেই পারিবে না! তাই শ্রীগুরুমণ্ডলী মন্ত্রযোগের অঙ্গরূপে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব-কথিত ষোড়শ প্রকার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। মন্ত্র-যোগের অভ্যাসের সহিত সে অনুষ্ঠানের ক্রম তোমায় রাখিতেই হইবে; অর্থাৎ মনকে কেবল নজরবন্দী করিয়া রাখিয়া দিলে চলিবে না। সে যে অতীব ধূর্ত্ত, তোমার ক্ষণমাত্র সেবা করিয়া, তোমার সাধনায় তিলমাত্র সহায়তা করিয়াই, তোমায় এমন ভুলাইয়া দিবে যে, তুমি তাহা ত বুঝিতে পারিবেই না, অধিকন্তু তোমাকেই সে ধোঁকা দিয়া তাহার শত-সন্তান-স্বরূপ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-গুলির নিকট লইয়া যাইবে, তোমাকে তাহাদের অধীন করিতে যত্ন করিবে। অতএব এরূপ স্থলে পরম পূজ্যপাদ আচার্য্যবৃন্দ-নির্দ্দিষ্ট উক্ত অনুষ্ঠানসমূহের সহিত মনকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া বা নিযুক্ত করিয়া দাও; সেই সঙ্গে মনকেও কিছু কাজ করিতে দাও, তাহা হইলে মন আর সহসা পলাইতে পারিবে না, পলাইলে ঐ অনুষ্ঠান-গুলিই তাহার পলায়ন-বার্ত্তা তোমায় জানাইয়া দিবে; অর্থাৎ

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রযোগের সাধনার সময় তদঙ্গ-নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান-বিশেষে লিপ্ত থাকিলে, মন চঞ্চল হইতে পারে না। বহু সাধকই অনুষ্ঠান-বিশেষকে বাহ্যক্রিয়া-বোধে অবজ্ঞা করেন। তাঁহাদের ধারণা—সতত অন্তরে তাঁহার চিন্তা রাখিলেই হইল, বাহ্যক্রিয়ার কোনই প্রয়োজন নাই।" কিন্তু ইহা অবধারিত সত্য যে, তাঁহারা কথনই মনকে স্থির করিতে পারেন না, তাঁহারা স্ব স্ব হৃদয়ে হস্তার্পণ করিয়া সরলান্তরে চিন্তা করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই কারণেই তন্ত্রসমূহের মধ্যে মন্ত্রযোগাঙ্গের ষোড়শবিধ অনুষ্ঠান ক্রিয়ার এত বাঁধাবাঁধি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে এবং এইজন্যই পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, স-অনুষ্ঠান মন্ত্রযোগ সকল সাধনার মূলভিত্তি অথবা যোগচতুষ্টয়ের প্রথম সোপান; সুতরাং এ বিষয়ে কাহারই অবহেলা করা উচিত নহে, জ্ঞানমার্গের পথিক হইলেও মন্ত্রযোগা-নুষ্ঠান কাহারও সহসা পরিত্যাজ্য নহে। সাধকমাত্রেই এবিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিলে, তাঁহাদের যোগসিদ্ধি সুগম হইয়া আসিবে। পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং পুনরায় বলিতেছি—সকল যোগেরই মূলভিত্তি মন্ত্রযোগ। তাহা অপুষ্ট থাকিলে সাধন-সৌধের সমুচ্চ চূড়া 'সমাধি' কোন কালেই সুরক্ষিত থাকিবে না। ফলে সকল সাধনাই ব্যর্থ হইবে! শ্রীভগবান শিবসংহিতায় বলিয়াছেন :—

"জ্ঞানকারণমজ্ঞানং যথা নোৎপদ্যতে ভৃশং।
অভ্যাসং কুরুতে যোগী তদাসঙ্গবিবর্জ্জিতা॥"

অর্থাৎ জ্ঞানাভিলাষী যোগী জ্ঞানের বৃদ্ধির জন্যই সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ হইয়া যোগাভ্যাস করিবে, তাহা হইলে সংসার-বন্ধনকর অজ্ঞান আর উৎপন্ন হইতে পারিবে না। অতএব শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুসারে সকলেরই যথাযোগ্য মন্ত্রযোগের সর্ব্বদা অভ্যাস রাখা কর্ত্তব্য।

হঠযোগরহস্য।

মন্ত্রযোগরহস্যের ন্যায় হঠযোগরহস্য-বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্ব্বেই এই যোগের পূজ্যপাদ আচার্য্য, ঋষি ও গুরুমণ্ডলীর শ্রীচরণ-প্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছি। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমন্মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, মরীচি, জৈমিনী, পরাশর, ভৃগু, শাকটায়ন ও বিশ্বামিত্র আদি মহর্ষিগণ এই হঠযোগের প্রধান ও প্রাচীন আচার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত। এতদ্ব্যতীত যোগিগণ-বরেণ্য অষ্টাবক্র, ব্যাস ও শুকাদি মুনিগণ, আদিগুরু বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দদেব, সপ্তকুলগুরু * ও গুরু-পঙক্তি † এবং ঘেরণ্ড ও গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধ গুরুমণ্ডলীও এই যোগ-শাস্ত্রের বিবিধ উপদেশ ও গুপ্তরহস্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

হঠযোগের আচার্য্য, প্রকৃতি ও সপ্তাঙ্গ।

---

* সপ্তকুলগুরুর ধ্যান যথা :—

"প্রহ্লাদানন্দনাথঞ্চ সনকানন্দনাথকং।
কুমারানন্দনাথঞ্চ বশিষ্ঠানন্দনাথকঃ॥
ক্রোধানন্দ স্থখানন্দৌ ধ্যানানন্দং ততঃ পরং।
বোধানন্দং তথাশ্চৈব ধ্যায়েৎ কুলমুখোপরি॥
পরামৃতরসোল্লাসহৃদয়া ঘূর্ণলোচনাঃ।
কলালিঙ্গনসম্ভিন্ন চূর্ণিতা শেষতামসাঃ॥
কুলশিষ্যৈঃ পরিবৃতাঃ পূর্ণাস্তকরণোদ্যতাঃ।
বরাভয়করাঃ সর্ব্বে যোগতন্ত্রার্থবাদিনঃ॥"

† গুরুমণ্ডলী বা গুরুপঙক্তি দিব্যৌঘ, সিদ্ধৌঘ ও মানবৌঘ-ভেদে ত্রি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া সাধকমাত্রেরই নিত্য পূজনীয়।

দিব্যৌঘ গুরুপঙক্তি :—(১) মহাদেবানন্দনাথ, (২) মহাকালানন্দনা (৩) ত্রিপুরানন্দনাথ, (৪) ভৈরবানন্দনাথ।

সিদ্ধৌঘ গুরুপঙক্তি :—(১) ব্রহ্মানন্দনাথ, (২) পূর্ণদেবানন্দনাথ, (চলচ্চিত্তানন্দনাথ, (৪) চলাচলানন্দনাথ, (৫) কুমারানন্দনাথ, (৬) ক্রোধানন নাথ, (৭) বরদানন্দনাথ, (৮) স্মরদীপানন্দনাথ।

"হঠযোগ-প্রদীপিকায়" দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীআদিনাথ বা সদাশিব ভগবান কোনও নির্জ্জন দ্বীপে ভগবতী শ্রীমতী পার্ব্বতী মাতার প্রশ্নে "হঠযোগ-তন্ত্র"-সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন, সেই সময় সেই দ্বীপের তীর-সমীপে জলমধ্যে মৎস্যরূপী কোনও সৌভাগ্যবান্ জীবও সেই যোগোপদেশ শ্রবণ করিয়া দিব্য যোগিপুরুষে পরিণত হন। তিনিই কালে জগতে মহাযোগী মৎস্যেন্দ্র নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে যথাক্রমে শাবরণেন্দ্র, ভৈরব, চৌরঙ্গী, মীননাথ, গোরক্ষনাথ ও বিরূপাক্ষ প্রভৃতি বহু সিদ্ধ যোগীরাজ হঠযোগ-প্রসাদে অপ্রতিহত যোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া যমদণ্ডও খণ্ডনপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সতত বিচরণ করিতেছেন। শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতে বলিয়াছেন ঃ—

"হিরণ্যগর্ভোযোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ ॥"

অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভই এই যোগশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রথম বক্তা, তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহই যোগোপদেশ প্রকাশ করেন নাই। আবার পুরাণে কথিত আছে ঃ—বেদব্যাস-পুত্র যোগিশ্রেষ্ঠ শুকদেব পূর্ব্বজন্মে পক্ষী-যোনিতে কোন বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া শিবমুখ-নিঃসৃত হঠযোগের উপদেশ শ্রবণ করিয়াই যোগসিদ্ধ হইয়াছিলেন ও পরজন্মে পরম যোগী হইয়া জগতে যোগতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। যাহাহউক, সেই যোগাচার্য্য মহাপুরুষদিগের শ্রীচরণাম্বুজে আমার ভক্তিপূর্ণ

মানবৌঘ গুরুপঙ্‌ক্তি ঃ—(১) বিমলানন্দনাথ, (২) কুশলানন্দনাথ, (৩) ভীমসেনানন্দনাথ, (৪) সুধাকরানন্দনাথ, (৫) মীনানন্দনাথ, (৬) গোরক্ষানন্দ নাথ, (৭) ভোজদেবানন্দনাথ, (৮) প্রজাপত্যানন্দনাথ, (৯) মূলদেবানন্দনাথ, (১০) রন্তিদেবানন্দনাথ, (১১) বিঘ্নেশ্বরানন্দনাথ, (১২) হুতাশনানন্দনাথ, (১৩) সময়ানন্দনাথ, (১৪) নকুলানন্দনাথ, (১৫) সন্তোষানন্দনাথ, (১৬) নিজ মন্ত্রদাতাগুরু; এতৎসহ পরমগুরু, পরাপরগুরু, পরমেষ্ঠিগুরুদেবও নিত্য অর্চ্চনীয়।

অসংখ্য প্রণাম নিবেদন করিয়া মুক্তিকামী সাধকদিগের অবগতির জন্য সংক্ষেপে এই হঠযোগ-রহস্য বর্ণন করিতেছি।

ইহার ব্যুৎপত্তি-বিচার সম্বন্ধে শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

"হকারঃ কীর্ত্তিতঃ সূর্য্যষ্ঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্য্যোগাদ্ধঠযোগোনিগদ্যতে ॥"

"হশ্চ ঠশ্চ = হঠৌ, সূর্য্যচন্দ্রৌ তয়োর্যোগাঃ হঠ-যোগঃ, এতেন হঠ শব্দ বাচ্যয়োঃ সূর্য্যচন্দ্রাখ্যায়োঃ প্রাণাপানয়োরৈক্য লক্ষণঃ প্রাণায়ামো হঠযোগ ইতি যোগলক্ষণং সিদ্ধম্।" অর্থাৎ হ শব্দে সূর্য্য এবং ঠ শব্দে চন্দ্র, হঠ শব্দে সূর্য্য-চন্দ্রের একত্র সংযোগ; যোগশাস্ত্রে প্রাণ-বায়ুর নাম সূর্য্য এবং অপান বায়ুর নাম চন্দ্র:কথিত হইয়াছে। সেই কারণ ইড়া ও পিঙ্গলায় বায়ুদ্বয়ের একত্র সম্মিলনকেও হঠ-যোগ বলে।

প্রাণ, অপান, নাদ, বিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সহযোগে উৎপন্ন হয় বলিয়া যোগশাস্ত্রে মানবদেহকে ঘট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। জল-নিমজ্জিত অপক্ক ঘটের ন্যায় এই দেহ-ঘট অবিদ্যা-সলিলে স্বতঃই বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই কারণ আচার্য্যগণ তাহা যোগানলে দগ্ধ করিয়া অর্থাৎ দৃঢ়তর করিয়া ঘটশুদ্ধি বা দেহ-শুদ্ধি করিবার যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই 'হঠযোগ' বলিয়া যোগ-তন্ত্র-সংহিতার মধ্যে অভিহিত হইয়াছে। মন্ত্রযোগ অপেক্ষা হঠ্ বা বল দ্বারা ইহা সংসাধিত হয় বলিয়াও ইহার হঠযোগ আখ্যা হইয়াছে। শ্রীশ্রীভগবান শঙ্কর তাই বলিয়াছেনঃ—

"প্রাণাপান-নাদ-বিন্দু-জীবাত্মা-পরমাত্মনাং।
মেলনাদ্ ঘটতে যস্মাৎ তস্মাদ্বৈ ঘট উচ্যতে ॥
আমকুম্ভমিবাভ্যস্থং জীর্য্যমানং সদাঘটং।
যোগানলেন সন্দহ্য ঘটশুদ্ধিং সমাচরেৎ ॥
ঘটযোগ সমাযোগাদ্ধঠযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

মন্ত্রাদ্ধঠেন সম্পাদ্যোযোগোঽয়মিতি বা প্রিয়ে।
হঠযোগ ইতি প্রোক্তো হঠাজ্জীবশুভাপ্রদাঃ॥”

নশ্বর বা সতত জীর্য্যমান এই দেহকে প্রথমে হঠযোগাবলম্বনে দৃঢ়তর করিয়া সূক্ষ্ম শরীরকেও যোগযুক্ত করিবে। কারণ স্থূল-শরীর সূক্ষ্মশরীরেরই পরিণামান্তর। ককারাদি বর্ণের অভ্যাসের দ্বারা যেমন ক্রমে সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়, সেইরূপ এই স্থূল-শরীরের সাধনদ্বারা সূক্ষ্ম-শরীরের * যে যোগ সিদ্ধ হয় বা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, তাহাও হঠযোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

“স্থূল সূক্ষ্মস্য দেহো বৈ পরিণামান্তরং মতঃ।
কাদিবর্ণান্ সমাভ্যস্য শাস্ত্রজ্ঞানং যথাক্রমম্॥
যথোপলভ্যতে তদ্বৎ স্থূলদেহস্য সাধনৈঃ।
যোগেন মনসো যোগো হঠযোগ প্রকীর্ত্তিতঃ॥”

মন্ত্রযোগের ষোড়শ প্রকার অঙ্গের ন্যায় হঠযোগ-বিজ্ঞানেরও সপ্তবিধ অঙ্গ বা সাত প্রকার সাধন-বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

“শোধনং দৃঢ়তা চৈব স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবং।
প্রত্যক্ষঞ্চ নির্লিপ্তঞ্চ ঘটস্য সপ্তসাধনং॥”

শোধন, দৃঢ়তা, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, লাঘব, প্রত্যক্ষ ও নির্লিপ্ত এই সাত প্রকার ক্রিয়াকে হঠযোগের ‘সপ্ত-সাধন’ বলিয়া যোগশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাদের নাম ও লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় :—

“ষট্‌কর্ম্মাসনমুদ্রাঃ প্রত্যাহারশ্চ প্রাণসংযমঃ।
ধ্যানসমাধী সপ্তৈবাঙ্গানি স্যুর্হঠস্য যোগস্য॥

---

* স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরাদি বিষয়ে পঞ্চমোল্লাস দেখ।

ষট্‌কর্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্ দৃঢ়ম্।
মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা॥
প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি।
সমাধিনা নির্লিপ্তঞ্চ মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ॥"

ষট্‌কর্ম্ম, আসন, মুদ্রা, প্রত্যাহার, প্রাণসংযম, ধ্যান ও সমাধি হঠযোগের এই সাত প্রকার ক্রিয়ার মধ্যে—১ম। ষট্‌কর্ম্ম সাধন-দ্বারা দেহের শোধন, ২য়। আসন-ক্রিয়ার সিদ্ধির দ্বারা দৃঢ়তা, ৩য়। মুদ্রা-সাধনায় স্থিরতা, ৪র্থ। প্রত্যাহার-সাধনার ফলে ধীরতা, ৫ম। প্রাণায়ামে লঘুতা, ৬ষ্ঠ। ধ্যানে আত্মপ্রত্যক্ষতা এবং ৭ম। সমাধিদ্বারা নির্লিপ্ততা বা বাসনারাহিত্য সিদ্ধি হইয়া সাধকের যে জীবন্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এইস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক, হঠযোগের ক্রিয়াগুলি প্রায়ই অতি কঠিন, গুরূপদেশ-ব্যতীত কেবল পুঁথি দেখিয়া ইহা অভ্যাস করা কখনই সঙ্গত নহে। কারণ ইহার প্রক্রিয়া-বিশেষের সামান্য ইতর-বিশেষ হইলেই অনেক সময় দেহের বিশেষ আশঙ্কার বিষয় হইয়া পড়ে। মন্ত্রযোগের সাধনায় বাহ্য আবরণের সহিত মনেরই সম্বন্ধ অধিক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মন্ত্রযোগে অবশ্য বর্ণ ও আশ্রমাদির বিশেষ সম্বন্ধ জড়িত আছে, অর্থাৎ সকল মন্ত্র, সকল ক্রিয়া, সর্ব্ব বর্ণের বা সমস্ত আশ্রমের সাধকের পক্ষেই সাধারণভাবে বিধিবদ্ধ নাই। কিন্তু হঠযোগের অধিকার-সম্বন্ধে সে সমুদয় নিয়ম বিচার করিবার সেরূপ প্রয়োজন হয় না, কেবল অধিকারী-বোধে যে-কোনও বর্ণ বা আশ্রমের সাধককেই হঠযোগের উপদেশ প্রদান করা যাইতে পারে। তবে দৈহিক তারতম্যের বিচার করিয়া যথোপযুক্ত উপদেশ-দীক্ষার আজ্ঞা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, জলে আমকুম্ভের ন্যায় সতত অবিদ্যা-সলিলে জীর্যমান দেহকে অথবা অপটু দেহকে এই হঠযোগের ক্রিয়াদ্বারা

সুপটু বা পরিপক্ক করিতে পারা যায়। সেই কারণ অনেক সময় অকর্ম্মণ্য-দেহী মন্ত্রযোগীদিগকেও প্রয়োজনানুসারে হঠ-ক্রিয়ার কোন কোন উপদেশ দিবার বিধান যোগতন্ত্রের মধ্যেই বিশদভাবে বর্ণিত আছে। মন্ত্রযোগানুষ্ঠানে যম বা সংযম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার যে যে বিশেষ বিধান আছে, তাহা পূর্ব্বপূর্ব্ব খণ্ডেও বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। এই হঠযোগানুষ্ঠানে তাহা স্বতন্ত্রভাবে বলা না হইলেও, পূর্ব্বাভ্যাসক্রমে তাহা ত রক্ষিত হইবেই, অধিকন্তু ব্রহ্মচর্য্যবিধির বীর্য্যাদি-ধারণের ন্যায় ইহাতে বায়ু-ধারণের প্রক্রিয়াই বিশেষ অবলম্বনীয়। কারণ, যথাক্রমে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপী বীর্য্য, বায়ু ও মন স্থির করাই সকল যোগেরই মূলীভূত ক্রিয়া। অর্থাৎ স্থূলদেহ স্থির না হইলে বা স্থূলদেহের সারবস্তু বীর্য্য স্থির না হইলে, স্থূল সূক্ষ্মের মিলনকর্ত্তা সূক্ষ্মজগতের শেষ-বস্তু বায়ুরূপ প্রাণেরও স্থিরতা সম্পাদিত হইতে পারে না। এই হেতু হঠযোগে বীর্য্যধারণসহ বায়ু-ধারণ-প্রক্রিয়াই প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহারই সিদ্ধির কারণ দেহ-শোধনাদি পূর্ব্বকথিত ক্রিয়াগুলি সাধকের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে ক্রমে ক্রমে শ্রীগুরুমুখাগত হইয়া অবলম্বন করিতে হয়।

ষট্‌কর্ম্ম বা শোধন-ক্রিয়া।

দেহ-শোধন-জন্যই ষট্‌কর্ম্ম অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন। মন্ত্রযোগের দ্বিতীয় অঙ্গ-নির্দ্দিষ্ট যে 'শুদ্ধি'-ক্রিয়ার বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে। সেই স্থান, দেহ, দিক্, দ্রব্য ও মন আদি শুদ্ধির ন্যায় হঠযোগ-সাধনায় নিম্নলিখিত ষট্‌কর্ম্ম * বা ছয় প্রকার শোধনক্রিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট। তবে

* হঠযোগের ষট্‌কর্ম্মের ন্যায় মন্ত্রযোগমধ্যেও ষট্‌কর্ম্ম নামে কয়েকটী ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার সহিত ইহার সহসা ভ্রম হওয়া অনেকের পক্ষেই স্বাভাবিক। এই কারণ মন্ত্রযোগের ষটকর্ম্ম যে কি, তাহা এই স্থলেই উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

এগুলি সমস্তই দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-শোধনের জন্যই নির্ণীত হইয়াছে।

"ধৌতির্ব্বস্তিস্তথানেতি লৌলিকী ত্রাটকং তথা।
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কর্ম্মাণি সমাচরেৎ॥"

১। ধৌতি, ২। বস্তি, ৩। নেতি, ৪। লৌলিকী, ৫। ত্রাটক, ৬। কপালভাতি, এই ছয় প্রকার কর্ম্মদ্বারা দেহের চেতনাসঞ্চার বা শোধন সম্পাদিত হইয়া থাকে। এতদ্-সম্বন্ধে শ্রীভগবান সদাশিব 'গ্রহযামলে' বলিয়াছেন :—

"ধৌতিশ্চ গজকারিণী বস্তির্লৌলী নেতিস্তথা।
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কর্ম্মাণি মহেশ্বরি॥

"শান্তি বশ্য স্তম্ভনানি বিদ্বেষোচ্চাটনে তথা।
মারণান্তানি শংসন্তি ষট্‌কর্ম্মাণি মনীষিণঃ॥"

শান্তি; বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ এই ছয় প্রকার কর্ম্মকে মনীষিগণ 'ষট্‌কর্ম্ম' বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

১। যে কর্ম্মদ্বারা রোগ, কুকৃত্য ও গ্রহাদি-দোষ শান্তি হয়, তাহার নাম 'শান্তি' কর্ম্ম। ২। যে ক্রিয়াদ্বারা জীবমাত্রেই বশীভূত হয়, তাহাকে বশীকরণ কহে। ৩। যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানফলে প্রাণীদিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির রোধ হয় তাহার নাম 'স্তম্ভন'। ৪। মিত্রভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পর প্রণয়-ভঞ্জন হইয়া বিদ্বেষভাব জন্মাইয়া দিবার প্রক্রিয়াকে 'বিদ্বেষণ' কহে। ৫। যে কর্ম্মের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে স্বদেশাদি হইতে ভ্রষ্ট করা যায়, তাহাকে 'উচ্চাটন' বলে। ৬। যে কার্য্যদ্বারা জীবের প্রাণ হরণ করা যায়, তাহাকে মারণ কহে।

মন্ত্রযোগ-নির্দ্দিষ্ট এই ষট্‌কর্ম্ম আত্মোন্নতির প্রতিবন্ধকপ্রদ যে অধম কর্ম্ম, তাহা বলাই বাহুল্য। মন্ত্রযোগের মধ্যে এইগুলি নিম্নশ্রেণীর ক্রিয়া বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট। পরিতাপের বিষয় অধুনা 'মন্ত্রাচার্য্য' বা 'মন্ত্রশাস্ত্রী' বলিলে, লোকে এই ষটকর্ম্মী সাধকদিগকেই মনে করিয়া থাকেন। তাহার কারণ, উন্নত মন্ত্রযোগী প্রায় আর দৃষ্টিগোচর হয় না; পক্ষান্তরে স্বার্থপর ইহ-লৌকিক সুখানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদিগের সংখ্যাধিক্যবশতঃ বর্ত্তমান সময়ে উক্ত ষট্‌কর্ম্মের সাধনারই প্রচার অধিক হইয়া পড়িয়াছে। মুক্তিকামী সাধকগণ সতত এই তুচ্ছ বিভূতিপ্রদ ষট্‌কর্ম্ম হইতে যেন দূরে অবস্থান করেন।

কর্ম্মষট্‌কমিদং গোপ্যং ঘটশোধনকারণং।
মেদশ্লেষ্মাধিকঃ পূর্ব্বং ষট্‌কর্ম্মাণি সমাচরেৎ॥
অন্যথা নাচরেত্তানি দোষানামপ্যভাবতঃ॥"

অর্থাৎ ধৌতি গজকারিণী, বস্তি, লৌলী, নেতি এবং কপাল-ভাতি ইহাকেই ষট্‌কর্ম্ম বলে। এই ষট্ ক্রিয়া দ্বারা শরীর শোধন হইয়া থাকে, ইহা অতীব গোপনীয়। যাহার দেহ মেদ ও শ্লেষ্মার আধিক্যযুক্ত, সেই ব্যক্তিই ষট্‌কর্ম্ম সাধন করিবে। তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তির পক্ষে ইহার অভ্যাস বা অনুষ্ঠান করা অনুচিত। সুতরাং উপযুক্ত গুরুদেব শিষ্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া প্রয়োজন বোধ করিলে, কোন কোন ক্রিয়ামাত্রেরই উপদেশ প্রদান করিবেন, অন্যথা ইহার আবশ্যক নাই। যোগীশ্বর শ্রীভগবানের এইরূপ কঠোর আদেশসত্ত্বেও কি জানি কেন বহু হঠযোগী গুরু যোগশিক্ষা-ভিলাষী প্রত্যেক সাধককেই প্রথম হইতে ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান-সমূহের উপদেশ দিয়া থাকেন এবং এই ষট্‌কর্ম্মের কিছু অভ্যাস দেখাইতে পারিলেই তাঁহারা নিজেদের পৌরুষ মনে করেন! ফলে অনেক সময় তাঁহাদের মধ্যে ইহার নানা বিষময় ফলও নয়ন-গোচর হইয়া থাকে।

নেতি যোগাদির আচরণের কি কি প্রয়োজন আছে, যোগ-শাস্ত্রের মধ্যেই তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"নেতি যোগং হি সিদ্ধানাং মহাকফবিনাশনং।
দণ্ডিযোগং প্রবক্ষ্যামি হৃদয়গ্রন্থিভেদনং॥
ধৌতিযোগং ততঃ পশ্চাৎ সর্ব্বমলবিনাশনং।
বস্তিযোগং হি পরমং সর্ব্বাঙ্গোদরচালনং॥
ক্ষালনং পরমং যোগং নাড়ীনাং ক্ষালনং স্মৃতং।
এবং পঞ্চামরাযোগং যোগীনামতিগোচরং॥"

অর্থাৎ নেতি যোগদ্বারা শ্লেষ্মাদোষ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, দণ্ডিযোগ

সাধনায় হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, ধৌতিযোগ মলসমূহ ধ্বংস করে, বস্তিযোগ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ও জঠর পরিচালিত হইয়া থাকে এবং ক্ষালনযোগদ্বারা নাড়ী প্রক্ষালিত হয়। ইহাকেই পঞ্চামরা-যোগ বলে। যোগীগণের শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ বা প্রয়োজন-মত দৈহিক উন্নতিকল্পেই এই পঞ্চামরাযোগ সাধন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্ত ষট্‌কর্ম্ম এবং এই পঞ্চামরা-যোগ, হঠযোগের অনুষ্ঠানে প্রথম অবলম্বনীয়। অষ্টাঙ্গ-যোগোপদেশকালে তাহার দ্বিতীয় অঙ্গ 'নিয়মের' বিষয় যাহা পূর্ব্বপূর্ব্বখণ্ডে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, হঠযোগের এই ষট্‌কর্ম্ম বা পঞ্চামরাযোগ নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া-গুলি সেই 'নিয়ম' অঙ্গেরই অংশ-স্বরূপ শোধন-অভ্যাসমাত্র।

১ম। **ধৌতি** ঃ—এতদ্-সম্বন্ধে শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় (ক) অন্তর্ধৌতি, (খ) দন্তধৌতি, (গ) হৃদ্ধৌতি ও (ঘ) মূল শোধন, এই চারি প্রকার ধৌতিক্রিয়া। ইহার অনুষ্ঠানে শরীর ক্রমে নির্ম্মল হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যেও আবার অনেক অনু বিভাগ আছে। যথাঃ—(ক) অন্তর্ধৌতির চারিভেদ। বাতসার, বারিসার, বহ্নিসার ও বহিষ্কৃতি-ধৌতি। এতন্মধ্যে "বাতসার" সম্বন্ধে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে ঃ—

"কাকচঞ্চুবদাস্যেন পিবেৎ বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ।
চালয়েদুদরং পশ্চাদ্বর্ত্মনা রেচয়েচ্ছনৈঃ॥"
বাতসারং পরং গোপ্যং দেহনির্ম্মলকারণং।
সর্ব্বরোগক্ষয়করং দেহানলবিবর্দ্ধকং॥"

নিজ ওষ্ঠযুগল কাকের ঠোঁটের ন্যায় সরুমত করিয়া ধীরে ধীরে পুনঃ পুনঃ বায়ু পান করিবে ও সেই বায়ু জঠরমধ্যে পরিচালিত করিয়া পুনরায় মুখদ্বারা রেচন করিবে। ইহাই 'বাতসার' বলিয়া কথিত। ইহাদ্বারা শরীরের নির্ম্মলতা সাধিত হয়। যাবতী

দহরোগ দূরীভূত হয় এবং জঠরাগ্নি পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহা অতীব গোপনীয় ক্রিয়া।

তন্ত্রান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

"কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং শীতলম্বা বিচক্ষণঃ।
প্রাণাপানবিধানজ্ঞঃ স ভবেন্মুক্তিভাজনঃ॥
সরসং যঃ পিবেদ্বায়ুং প্রত্যহং বিধিনা সুধীঃ।
নশ্যন্তি যোগিনস্তস্য শ্রমদাহজরাময়াঃ॥
কাকচঞ্চ্বা পিবেদ্বায়ুং সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
কুণ্ডলিন্যা মুখে ধ্যাত্বা ক্ষয়রোগস্য শান্তয়ে॥"
অহর্নিশং পিবেদ্‌যোগী কাকচঞ্চ্বা বিচক্ষণঃ।
দূরশ্রুতির্দূরদৃষ্টি স্তথা স্যাদ্দর্শনং খলু॥"

অর্থাৎ বিচক্ষণযোগী কাকচঞ্চুর ন্যায় মুখ করিয়া তদ্বারা শীতল বায়ু পান করিবে। যিনি প্রাণ ও অপান নামক বায়ুদ্বয়ের বিধি বিদিত আছেন, তিনিই মুক্তিলাভ করিতে পারেন। যে যোগী প্রত্যহ যথাবিধি সরস বায়ু পান করেন, শ্রম, দাহ, ও জরা প্রভৃতি কিছুই তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। "কুণ্ডলিমুখে বায়ু সমাগত হইতেছে" যোগী-ব্যক্তি এই প্রকার চিন্তা করিয়া উভয় সন্ধ্যাকালে কাকচঞ্চুবৎ মুখদ্বারা বায়ু পান করিবেন। এই প্রকার করিলে ক্ষয়রোগও দূরীভূত হয়। সুবোধ যোগী দিবারাত্রি কাকচঞ্চুসদৃশ মুখদ্বারা বায়ু পান করিলে দূরশ্রুতি ও দূরদৃষ্টি প্রাপ্ত হইতে পারেন। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

"বারিসার" ধৌতি-সম্বন্ধে পূজ্যপাদবৃন্দ বলিয়াছেনঃ—

"আকণ্ঠং পূরয়েদ্বারি বক্ত্রেণ তু পিবেচ্ছনৈঃ।
চালয়েদুদরেণৈব চোদরাদ্রেচয়েদধঃ॥"

মুখদ্বারা ধীরে ধীরে আকণ্ঠ বারি পান করিয়া কিয়ৎক্ষণ উদরমধ্যে উহা পরিচালিত করিবে, পরে অধোপথে বা গুহ্যদ্বার দিয়া

তাহা রেচন করিবে। ইহাকেই 'বারিসার' বলে। ইহাও অ
গুপ্ত ক্রিয়া। বিশেষ যত্নসহকারে সাধনা করিতে পারিলে শরী
নির্ম্মল হইয়া দেব-দেহের তুল্য রূপ হইয়া থাকে।

"বহ্নিসার" বিষয়ে শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন :—

"নাভিগ্রন্থিং মেরুপৃষ্ঠে শতবারঞ্চ কারয়েৎ।
অগ্নিসারমেষা ধৌতির্যোগিনাং যোগসিদ্ধিদা॥"

'গুরুপ্রদীপে' যোগাধ্যায়ের মধ্যে অনেক স্থলে বলা হইয়া
নাভি-গ্রন্থিই দেহমধ্যে অগ্নিস্থান। সেই বহ্ন্যাধার নাভিস্থা
পশ্চাদ্দিকে সংকোচ করিয়া অর্থাৎ 'আঁৎমারিয়া' মেরুপৃষ্ঠ পর্য
একশতবার করিয়া নিত্য স্পর্শ করাইবার প্রথাকেই অগ্নিস
কহে। ইহাদ্বারা উদরের আমাদি নষ্ট হইয়া জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হ
ইহাও অতি গোপনীয় ধৌতিক্রিয়া। দেবতাদিগেরও ইহা দু
বলিয়া আচার্য্যগণ বর্ণন করিয়াছেন।

"বহিষ্কৃতি" ধৌতি সম্বন্ধে উক্ত আছে :—

"কাকীমুদ্রাং সাধয়িত্বা পূরয়েদুদরং মরুৎ।
ধারয়েদর্দ্ধযামন্তু চালয়েদধবর্ত্মনা।"

প্রথমে মুখে কাকচঞ্চুর সদৃশ করিয়া বায়ু পান পূর্ব্বক উ
পরিপূর্ণ করিবে এবং ঐ বায়ু উদরের অভ্যন্তরে অর্দ্ধ যামক
ধারণা করিয়া অধোপথে তাহা চালিত করিতে হইবে। ইহাবে
বহিষ্কৃতি ধৌতি বলে। এই ধৌতি ক্রিয়া পরম গুহ্য, কথ
প্রকাশ করা উচিত নহে। এই বহিষ্কৃতি ধৌতি সম্বন্ধে শা
বিশেষ আদেশ এই যে :—

"যামার্দ্ধধারণাশক্তিং যাবন্ন সাধয়েন্নরঃ।
বহিষ্কৃতং মহদ্ধৌতি স্তাবচ্চৈব ন জায়তে॥

সাধক যতদিন যামার্দ্ধ কাল পর্য্যন্ত নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অর্থ

বায়ু ধারণ করিতে সমর্থ না হইবেন, ততদিন তাঁহার এই বহিষ্কৃতি ধৌতি পরিচালনা করা উচিত নহে।

"প্রক্ষালন" ক্রিয়া বিষয়ে শাস্ত্র বলিয়াছেনঃ—

"নাভি মগ্নো জলে স্থিত্বা শক্তি-নাড়ীং বিসর্জ্জয়েৎ।
করাভ্যাং ক্ষালয়েন্নাড়ীং যাবন্মলবিবর্জ্জনম্।
তাবৎ প্রক্ষাল্য নাড়ীঞ্চ উদরে বেশয়েৎ পুনঃ॥"

নাভিমগ্ন জলে অবস্থিত হইয়া শক্তি-নাড়ী বহিষ্কৃত করিবে ও যতক্ষণ তাহার মল সকল নিঃশেষরূপে ধৌত না হয় ততক্ষণ হস্ত-দ্বারা ভাল করিয়া প্রক্ষালন করিবে। পরে পুনরায় তাহা সাবধানে উদরের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। এই প্রক্ষালন ক্রিয়া অতি কঠিন ব্যাপার, অভিজ্ঞ গুরুদেবের সহায়তা বিনা কখন স্বয়ং অভ্যাস করিতে প্রয়াস করিবে না। তন্ত্রান্তরে প্রকাশিত আছে যে,—নাড়ী আদির সাধন ও ক্ষালন যোগিবর্গের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে যোগী নেউলী যোগ দ্বারা নাড়ী ক্ষালিত করেন, তিনি মহাকাল ও রাজরাজেশ্বর হইতে পারেন। কেবল-মাত্র প্রাণ বায়ুর ধারণাবশতঃই ক্ষালন-যোগ সাধিত হয়। ক্ষালন-যোগ ব্যতীত দেহ-শোধন হইতে পারে না। ক্ষালন-যোগে নাড্যাদির শ্লেষ্মা-পিত্ত-প্রকৃতি দোষ দূর করিয়া দেয়। যথাঃ—

"সচাবশ্যং ক্ষালনঞ্চ কুর্য্যান্নাড্যাদি সাধনম্।
নিউনী যোগ মার্গেণ নাড়ীক্ষালন তৎপরঃ॥
ভবত্যেব মহাকালো রাজরাজেশ্বরো যথা।
কেবলং প্রাণবায়োশ্চ ধারণাৎ ক্ষালনং ভবেৎ॥
বিনা ক্ষালনযোগেন দেহশুদ্ধি র্ন জায়তে।
ক্ষালনং নাড়িকাদীনাং শ্লেষ্ম-পিত্ত-নিবারণং॥

(খ) দন্ত ধৌতির পাঁচটী বিভাগ, যথা—দন্তমূল ধৌতি,

জিহ্বামূল ধৌতি, কর্ণরন্ধ্র ধৌতি এবং কপালরন্ধ্র ধৌতি। এতদ্মধ্যে "দন্তমূল ধৌতি" সম্বন্ধে উক্ত আছে :—

"খাদিরেণ রসেনাহথ মৃত্তিকয়া চ শুদ্ধয়া।
মার্জ্জয়েদ্দন্তমূলঞ্চ যাবৎ কিল্বিষমাহরেৎ॥
দন্তমূলং পরা ধৌতি র্যোগিনাং যোগসাধনে।
নিত্যং কুর্য্যাৎ প্রভাতে চ দন্তরক্ষণহেতবে॥
দন্তমূলং ধাবনাদি কার্য্যেষু যোগিনাং মতং॥"।

খদির রস অথবা বিশুদ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা উত্তম করিয়া দন্তমূল মার্জ্জন করিবে। যোগিগণের যোগ সাধন বিষয়ে দন্তমূল ধৌতিই একটী শ্রেষ্ঠ কার্য্য। নিত্য প্রভাতকালে দন্ত রক্ষার জন্য দন্তমূল ধাবনাদি কার্য্য বিধিপূর্ব্বক সম্পন্ন করিবেন।

দন্ত ধৌতির দ্বিতীয় কার্য্য জিহ্বা শোধন। ইহা দ্বারা জিহ্বা দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয় ও জরা-মরণ-রোগাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে। তাহার প্রক্রিয়া যথা :—

"তর্জ্জনী মধ্যমানামাঙ্গুলীনাং ত্রিতয়ং নরঃ।
বেশয়েদ্ গলমধ্যেতু মার্জয়েল্লম্বিকামূলং।
শনৈঃ শনৈর্মার্জ্জয়িত্বা কফ-দোষং নিবারয়েৎ॥
মার্জ্জয়েন্নবনীতেন দোহয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ।
তদগ্রং লৌহযন্ত্রেণ কর্ষয়িত্বা-শনৈঃ শনৈঃ॥
নিত্য কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন রবেরুদয়কেহস্তকে।
এবং কৃতে তু নিত্যং সা লম্বিকা দীর্ঘতাং ব্রজেৎ॥"

তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিত্রয় একত্র করিয়া গল-মধ্যে প্রবেশ করাইয়া জিহ্বার মূল পর্য্যন্ত মার্জ্জনা করিবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ মার্জ্জনা করিলে শ্লেষ্মা-দোষ বিনষ্ট হইয়া যায়। পুনঃ পুনঃ নবনীত দ্বারা জিহ্বা মার্জ্জন ও দোহন করিয়া লৌহ-যন্ত্র (চিমটা বা শাঁড়াশী) দ্বারা ধীরে ধীরে আকর্ষণপূর্ব্বক বাহির

করিতে হয়। প্রতিদিন প্রাতে ও সূর্য্যাস্ত সময়ে সযত্নে এই ধৌতি অভ্যাস করিবে, তাহা হইলে জীহ্বা দীর্ঘতা প্রাপ্ত হইবে।

"কর্ণরন্ধ্র-ধৌতি" সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশ আছে :—

"তর্জ্জন্যনামিকাযোগান্মার্জ্জয়েৎ কর্ণরন্ধ্রয়োঃ।
নিত্যমভ্যাসযোগেন নাদান্তরং প্রকাশয়েৎ॥

তর্জ্জনী ও অনামিকা এই দুই অঙ্গুলী দ্বারা কর্ণরন্ধ্রযুগল মার্জ্জনা করিবে। প্রত্যহ ইহা অভ্যাস করিলে নাদান্তর প্রকাশিত হইয়া থাকে।

"কপালরন্ধ্র ধৌতি" বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশ ;—

"বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেন দক্ষেণ মার্জ্জয়েদ্ ভালরন্ধ্রকং।
এবমভ্যাসযোগেন কফদোষং নিবারয়েৎ॥"

নিত্য ভোজন ও নিদ্রার পর এবং সন্ধ্যার সময় দক্ষিণ করের বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বারা কপালরন্ধ্র মার্জ্জন করিলে কফদোষ নিবারণ হয়। নাড়ী নির্ম্মল হইয়া দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে।

(গ) হৃদ্ধৌতির তিনটী বিভাগ, যথা :—দণ্ডধৌতি, বমন ধৌতি ও বসন ধৌতি। ইহার মধ্যে প্রথম দণ্ডধৌতি সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে :—

"রম্ভাদণ্ডং হরিদ্রাদণ্ডং বেত্রদণ্ডং তথৈব চ।
হৃন্মধ্যে চালয়িত্বাতু প্রত্যাহরেচ্ছনৈঃ শনৈঃ॥
কফং পিত্তং তথাক্লেদং রেচয়েদূর্দ্ধবর্ত্মনা।
দণ্ডধৌতিবিধানেন হৃদ্রোগং নাশয়েদ্ধ্রুবং॥"

কদলীর গর্ভপত্র বা কলাগাছের যে গুটান পাতাটি দণ্ডের মত সবেমাত্র বাহির হয় বা ঐরূপ হরিদ্রাদির দণ্ড বা কোমল বেত্রদণ্ড লইয়া গলার মধ্যে (হৃদয়ে) ধীরে ধীরে নিত্য চালনা করিবে এবং বাহির করিবে। অনন্তর কফ পিত্ত ও শ্লেষ্মাদি ঊর্দ্ধদিকে বাহির করিয়া ফেলিবে ; এই দণ্ডধৌতি বিধান দ্বারা হৃদয়রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া থাকে।

"বমনধৌতি". যথা :—

"ভোজনান্তে পিবেদ্বারি চাকণ্ঠপূরিতং সুধীঃ।
ঊর্দ্ধদৃষ্টিং ক্ষণং কৃত্বা তজ্জলং বময়েৎ পুনঃ।
নিত্যমভ্যাসযোগেন কফপিত্তং নিবারয়েৎ॥"

সাধক ভোজনের পর আকণ্ঠ পর্য্যন্ত জল পান করিবে, অনন্তর কিয়ৎক্ষণ ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সেই জল পুনরায় বাহির করিয়া ফেলিবে। নিত্য এই অভ্যাসযোগের দ্বারা কফ-পিত্ত নিবারিত হয়।

"বসন ধৌতি", যথা :—

"চতুরঙ্গুলবিস্তারং সূক্ষ্মবস্ত্রং শনৈর্গ্রসেৎ।
পুনঃ প্রত্যাহরেদেতৎ প্রোচ্যতে ধৌতিকর্ম্মকং॥"

চারি অঙ্গুলি বিস্তার বিশিষ্ট সূক্ষ্মবস্ত্র ধীরে ধীরে গ্রাস করিতে থাকিবে ও পুনরায় তাহা বাহির করিতে থাকিবে, ইহাকেই বসন-ধৌতি ক্রিয়া বলে। ইহার নিত্য অভ্যাস দ্বারা গুল্ম, জ্বর, প্লীহা, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্ত প্রভৃতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দিন দিন দেহ আরোগ্য, বল ও পুষ্টি সাধন হইতে থাকে।

"গ্রহযামলে স্বয়ং শ্রীভগবান শিব বলিয়াছেন :—

"চতুরঙ্গুলবিস্তারং হস্ত পঞ্চদশেনতু।
গুরূপদিষ্টমার্গেণ সিক্তং বস্ত্রং শনৈর্গ্রসেৎ।
ততঃ প্রত্যাহরেচ্চৈতৎ ক্ষালনং ধৌতিকর্ম্ম তৎ॥
শ্বাসঃ কাসঃ প্লীহা কুষ্ঠঃ কফরোগাশ্চ বিংশতিঃ।
ধৌতিকর্ম্মপ্রসাদেন শুদ্ধ্যন্তে চ ন সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীগুরুর উপদেশ লইয়া চতুরঙ্গুল বিস্তৃত ও পঞ্চদশ হস্ত দীর্ঘ সিক্তবস্ত্র ধীরে ধীরে গ্রাস করিবে, পরে পুনর্ব্বার তাহা ধীরে ধীরে বাহির করিবে, এই প্রকার ক্ষালনের নাম ধৌতি কর্ম্ম। ইহাদ্বারা শ্বাস কাস প্লীহা কুষ্ঠ ও বিংশতিপ্রকার শ্লেষ্মা রোগ

নিঃসন্দেহ বিদূরিত হয়। এইরূপ "রুদ্রযামলে"ও অধিকতর সুস্পষ্টরূপে লিখিত আছে :—

সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং বস্ত্রং দ্বাত্রিংশদ্ধস্তমানতঃ।
একহস্তক্রমেণৈব যঃ করোতি শনৈঃ শনৈঃ।
যাবদ্দ্বাত্রিংশদ্ধস্তঞ্চ তাবৎ কালং ক্রিয়াঞ্চরেৎ।
এতৎ ক্রিয়াপ্রয়োগেন যোগী ভবতি তৎক্ষণাৎ॥"

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, পূর্ব্বোপদেশের মতানুসারে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত ও পনের অঙ্গুলি দীর্ঘ বস্ত্র গ্রাস করিবার বিধান ছিল; কিন্তু রুদ্রযামলের উপদেশক্রমে স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে যে, ঐ ক্রিয়া একেবারেই অভ্যাস হইতে পারে না। সুতরাং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বস্ত্রখণ্ড অতি ধীরে ধীরে অর্থাৎ প্রথমে এক হস্ত মাত্র, পরে তাহা অপেক্ষা দীর্ঘ এইরূপে ক্রমে দ্বাত্রিংশ হস্ত দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ড গ্রাস করিতে হইবে। ইহাই বাস-ধৌতি। ইহার অভ্যাসে আমাজীর্ণ বিনাশ পায়, দৈহিক কান্তি পুষ্টি বর্দ্ধিত ও উদরানল পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। গুরুর নির্দ্দেশ ব্যতীত এ সকল ক্রিয়া স্ব-ইচ্ছায় করা কখন যুক্তিসঙ্গত নহে।

(ঘ) মূল শোধন ; এ সম্বন্ধে আচার্য্যগণ বলিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত মূল শোধন অর্থাৎ গুহ্যপ্রদেশ উত্তমরূপে প্রক্ষালিত না হয় তাবৎ অপান বায়ু ক্রূর হইয়া থাকে, অর্থাৎ গুহ্যস্থ বায়ু কুটিলভাবে অবস্থিত থাকে, সুতরাং অতি যত্নসহকারে মূল শোধন করা সর্ব্বথা বিধেয়। তাহাতে কোষ্ঠকাঠিন্য আম ও অজীর্ণাদি রোগসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে, কান্তি পুষ্টি আদি বর্দ্ধিত হয় এবং জঠরাগ্নি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ইহার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"পীতমূলস্য দণ্ডেন মধ্যমাঙ্গুলিনাপি বা।
যত্নেন ক্ষালয়েদ্ গুহ্যং বারিণা চ পুনঃ পুনঃ॥

হরিদ্রামূল অথবা বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গুলিযোগে জলদ্বারা যত্ন-সহকারে পুনঃ পুনঃ গুহ্যদ্বার ধৌত করিবে।

২য়। বস্তি :—এই বস্তিক্রিয়া সম্বন্ধে শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় জলবস্তি ও শুষ্কবস্তি ভেদে ইহা দুই প্রকার ; জলবস্তি জলে এবং শুষ্কবস্তি ভূমিতলে বসিয়াই সর্ব্বদা সম্পাদন করিতে হয়।

"জলবস্তি", বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশ আছে :—

"নাভিমগ্ন জলে পায়ুং ন্যস্তবানুৎকটাসনং।
আকুঞ্চনং প্রসারঞ্চ জলবস্তিং সমাচরেৎ॥"

নাভিমগ্ন জলে উৎকটাসনে উপবিষ্ট হইয়া গুহ্যদ্বার আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিবে। "উৎকটাসন" অর্থাৎ পদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে মৃত্তিকা স্পর্শপূর্ব্বক গুল্‌ফযুগলকে নিরলম্বভাবে শূন্যে উত্তোলিত করিয়া গুল্‌ফের উপর গুহ্যদেশ রাখিতে হইবে, ইহারই নাম উৎকটাসন।

"শুষ্কবস্তি" সম্বন্ধে প্রক্রিয়া যথা : —

"বস্তিং পশ্চিমোত্তালেন চালয়িত্বা শনৈরধঃ।
অশ্বিনীমুদ্রয়া পায়ুমাকুঞ্চয়েৎ প্রসারয়েৎ॥"

পূর্ব্বোক্ত জলবস্তির ন্যায় ভূমিতলেই পশ্চাৎদিক উচ্চ করিয়া তলপেট ধীরে ধীরে নিম্নাভিমুখে চালনা করিবে এবং অশ্বিনীমুদ্রায় গুহ্য আকুঞ্চন ও প্রসারণ সময়ে জল দিয়া ধৌত করিবে। এই ক্রিয়াদ্বারা কোষ্ঠদোষ বিদূরিত হইয়া জঠরাগ্নি বর্দ্ধিত হয় ও আমবাতাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

৩য়। নেতি :—এই বিষয়ে শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

বিতস্তিমানং সূক্ষ্মসূত্রং নাসানলে প্রবেশয়েৎ।
মুখান্নির্গময়েৎ পশ্চাৎ প্রোচ্যতে নেতি কর্ম্ম তৎ॥"

অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ একখণ্ড সূক্ষ্মসূত্র নাসাপথে প্রবেশ করাইয়া দিবে, পরে উহা মুখ দিয়া বহির করিয়া ফেলিবে, ইহাকেই নেতি-কর্ম্ম বলা যায়। ইহাদ্বারা খেচরী সিদ্ধি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কফদোষ শান্তি হয় ও সাধকের দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে।

গ্রহযামলে শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"সূত্রং বিতস্তিমাত্রন্তু নাসানালে প্রবেশয়েৎ।
মুখেন গময়েচ্চৈষা নেতিঃ স্যাৎ পরমেশ্বরি ॥
কপালবেধিনী কণ্ঠ্যা দিব্যদৃষ্টিপ্রদায়িনী।
য উর্দ্ধং জায়তে রোগো নয়ত্যাশু চ নেতিঃ তৎ ॥"

অর্থাৎ বিতস্তি পরিমিত সূত্র নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া তাহা মুখ দিয়া বাহির করিবে। হে পরমেশ্বরি, ইহাকেই নেতিকর্ম্ম বলে। ইহাদ্বারা শিরঃপীড়াদি শান্তি হয় ও দিব্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ রুদ্রযামলেও কথিত আছে যে, নেতিযোগ অভ্যাসের দ্বারা মস্তকস্থ দুষ্ট কফ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ও শ্বাস প্রশ্বাসকালে পরম সুখ-বোধ হইয়া থাকে।

৪র্থ। লৌলিকী :—এই বিষয়ে শাস্ত্রোপদেশ এই,—

"অমন্দবেগে তুন্দঞ্চ ভ্রাময়েদুভপার্শ্বয়োঃ।
সর্ব্বরোগান্নিহন্তীহ দেহানলবিবর্দ্ধনং ॥"

বেগসহকারে উদরকে উভয়পার্শ্বে ভ্রামিত বা আন্দোলিত করিবে। ইহারই নাম লৌলিকী যোগ। ইহার অভ্যাস দ্বারা সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হইয়া দেহানল বর্দ্ধিত হয়।

তন্ত্রান্তরে শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"ভূমাদাবতিবেগেন তুন্দং সব্যাপসব্যতঃ।
নভাংশৌ ভ্রাময়েদেষা লৌলীস্যাৎ পরমেশ্বরি।
মন্দাগ্নি সন্দীপন পাচকাদি সন্দীপকানন্দকরী সদৈব।
অশেষ দোষামবশোষণীচ হঠক্রিয়ামৌলিরিয়ঞ্চ লৌলী ॥"

অর্থাৎ অতি বেগে বাম ও দক্ষিণাংশে জঠরের নিম্নপ্রদেশকে পরিচালিত করিলেই লৌলিকী-যোগ বলা যায়। ইহাদ্বারা মন্দাগ্নি নষ্ট হইয়া পরিপাকাগ্নি বৃদ্ধি পায় এবং কায়স্থিত দোষরাশি বিদূরিত হইয়া প্রসন্নতা উৎপাদন করে।

৫ম। ত্রাটক :—এতদ্‌সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রের উপদেশ যে,—

"নিমেষোন্মেষকং ত্যক্ত্বা সূক্ষ্মলক্ষ্যং নিরীক্ষয়েৎ।
যাবদশ্রূণি পতন্তি ত্রাটকং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
এবমভ্যাসযোগেন শাম্ভরী জায়তে ধ্রুবং।
নেত্ররোগা বিনশ্যন্তি দিব্যদৃষ্টিঃ প্রজায়তে॥"

চক্ষুর পাতা না ফেলিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত অশ্রু-পতন না হয়, ততক্ষণ কোন সূক্ষ্ম লক্ষ্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে। ইহাকেই সাধুগণ ত্রাটক শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার অভ্যাসযোগে শাম্ভরী মুদ্রা নিশ্চয় সিদ্ধ হয় এবং সমস্ত নেত্ররোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া সাধকের দিব্যদৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রান্তরে নির্দ্দেশ আছে :—এই ত্রাটক অভ্যাসফলে যতক্ষণ অশ্রুপতন না হয় কোন নির্দ্দিষ্ট সূক্ষ্মবস্তুর প্রতি স্থির নয়নে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিতে পারিলেই তাহাকে ত্রাটক যোগ কহে। ইহাও পরম গুহ্য বিষয়। অধুনা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেও এই ত্রাটকের আলোচনা হইতেছে। সন্মোহন আদি কার্য্যে ইহার বহুল অভ্যাসের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

৬ষ্ঠ। কপালভাতি :—এই সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ আছে যে, ইহার প্রক্রিয়া ত্রিবিধ ; যথা—(ক) বাতক্রম কপালভাতি, (খ) বুৎক্রম কপালভাতি, (গ) শীৎক্রম কপালভাতি। ইহার অভ্যাসদ্বারা কফদোষ নিবারিত হয়।

(ক) "বাতক্রম" কপালভাতি :—

"ইড়য়া পুরয়েদ্বায়ুং রেচয়েৎ পিঙ্গলা পুনঃ।
পিঙ্গলয়া পূরয়িত্বা পুনশ্চন্দ্রেন রেচয়েৎ॥
পূরকং রেচকং কৃত্বা বেগেন নতু চালয়েৎ।
এবমভ্যাসযোগেন কফদোষং নিবারয়েৎ॥"

ইড়ানাড়ীতে বা বামনাসায় বায়ু পূর্ণ করিয়া পিঙ্গলা বা দক্ষিণ-নাসায় তাহা রেচন বা ত্যাগ করিবে। পূরক ও রেচক উভয়

ক্রিয়ার সময়েই কখন বেগে বায়ু চালনা করিবে না। ইহার অভ্যাসে কফদোষ নিবারিত হয়।

(খ) "ব্যুৎক্রম" কপালভাতি ঃ—

"নাসাভ্যাং জলমাকৃষ্য পুনর্ব্বক্ত্রেণ রেচয়েৎ।
পায়ং পায়ং ব্যুৎক্রমেণ শ্লেষ্মদোষং নিবারয়েৎ॥"

নাসিকাদ্বয় দ্বারা বারি আকর্ষণ করিয়া পুনরায় মুখ দিয়া তাহা রেচন করিবে। এইভাবে প্রতিলোম জলক্রিয়ার অভ্যাস করিলে শ্লেষ্মদোষ নিবারিত হয়।

(গ) "শীৎক্রম" কপালভাতি ঃ—

"শীৎকৃত্য পীত্বা বক্ত্রেণ নাসানালৈর্বিরেচয়েৎ।
এবমভ্যাসযোগেন কামদেবসমো ভবেৎ॥
ন জায়তে বার্দ্ধক্যঞ্চ জরা নৈব প্রজায়তে।
ভবেৎ স্বচ্ছন্দদেহশ্চ কফদোষং নিবারয়েৎ॥"

মুখে শীৎকার শব্দসহ বায়ু পান করিয়া নাসানাল দ্বারা তাহা রেচন করিবে, এইরূপ অভ্যাসযোগের দ্বারা বার্দ্ধক্য বা জরা উপস্থিত হয় না; তৎপরিবর্ত্তে দেহের কফাদি দোষ নিবারিত হইয়া কামদেবসম সচ্ছন্দদেহী হইতে পারা যায়।

সংক্ষেপে ষট্‌কর্ম্মের একটী ক্রম ও প্রকার ভেদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ম। ধৌতি।

(ক) অন্তর্ধৌতি—বাতসার, বারিসার, বহ্নিসার, বহিষ্কৃতি।
(খ) দন্তধৌতি—দন্তমূল, জিহ্বামূল, কর্ণমূল, কপালরন্ধ্র।
(গ) হৃদ্‌ধৌতি—দণ্ডদ্বারা, বমনদ্বারা, বস্ত্রদ্বারা।
(ঘ) মূলশুদ্ধি—গুহ্যদেশের অভ্যন্তর প্রক্ষালন।

২য়। বস্তি।

(ক) জলবস্তি ও (খ) শুষ্কবস্তি।

৩য়। নেতি।

মুখ ও নাসিকামধ্যে সূত্র-চালনা।

৪র্থ। লৌলিকী।

উদরচালনাদ্বারা নাড়ী পরিষ্কার করণ।

৫ম। ত্রাটক।

চক্ষের পলক না ফেলিয়া দৃষ্টি স্থির করণ।

৬ষ্ঠ। কপালভাতি।

(ক) বাতক্রম, (খ) ব্যুৎক্রম, (গ) শীৎক্রম।

সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট হঠ-যোগের প্রথম অঙ্গ "ষট্‌কর্ম্ম" বিষয়ক সিদ্ধান্ত শ্রীগুরুমণ্ডলীনির্দ্দিষ্ট উপদেশগুলি যথাক্রমে বর্ণিত হইল।

হঠযোগের তাৎপর্য্য।

এক্ষণে সাধনাভিলাষী পাঠক এই সকল ক্রিয়াপদ্ধতি দেখিয়া হঠযোগের প্রকৃত তাৎপর্য্য সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্থূল-শরীরের উপর আধিপত্য স্থাপনপূর্ব্বক ক্রমে সূক্ষ্ম-শরীরকে জয় বা যোগযুক্ত করাকে অর্থাৎ স্থূলশরীর বশীভূত হইলে, তখন সূক্ষ্ম-শরীরের সহায়তায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার কৌশলসমূহকেই হঠযোগ বলে। সেই কারণেই ইহার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য স্থূল-শরীরের শোধনরূপ ষট্‌কর্ম্ম নির্ণীত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী ক্রিয়া আসন, প্রাণায়াম ও মুদ্রাদি সম্বন্ধে "গুরুপ্রদীপের" যোগাধ্যায়ে বিস্তৃতভাবেই সমস্ত বলা হইয়াছে; সুতরাং সে সকলের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সাধনাভিলাষী পাঠক তাহা গুরুপ্রদীপেই দেখিতে পাইবেন। সে স্থানে এই ষট্‌কর্ম্মের

উপদেশ ইচ্ছা করিয়াই বলা হয় নাই, কারণ অনেকেই গুরুর আজ্ঞা ব্যতীত কেবল পুস্তক দেখিয়াই যোগাদির বিবিধ অনুষ্ঠান করিতে অগ্রসর হন ; তাহার ফলে অনেক সময় উপকারের পরিবর্ত্তে অনিষ্টই হইয়া থাকে। এই হেতু শ্রীভগবান আদিনাথ শঙ্কর পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন যে, গুরূপদেশ ব্যতীত হঠযোগের কোন কর্ম্মই সাধক স্ব-ইচ্ছায় নির্ব্বাচন করিয়া অভ্যাস করিবে না। বিশেষ স্থূল-শরীরের শোধনের জন্যই হঠযোগের প্রয়োজন। শ্রীগুরুদেবের বিবেচনায় যদি শিষ্যের তাহা প্রয়োজন নাই বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহার আচরণ বা অভ্যাসের আদৌ প্রয়োজন হইবে না, অথবা মন্ত্রাদি-যোগের সহায়করূপে যে সকল ক্রিয়ার উপদেশ দিবেন, তাহাই মাত্র সাধন করা কর্ত্তব্য। বহু কঠোর হঠযোগী জ্ঞান-সাধনার উচ্চ ক্রিয়োপদেশের অভাবে কেবল ইহার স্থূল-ক্রিয়াবলী লইয়াই মত্ত হইয়া থাকেন। ইহা যে মুক্তির পক্ষে ভীষণ যোগবিঘ্নরূপে তাহার অঙ্গীভূত হইয়া যায়, তাহা তাঁহারা চিন্তা করিবারও তিল মাত্র অবসর পান না।

অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমী, দৃঢ়কায় ও তপোপ্রধান সাধক ব্যতীত ইহা প্রত্যেকের সাধনপক্ষে সম্পূর্ণ সম্ভবপর নহে। তবে বাল-ব্রহ্মচারীদিগের পক্ষে মন্ত্রযোগসহ ইহার কিছু কিছু আচরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। অভিজ্ঞ গুরুদেবের সন্নিধানে থাকিয়াই অভিলাষী সাধক তাহা সম্পন্ন করিবেন। কোমলাঙ্গ, পরিণত-বয়স্ক, সাত্ত্বিক-প্রকৃতি-বিশিষ্ট, বিচারশীল, সুধী ও জ্ঞানানুশীলনতৎপর সাধকের পক্ষে হঠ-যোগের সকল ক্রিয়ার বিশেষ প্রয়োজন নাই। তাই ঠাকুর কৌতুক করিয়া কখন কখনও বলিতেন—"ও তোমাদের কর্ম্ম নয় গো ও তোমাদের কর্ম্ম নয়! ঐ ডাল-রুটী-খোর খোট্টা রামানন্দের * সঙ্গেই হঠের সম্বন্ধ বেশী। হঠযোগ না বলে, ওকে

* ব্রহ্মচারী রামানন্দও শ্রীমদ্ ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম বা জন্মভূমি বিহারান্তর্গত গয়া জিলার মধ্যে।

ডাল-রোট্-যোগ বল্লেও চলে।" বাস্তবিক ব্রহ্মচারী রামানন্দ-ভায়ার হঠযোগের ক্রিয়া করিতে যত আনন্দ হইত, অন্য কিছুতে তেমন হইত না। ষট্‌কর্ম্ম, বিভিন্ন আসন ও মুদ্রাদির অভ্যাসরূপ উৎকট সাধনায় এবং প্রত্যক্ষ গুরুসেবায় তিনি সকলের অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

যাহা হউক, তন্ত্রোক্ত অষ্টাভিষেক-নির্দ্দিষ্ট যোগসাধনার মধ্যে দেহ-রক্ষার জন্য প্রয়োজনমত হঠযোগের ক্রিয়াবিধানের যে সকল উপদেশ আছে, তাহা অভিজ্ঞ গুরুদেব শিষ্যের অবস্থা বুঝিয়াই উপদেশ দিয়া থাকেন। তাহাতে মুক্তিকামী সাধক সাধনা-বিষয়ে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এই হঠযোগের ক্রিয়া, বলের দ্বারা সিদ্ধ হইলেও, যাঁহারা কেবল ইহার যোগাঙ্গ লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, তাঁহাদের উন্নত জ্ঞানাধিকারত হয়ই না, অধিকন্তু তাঁহাদের শরীর এত অপটু হইয়া যায় যে, অনেক সময় অতি সামান্য কারণেই তাঁহাদের দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে, ফলে তখনই তাহার প্রতিক্রিয়া বা প্রতিশোধক বিভিন্ন ক্রিয়াচরণ ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না। এইভাবে তাঁহাদের কর্ম্মের আর অবসান হয় না ও কর্ম্মান্তরে অগ্রসর হইবারও অবসর থাকে না। নীতিবাক্যে উক্ত আছে "সর্ব্বং অত্যন্ত গর্হিতম্।" কোন কার্য্যেই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। অনেক সময় দেখা যায়, কুস্তিগীর পালোয়ানদিগের মত কেবল দেহ লইয়াই কঠোর হঠ-যোগীদের ব্যস্ত থাকিতে হয়। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" শাস্ত্রবাক্য হইলেও শরীর রক্ষাই ত মুখ্য কার্য্য নয়? ধর্ম্মসাধনার জন্যই ধর্ম্মক্ষেত্ররূপ শরীরের প্রয়োজন। অতএব ধর্ম্মসাধনাই দেহের মুখ্য কার্য্য, সেইদিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া দেহের রক্ষা-মাত্র করিতে হইবে। সুতরাং মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া কেবল দেহ লইয়া পড়িয়া থাকিলে চলিবে কেন? তাই "গুরুপ্রদীপে" প্রয়োজন মত মুদ্রাদি অনুষ্ঠানের সঙ্গে মন্ত্র ও লয়যোগের ক্রিয়া-

বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। তন্ত্রোক্ত শ্রীগুরু-মণ্ডলী যথার্থই বিচক্ষণ চিকিৎসকের মত যখন যাহার পক্ষে যেরূপ প্রয়োজন, সেইরূপ ক্রিয়ারই উপদেশ দিয়া থাকেন। সেই 'পূর্ণাভিষেক-দীক্ষার' সময় হইতে মন্ত্রযোগের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের অবস্থা বুঝিয়া কখন হঠ এবং অধিকাংশ সময়ে লয়-যোগের ক্রিয়ার ধীরে ধীরে উপদেশ দিয়া থাকেন। ভূতশুদ্ধিই লয়-যোগের প্রধান ক্রিয়া, তাহাই মন্ত্রযোগের সহিত এমনভাবে সম্বন্ধ-জড়িত করিয়া দিয়াছেন যে, প্রথম হইতেই সাধক তাহার বেশ একটু আস্বাদ পাইয়া থাকেন। ক্রমে 'সাম্রাজ্য' পরে 'মহাসাম্রাজ্যাধিকারে' আসিয়া তাহার যথেষ্ট পুষ্টি সাধিত হয় এবং 'যোগদীক্ষার' অধিকারে যোগ-মন্ত্র-সাধনা হঠপ্রধান হইবার কারণ, হঠের ধ্যান-সাধনাও অতি সহজসাধ্য হইয়া পড়ে।

ধ্যান ও সমাধি।

"গুরুপ্রদীপে" বলা হইয়াছে ঃ—হঠ-যোগ জ্যোতির্ধ্যানের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে ধ্যেয়-বস্তু জ্যোতিঃ-স্বরূপ জীবাত্মা। শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—

"যদ্ধ্যানেন যোগসিদ্ধিরাত্মপ্রত্যক্ষমেবচ।
মূলাধারে কুণ্ডলিনী ভুজগাকাররূপিণী॥
জীবাত্মা তিষ্ঠতি তত্র প্রদীপকলিকাকৃতিঃ।
ধ্যানস্তেজোময়ং ব্রহ্ম তেজোধ্যানং পরাপরং॥
ভ্রুবোর্মধ্যে মনোর্দ্ধেচ যত্তেজঃ প্রণবাত্মকং।
ধ্যায়েজ্জ্বালাবলীযুক্তং তেজোধ্যানং তদেব হি॥

যে ধ্যানের দ্বারা যোগ-সিদ্ধি ও আত্ম প্রত্যক্ষতা-শক্তি জন্মে তাহাই উক্ত হইতেছে। মূলাধারের মধ্যস্থলে কুণ্ডলিনী বা জীবনীশক্তি সর্পাকারে বিরাজিতা রহিয়াছেন, তথায় জীবাত্মাও দীপকলিকার ন্যায় অবস্থিত। ব্রহ্মতেজোময় বা জ্যোতিঃরূপী জীবাত্মার এইভাবেই ধ্যান করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত ভ্রুযুগলের মধ্যে আজ্ঞাচক্রে বা যোগহৃদয়ে, অথবা মনশ্চক্রের উর্দ্ধে

ওঁকারাত্মক যে শিখামালা বা রশ্মিজাল-সমন্বিত জ্যোতিঃ বিদ্যমান আছেন, তাহাই জীবাত্মার প্রত্যক্ষস্বরূপ-জ্ঞানে ধ্যান করিতে হইবে। ইহারই নাম তেজোধ্যান বা জ্যোতির্ধ্যান। শ্রীভগবান শিবজী স্বয়ং বলিয়াছেন:—

"অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভে শ্রোত্রে তর্জ্জনীভ্যাং দ্বিলোচনে।
নাসারন্ধ্রে চ মধ্যাভ্যাম্ অন্যাভ্যাং বদনে দৃঢ়ম্॥
নিরুধ্য মারুতং যোগী যদেবং কুরুতে ভৃশম্।
তদা লক্ষণমাত্মানং জ্যোতিরূপং প্রসশ্যতি॥
তত্তেজো দৃশ্যতে যেন ক্ষণমাত্রং নিরাবিলম্।
সর্ব্বপাপৈর্ব্বিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিম্॥"

উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা নিজ কর্ণদ্বয়, তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা লোচনদ্বয়, মধ্যাঙ্গুলির দ্বারা উভয় নাসিকারন্ধ্র এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা উভয়দিক হইতে বদনমণ্ডল বা অধরোষ্ঠ রুদ্ধ করিয়া যদি যোগী পুনঃ পুনঃ বায়ুসাধনসহ পূর্ব্বোক্ত জ্যোতির্ম্ময় জীবাত্মার ধ্যান করেন, তবে নির্ম্মল আত্মজ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তাঁহার সর্ব্বপাপ বিদূরিত হইয়া পরম গতি লাভ হয়। এই ধ্যান অভ্যাস করিলে যোগী নিষ্পাপ-দেহ হইয়া তাঁহার স্থূল-শরীর বিস্মরণপূর্ব্বক তন্ময় বা সমাধি লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার আর দেহাভিমান থাকে না। শ্রীভগবান পুনরায় বলিয়াছেন:—

"শিরঃ কপালে রুদ্রাক্ষো বিবিধং চিন্তয়েদ্ যদি।
তদা জ্যোতিঃ প্রকাশঃ স্যাদ্বিদ্যুত্তেজঃ সমপ্রভঃ॥"

সাধক যোগী শিবনেত্র হইয়া অর্থাৎ নয়নের তারা ঊর্দ্ধদিকে করিয়া বা যোগহৃদয়রূপ আজ্ঞাচক্রে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া বিবিধ অর্থাৎ নির্ব্বিকাররূপ ভাবনা করেন বা পূর্ব্বোক্তরূপে জ্যোতির্ধ্যান করেন, তবে বিদ্যুত্তেজঃসম প্রভা বা জ্যোতিঃ আপনা আপনি প্রত্যক্ষ হইবে। ইহাই হঠযোগ-নির্দ্দিষ্ট আত্মজ্যোতিঃ-দর্শন।

সাধকের 'মহাসাম্রাজ্যাধিকার' হইতে ভূতশুদ্ধি ও আংশিক লয়-যোগের ক্রিয়ার ফলে আজ্ঞাচক্র হইতে (গুরুপ্রদীপে আজ্ঞাপদ্ম ও আত্মদর্শনাদি দেখ) প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃদর্শন হইতে থাকে। দৃঢ় প্রাণায়াম বা কুম্ভক-সহযোগে সেই জ্যোতির্ধ্যানের অবিরত সাধনায় জ্যোতিঃস্বরূপ জীবাত্মা পরে আত্মায় বিলীন হইয়া যায়। অর্থাৎ সেই ধ্যেয় ধ্যান ও ধ্যাতার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া বা সাধকের ত্রিপুটীলয়ে সমস্ত একীভূত হইয়া যায়। তাহাকেই হঠ-যোগের সমাধি বলে। হঠযোগের এই সমাধির নাম "মহাবোধ।"

হঠ-যোগের পরিশিষ্ট।

বীর্য্য, বায়ু বা প্রাণ ও মন এই আবার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ সম্বন্ধে একই বস্তু। এই তিনের মধ্যে বীর্য্য হইতে বায়ু প্রধান এবং মন বায়ু হইতেও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু হঠযোগের সাধনায় বায়ুকেই শ্রেষ্ঠ ধরা হইয়াছে, কারণ বায়ুই দেহের সূক্ষ্মশক্তি স্বরূপ। অর্থাৎ বায়ু নিরুদ্ধ হইলেই মন আপনা আপনি নিরুদ্ধ হইয়া যায় বা মন লয়প্রাপ্ত হয়, মন লয় হইলেই সাধকের সমাধির উদয় হয়। অতএব প্রাণায়ামাদি ধ্যান-সিদ্ধির ফলেই সমাধি-সিদ্ধি হইয়া থাকে। তবে কোন্ সাধকের পক্ষে কোন্ সময় কি প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে মহাবোধ সমাধির উদয় হইবে, তাহা যোগতন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ শ্রীগুরুদেবই বিশেষ বিবেচনা করিয়া সাধক-শিষ্যের অবস্থানুসারে উপদেশ দিয়া থাকেন।

যোগশাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"প্রাণায়াম দ্বিষট্কেন প্রত্যাহার উদাহৃতঃ।
প্রত্যাহারৈর্দ্বাদশভির্দ্ধারণা পরিকীর্ত্তিতা॥
ভবেদীশ্বরসঙ্গত্যৈ ধ্যানং দ্বাদশধারণম্।
ধ্যানদ্বাদশকেনৈব সমাধিরভিধীয়তে॥
সমাধেঃ পরতো জ্যোতিরনন্তং স্বপ্রকাশকম্।
অস্মিন্ দৃষ্টে ক্রিয়াকাণ্ডং যাতায়াতং নিবর্ত্ততে॥"

অর্থাৎ দ্বাদশটী প্রাণায়ামে একটী প্রত্যাহার হইয়া থাকে। ঐরূপ দ্বাদশটী প্রত্যাহারে একটী ধারণা, দ্বাদশটী ধারণায় একটী ধ্যান, এই ধ্যানকালে ঈশ্বর সন্দর্শন হইয়া থাকে। ঐরূপ দ্বাদশটী ধ্যানে সাধকের সমাধি লাভ হয়। সমাধিকালে স্বপ্রকাশ অনন্ত-জ্যোতিঃ পরিদর্শন হয়, তাহা পরিদর্শন করিলে আর ইহসংসারে আসিতে হয় না, সমস্ত কর্ম্মভোগ নিবৃত্তি হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হয়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, সমাধি-সিদ্ধির মূল কারণ প্রাণায়াম, বিশেষ হঠযোগ-সাধনায় এই প্রাণায়াম-ক্রিয়াই সকল সিদ্ধির মূল। অর্থাৎ প্রাণবায়ু সংযত না হইলে, কিছুতেই মন নিশ্চিন্ত হইবে না, আর মনকে চিন্তারহিত না করিতে পারিলে, প্রত্যাহার হইতে সমাধি পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না। অতএব যে কোন প্রকারে হউক বায়ুসংযম করিতে হইবেই। আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট বায়ু-সংযমের যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় প্রাণায়াম, তাহা ইতিপূর্ব্বেই নানা-স্থলে, বিশেষ "গুরুপ্রদীপে" যোগদীক্ষাভিষেক-অংশে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। প্রয়োজন বোধ করিলে পাঠক পুনরায় তাহা পাঠ করিয়া বুঝিতে যত্ন করিবেন। বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে যে, প্রাণের সাধারণ বহির্মুখ-গতি বা নাসিকা হইতে বাহিরেরদিকে বায়ুর স্বাভাবিক প্রবাহ-গতি দ্বাদশ অঙ্গুলি, গায়নে ষোড়শ অঙ্গুল, আহারে বিংশতি অঙ্গুল, পথ-পর্য্যটনে চতুর্বিংশতি অঙ্গুল, নিদ্রায় ত্রিংশৎ অঙ্গুল, মৈথুনে ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুল, ব্যায়ামে আরও অধিক হইয়া থাকে। এ সকল কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। সুতরাং বায়ুর গতি যত অধিক হইবে, ততই যে দেহ মন অসংযত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ বায়ুই দেহ ও মনের মধ্যস্তর।

বায়ুর গতি-বৃদ্ধিসহ যৌগিক-ক্রিয়া ও সংস্কারজ-বুদ্ধিই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু গভীরভাবে কোন বিষয়ে চিন্তা করিলে বা ধীরভাবে এক মনে যে কোন কার্য্য করিতে বসিলে, প্রায় দেখা

যায়, বায়ুর স্বাভাবিক গতিও ক্রমে অল্প হইয়া আসে। তখন নাসিকায় বায়ুর গতি লক্ষ্য করিলে সহজেই তাহা বুঝিতে পারা যায়; লৌকিক বা অলৌকিক যে কোন বিষয়ে একাগ্র হইয়া চিন্তা করিতে বসিলেই বায়ুর গতি স্বাভাবিকভাবে সংযত হইয়া পড়ে। সেই কারণ ধ্যানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান-জন্য আচার্য্যপ্রোক্ত একমাত্র প্রাণসংযম অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। লৌকিক ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠান-সময়ে যেমন বায়ুর গতি পূর্ব্বকথিতরূপ স্বাভাবিক নিয়ম বা পরিমাণের অপেক্ষা বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ বায়ুর স্বাভাবিক গতি দ্বাদশ অঙ্গুলি অপেক্ষা উহা ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইলে সাধকের নিম্ন-লিখিতরূপ শক্তি নিশ্চয়ই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যথা, একাদশ অঙ্গুলি বায়ুর গতিতে জিতেন্দ্রিয়তা, দশ অঙ্গুলি গতিতে আনন্দ, নয় অঙ্গুলিতে কবিত্বশক্তি, আট অঙ্গুলিতে ভবিষ্যৎ বিষয়ের অনুভব, সাত অঙ্গুলি বায়ুর গতি হইলে সূক্ষ্মদৃষ্টি, ছয় অঙ্গুলিতে ভূমি ছাড়িয়া শূন্যে উঠিবার অবস্থা, পাঁচ অঙ্গুলিতে দূরদৃষ্টি, চার অঙ্গুলিতে অণিমাদি শক্তি লাভ, তিন অঙ্গুলিতে নবনিধির আয়ত্বানুভূতি, দুই অঙ্গুলিতে ব্রহ্মানুভূতি, এক অঙ্গুলিতে দেবত্ব লাভ এবং নাসিকাগ্র হইতে বহির্ম্মুখী গতি সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইলেই নির্ব্বাণপদ লাভ করা যায়। এই কারণেই প্রাণায়াম সাধনায় পূরক, কুম্ভক ও রেচক-ক্রিয়ার মধ্যে বায়ু রেচন বা পরিত্যাগ সময়ে অতি ধীরে ধীরে বায়ু বহিতেছে কি না, দেখিবার জন্য নাসিকার সম্মুখে কোন সূত্র বা পাখীর পালক ধরিয়া পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা যোগশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নিত্য প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের প্রশ্বাসবেগ ক্রমে আপনা আপনি কমিয়া যায়, তাহা হইলেই প্রাণায়াম-সিদ্ধি হইতে থাকে।

এক্ষণে প্রাণায়ামাদির একটী গুহ্য রহস্য বলি, অধিকারী না হইলে ইহার মর্ম্ম সকলের ঠিক উপলব্ধ হইবে না। পূর্ব্ব কথিত প্রাণায়াম হইতে সমাধি পর্য্যন্ত যে সকল ক্রিয়ানির্দ্দেশ আছে,

তাহার সার মর্ম্ম মনের পূর্ণ একাগ্রতা এবং সেই কারণেই কতিপয় প্রক্রিয়ামূলক নানাবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্তু এই ক্রিয়া-বিশেষে লিপ্ত থাকিয়া অনেক যোগীই প্রকৃত লক্ষ্য বিষয়টী ভুলিয়া যান বা উদ্দেশ্য ছাড়িয়া তাহার উপায় লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। অর্থাৎ মুক্তি বিষয়টী ভুলিয়া কেবল যোগক্রিয়া লইয়া মত্ত হইয়া থাকেন। ইহাকেই যোগশাস্ত্রে যোগীর "যোগবিঘ্ন" অবস্থা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আসল কথা—ধ্যান ও সমাধি-সাধনার জন্য যেমন করিয়া হউক, মন বা তাহার কার্য্যরূপ বায়ুকে সংযত করিয়া তাহাদের সাহায্যে আত্মকার্য্য উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে। অতএব সাধকের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বায়ু আয়ত্ব হইলেই আর তাহার ক্রিয়াবিশেষের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন হইবে না। তখন তাহাকে ছাড়িয়া পরবর্ত্তী ক্রিয়াতেই অগ্রসর হইতে হইবে। যেমন ইক্ষুদণ্ডের মধ্যে সুমিষ্ট রস আছে, তাহার বহিরঙ্গে কঠিন আবরণ থাকিবার কারণ বাহির হইতে রসের অনুভব হয় না, তবে সেই বহিরাবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার মধ্যবর্ত্তী অংশ ও তাহার নিষ্পেষণ ক্রিয়ারূপ বলপ্রয়োগ দ্বারা রস বাহির করিতে হয়, অনন্তর সেই রস অগ্নিসহযোগাদি ক্রিয়ার অবলম্বনে গুড়, শর্করা ও মিছরি আদি বস্তুতে ক্রমে পরিণত হয়, তখন সেই রসের সদা-আশ্রয়রূপ ইক্ষুর 'ছিবড়া' অংশ লোকে ফেলিয়াই দেয়। সেইরূপ এই 'ছিবড়ার' ন্যায় প্রাণায়ামাদির স্থূল-ক্রিয়া-বিষয়-গুলি অপেক্ষাকৃত উন্নতক্রিয়ার ফলে আপনা আপনি পরিত্যাগ হইয়া যায়, অথবা তখন সাধক ইচ্ছা করিয়াই তাহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কারণ প্রত্যাহারাদি উত্তরোত্তর উন্নত-ক্রিয়ার সময় বায়ুর গতি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে, সেগুলি সম্পন্ন হইবার পক্ষে আদৌ সুবিধা হয় না, বরং সে সময় কেবল বায়ুর গতি লক্ষ্য করাই সাধকের বিঘ্নকর বলিয়া বোধ হইবে। অতএব সাধক স্ব স্ব অবস্থানুসারে উন্নতমার্গে উঠিবার

কালে পূর্ব্বকৃত ক্রিয়ার প্রতি ক্রমে অমনোযোগী হইয়া ক্রমান্বয়ে উন্নত-কর্ম্মের প্রতিই মনোনিয়োগ করিলে শীঘ্র সুফল লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, দ্বাদশটী প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে, একটী প্রত্যাহার; এই ভাবে ক্রমান্বয়ে ধারণাদি ক্রিয়াগুলি সিদ্ধি হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দ্বাদশবার প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুর গতি যে পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই বা বারটী প্রাণায়াম করিতে যে সময় লাগে ততক্ষণের মধ্যে কোন বিঘ্ন না হইলে একটী প্রত্যাহার সিদ্ধ হইতে পারে, * এইরূপ নির্ব্বিঘ্নে বারটী প্রত্যাহার করিতে পারিলে অর্থাৎ উক্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে মন বিচলিত না হইলে সাধক অনায়াসে নির্দ্দিষ্টস্থলে মনকে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন, তাহা হইলেই তাঁহার একটী ধারণা ক্রিয়া সিদ্ধ হইতে পারিবে। এই ভাবে বারটী নির্ব্বিঘ্ন ধারণায় একটী ধ্যান এবং বারটী বিঘ্নশূন্য ধ্যানের ফলে একবার সমাধি সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইবার ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য যোগী সাধক সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, হঠযোগের সাধনায় প্রাণায়াম বা বায়ু-সাধনা প্রধান কর্ম্ম হইলেও প্রকৃত লক্ষ্য মনের একাগ্রতা সম্পাদন করা। অতএব একাদিক্রমে বারটী প্রাণায়ামের ফলে বায়ুর সহিত তাহার কারণরূপ মন বশীভূত হইলে আর বায়ুর দিকে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন হইবে না। কারণ জীবের মন সতত বহিরিন্দ্রিয়সমূহের সহায়তায় বাহিরের বিষয়সম্পর্কে নিয়োজিত থাকে, ভিতরের দিকে লক্ষ্য করিবার অবসরই পায় না, তাই হঠ-ক্রিয়া বা দেহেন্দ্রিয়াদির উপর বলপ্রয়োগ-দ্বারা প্রথমে বীর্য্যাধার স্থূল-দেহকে শোধন বা ইন্দ্রিয়াদিসহ সংযত-করণান্তর তাহার সূক্ষ্ম-অঙ্গ বায়ুর সংযমই অভ্যাস করিতে হয়, তাহার ফলে বা বায়ুর গতায়াত-বৃত্তি-হীনতার

* "প্রাণায়ামৈর্দ্ব্বাদশভির্যাবৎ কালো হৃতো ভবেৎ।
যস্তাবৎ কালপর্য্যন্তং মনো ব্রহ্মণি ধারয়েৎ॥

সঙ্গে সঙ্গেই মনও স্থির † হইয়া যায়, তখনই মন অন্তরের দিকে লক্ষ্য করিতে পারে অর্থাৎ মনের বহির্গতি তখন অন্তর্মুখী হয়, তাহাই প্রত্যাহার সিদ্ধি। মনের এই অবস্থা হইলে, তখন তাহাকে অন্তরের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়োগ করিয়া মনকে স্থির রাখিতে পারিলেই ধারণা সিদ্ধ হইল। এইবার মনকে সাধক ধ্যেয় বস্তুর চিন্তায় নিয়োগ করিবে, যদি এই সময় মনের কোনরূপ চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, অর্থাৎ মন ধ্যেয় বস্তু চিন্তায় অমনোযোগী বা বিষয়ান্তরে সরিয়া না পড়ে, তবেই সাধকের ধ্যান-সিদ্ধি হইল। এবং এই ধ্যান-সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মন অর্থাৎ ধ্যাতা ধ্যেয়-বস্তুতে কখন কি ভাবে যে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইবে, তাহা সাধক কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। ইহাই মহাবোধরূপ সমাধি-অবস্থা। এ অবস্থায় যাহা অনুভব হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাহা হউক, ফল কথা এই যে, অন্তঃকরণের চঞ্চল অবস্থাই মন, সেই মন অনুলোম-ক্রিয়াবশে বায়ুর সাহায্যে প্রবাহিত বা পরিচালিত হইয়া সতত ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসহযোগে কেবল অস্থায়ী লৌকিক-বিষয় হইতে বিষয়ান্তরেই পরিভ্রমণ করিতেছে, সাধক তাহাকে অর্থাৎ মনরূপী আপনাকে কোনরূপে আয়ত্ত করিয়া অলৌকিক ও অবিনশ্বর বিষয়রূপ আত্মচিন্তায় নিয়োজিত করিতে পারিলেই সফল মনোরথ হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারিবেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ঠাকুরের শ্রীমুখকমলশ্রুত একটী গল্প মনে পড়িল, প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে পাঠককে তাহা শুনাইয়া রাখি। কোন সময় এক নিম্ন-কোটীর উপাসক বা সাধক দৃঢ়ব্রত হইয়া সাধনার ফলে কোন প্রেত বা পিশাচ-সিদ্ধ হইলে, সেই প্রেত, সাধকের সম্মুখীন হইয়া বলিল, "আমি তোমার সাধনায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে আমায় কি করিতে হইবে বল? তুমি যখন যাহা বলিবে,

---

তস্যৈব ব্রহ্মণো প্রোক্তং ধ্যানং দ্বাদশধারণাঃ।" ইত্যাদি

† "চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ॥"

আমি ভৃত্যের ন্যায় তখনই তাহা সম্পন্ন করিয়া তোমার পরিচর্য্যা করিব। তবে তুমি যতক্ষণ আমায় কার্য্য দিবে, সে কার্য্য যতই কঠিন হউক না কেন, আমি বিনা আপত্তিতে তাহা সম্পন্ন করিব, কিন্তু যখন তুমি আমায় আর কোন কার্য্য দিতে অসমর্থ হইবে, তখনই আমি তোমায় বিনাশ করিয়া চলিয়া যাইব।” সাধক বলিল, “বেশ, তুমি উপস্থিত আমার এই কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিয়া দাও।” এইরূপে সাধক সেই ভূতকে নিত্য নানাবিধ কার্য্য দিয়া আপনার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিয়া লইল। ক্রমে এমন অবস্থা হইল যে, তাহাকে আর সে যে কি কাজ দিবে, বহু চিন্তাতেও স্থির করিতে পারে না। সাধক ক্রমে এই দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িল। এই সময় তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কোন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, সাধক সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে নিবেদন করিল॥ তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, “তাহাতে আর চিন্তা কি? আমি তোমায় উপায় বলিয়া দিতেছি:—এই যে তোমার গৃহের পশ্চাতে বাঁশটী প্রোথিত রহিয়াছে দেখিতেছ, তোমার ভূতটা আসিলেই বলিবে যে, ঐ বাঁশটাকে পরিষ্কার করিয়া উহার ঐ কয়টী গাঁঠও ক্রমে ভাল করিয়া পরিচ্ছন্ন কর, তাহার পর বাঁশটাতে বেশ করিয়া ঘৃত মাখাও। যখন এই গুলি বেশ হইয়া যাইবে, তখন তোমার ভূতকে বলিবে, এইবার এক কাজ কর—উহার গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত একবার উঠ আর একবার নাম, নামিবার ও উঠিবার সময় প্রত্যেক গাঁঠে কিছুক্ষণ বসিয়া গাঁঠগুলি পরিষ্কার করিয়া আসিবে। উপস্থিত ইহাই তোমার কার্য্য। পরে আমার যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, তোমায় বলিব। ভূত সেই কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে, তুমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে, আর তোমার ভাবনা থাকিবে না।” সাধক, সেই সুবিজ্ঞ ব্যক্তির এই উপদেশে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। পরে ভূত আসিলে তাহাকে তদুপদিষ্ট কর্ম্মে লিপ্ত রাখিয়া মনের আনন্দে সে কালাতি-

পাত করিতে লাগিল। এই গল্পের তাৎপর্য্য পাঠকের অবগতি জন্য এই স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, সেই সুবিজ্ঞ-ব্যক্তি সাধকের শ্রীগুরুদেব, ভূতটী তাহার মন, বাঁশটী তাহার দেহাগারের পশ্চাৎ-সংলগ্ন সুষুম্না-সমন্বিত তাহার মেরুদণ্ড এবং তাহাতেই আশ্রয়-প্রাপ্ত তাহার কয়টি গাঁঠ বা ষট্‌চক্র স্বরূপ, ঘৃত কুণ্ডলিনীরূপ তাহার জীবনী-শক্তি।

উক্ত দণ্ডের আশ্রয়-প্রাপ্ত গাঁঠ কয়টী সাধারণতঃ ষট্‌চক্র অথবা লয়াত্মক নবচক্র ও সর্ব্বোপরি অন্তিম স্থান লইয়া দশচক্র। এই "দশচক্রেই ভগবান ভূত হন" বলিয়া যে লৌকিক প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা ভুল কথা নয়, তবে তাহা কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে বটে! তাহার প্রকৃত কথা "দশচক্রে ভূতও ভগবান হন" অর্থাৎ সাধক পরবর্ত্তী লয়-যোগের সাধনায় চিত্তপ্রধান সম্পূর্ণ মনোলয়ই যে একমাত্র কার্য্য যখন জানিতে পারিবেন, তখন বুঝিবেন, অন্তর্ভূত শুদ্ধি দ্বারা সিদ্ধ উক্ত ভূতস্বরূপ আত্মময় মনই দশম চক্র বা সহস্রারস্থিত পরমাত্ম-বিন্দুতে লুপ্ত হইয়া শ্রীভগবানে পরিণত হইবেন। অতএব সেই সময়ে যথার্থই দশচক্রে 'ভূত' ভগবান হইয়া যাইবেন।

প্রিয়তম সাধক! হঠযোগের সমাধিরূপ চরম লক্ষ্য স্থির রাখিয়া পূর্ব্বকথিতভাবে বায়ুর :নিবৃত্তিকর কর্ম্মদ্বারা মনকে ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত স্থূল-শরীর হইতে পৃথক করিয়া মন্ত্রযোগ-সিদ্ধি-লব্ধ সুপবিত্র ভক্তি-সহযোগে আত্মায় লয় করিতে পারিলেই, তোমার মহাবোধের উদয় হইবে। এইভাবে তাঁহার স্বরূপ-উপলব্ধি করিতে পারিবে, তাহা হইলেই পরমারাধ্য শ্রীগুরুর কৃপায় সপ্তাঙ্গ হঠযোগের চরম সিদ্ধি তোমার লাভ হইবে। তুমি কৃতকৃতার্থ হইবে। ওঁ তৎসৎ শ্রীমচ্ছদাশিব ওঁ॥

তৃতীয়োল্লাস।

পূর্ণদীক্ষাভিষেক।

পূর্ণদীক্ষাভিষেক ও লয়যোগাচার্য্য।

বেদ ও তন্ত্রাদির রহস্যজ্ঞ সর্ব্ববিধ যোগবিদ্ বিশ্ববরেণ্য সিদ্ধ গুরুমণ্ডলীর উপদেশ-কৌশলে সাধনাভিলাষী ও মুক্তিকামী শিষ্য প্রাথমিক শাক্তাভিষেক তথা পূর্ণাভিষেক দীক্ষা হইতেই যোগাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের অধিকার প্রাপ্ত হন, তাহা গুরুপ্রদীপের যোগ-দীক্ষাভিষেক অংশে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। যদিও সে সময় শিষ্যকে সর্ব্ববিধ মন্ত্রযোগেরই উপদেশ প্রদত্ত হয়, অর্থাৎ মন্ত্রযোগ-প্রধান ক্রিয়া-প্রণালীই তখন তাঁহাদের একমাত্র অনুষ্ঠেয় হয়, তথাপি পাত্রবিশেষে লয় ও হঠযোগের প্রাথমিক কিছু কিছু ক্রিয়া আংশিকভাবে উপদেশ দিবার বিধান যোগবিদ্ তান্ত্রিক-গুরু-মণ্ডলীর মধ্যে প্রচলিত আছে। যোগসংহিতার মতে মন্ত্রযোগের পর হঠ ও তদনন্তর লয়যোগের ক্রিয়া পৃথক পৃথকভাবে অভ্যাস করিবার বিধি আছে, কিন্তু ক্রিয়া-তন্ত্রাভিজ্ঞ আদি গুরুপংক্তি মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই লয়ের কিছু কিছু ক্রিয়া এমন সুকৌশলে সন্নিবেশ করিয়াছেন যে, তাহারই অভ্যাসফলে হঠযোগের ষট্-কর্ম্মাদিরূপ কঠিন অনুষ্ঠানগুলির অভ্যাস না করিয়াও পরবর্ত্তী যোগদীক্ষাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে তন্নির্দ্দিষ্ট জ্যোতির্ধ্যান যেন অবলীলাক্রমে সিদ্ধ হইয়া যায়। অর্থাৎ হঠযোগের অভ্যাসকালে কল্পিত জ্যোতির্ধ্যান করিতে না করিতে একেবারে জ্যোতিষ্মতীর দর্শন ও নাদানুভূতি হইতে থাকে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, প্রথম হইতে সাম্রাজ্যদীক্ষাভিষেক পর্য্যন্ত সমস্তই মন্ত্রপ্রধান, কিন্তু মহাসাম্রাজ্য দীক্ষায় লয়যোগেরই উপদেশ-পূর্ণ ক্রিয়ানুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ষোড়শাঙ্গ মন্ত্রযোগের

প্রায় কিছুই থাকে না, কেবল কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান-সহায়তায় ষট্‌চক্রপথে পঞ্চভূত-তত্ত্বে তত্ত্বলয়সহ সেই মূলপ্রকৃতি ও পরম পুরুষে অর্দ্ধনারীশ্বররূপে বিলয় চিন্তাই প্রধান থাকে এবং যোগ-দীক্ষায় আসন ও মুদ্রাদি-সমন্বিত আংশিক হঠযোগের ক্রিয়ার সহিত প্রথমে গুরূপদিষ্ট সেই প্রকৃতি-পুরুষের লয়ান্তে একমাত্র যোগেশ্বর পরমপুরুষের স্থূল-ধ্যান, পরে জ্যোতির্ধ্যান, অনন্তর পূর্ণদীক্ষায় সম্পূর্ণ লয়যোগের উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ঠাকুরের আদেশে তাহাই যথাসাধ্য বর্ণন করিতেছি।

মন্ত্র ও হঠযোগের ন্যায় লয়যোগেরও পূজ্যপাদ আচার্য্য-বৃন্দের চরণে সভক্তি প্রণিপাতপূর্ব্বক লয়যোগরহস্য আলোচনা করিতেছি।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভগবান আদিনাথ স্বয়ং শঙ্কর ও যোগ-মায়া, অঙ্গিরা, যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, পতঞ্জলি, ব্যাস, কশ্যপ, শাকটায়ন, সালঙ্কায়ন ও গোতমাদি, দেবতা ও মহর্ষিবৃন্দ এই লয়যোগের উপদেষ্টা ও আচার্য্য। এতদ্ব্যতীত পরম পূজ্যপাদ কুলগুরুদিগের প্রথম সপ্তপর্য্যায়-নির্দ্দিষ্ট গুরুমণ্ডলী বৃদ্ধ ব্রহ্মানন্দদেব এবং অষ্টাবক্র ও দত্তাত্রেয় প্রভৃতি সিদ্ধপুরুষগণ সাধক-কল্যাণের নিমিত্ত পূর্ণ-দীক্ষাধিকারে অনুষ্ঠেয় লয়যোগের অসংখ্য গুপ্তরহস্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সাধক নিত্য এই সকল দেবতা ও আচার্য্য-গণের শ্রীচরণ-কমল চিন্তা ও ইঁহাদের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য অর্চ্চনা করিয়া সাধনাকার্য্য আরম্ভ করিলে, অচিরে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন।

"গুরুপ্রদীপের" যোগাধ্যায়ে লয়যোগের প্রকৃতি ও ক্রিয়া-বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে। এক্ষণে পূর্ণদীক্ষানুষ্ঠানসহ তদ্বিষয়ে বিস্তৃতভাবেই বলিতেছি।

পূর্ণদীক্ষাভিষেক-অনুষ্ঠান।

সাধক! তোমার কত জন্ম-জন্মান্তরের অবিরত সাধনা ও তাহার পুণ্যফলে এইবার সেই পরমানন্দপ্রদ অপূর্ব্ব দীক্ষা গ্রহণ কর। হঠযোগে যে জ্যোতির্ম্ময় জীবাত্মার দর্শন করিয়াছ, এইবার তাহার কেন্দ্রস্থলে আত্মবিন্দু দর্শন কর ও মহাবিন্দুতে তাহাই লয় করিয়া কৃতকৃতার্থ হও। তোমার পরামুক্তির পথ প্রশস্ত কর।

পূর্ণদীক্ষাভিলাষী সাধক পূর্ব্ববর্ণিত যোগদীক্ষাধিকারের ক্রিয়া-সমূহ যথারীতি সম্পন্ন করিয়া সর্ব্বযোগবিদ্ ব্রহ্মজ্ঞ কৌল অবধূত বা সন্ন্যাসী গুরুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক বন্দনা করিবেন ঃ—

প্রথমে তাঁহাকে একবার প্রণাম করিয়া তাঁহার পরিক্রমারূপে তিনবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিবেন। অনন্তর তাঁহার চরণ পূজাপূর্ব্বক পুনরায় ভক্তি সহকারে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিবেন। তখন পরম কৃপাময় শ্রীগুরুদেব পূর্ণদীক্ষাভিলাষী জিতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবান্ ও আত্মজ্ঞান সম্পন্ন শিষ্যকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া পূর্ব্বাভিষেকের অনুরূপ সঙ্কল্পমন্ত্র * পাঠ করাইবেন। ইতিমধ্যে যথাবিধি ব্রহ্মঘট স্থাপনপূর্ব্বক শিষ্যদ্বারা ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করাইবেন। তদনন্তর ঘটস্থিত সিদ্ধ-সলিল দ্বারা ব্রহ্মভাবে ব্রহ্মমন্ত্রধ্যানে শিষ্যের মস্তকে অভিসিঞ্চন করিবেন এবং তাহার উপযুক্ততা বোধে কোন লয় ক্রিয়ার উপদেশ সহ দক্ষিণ কর্ণে পূর্ণদীক্ষাঙ্গ ব্রহ্মলয় মন্ত্র প্রদান করিবেন। দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্য শ্রীগুরুচরণে প্রণত হইয়া পূর্ব্বাচার অনুরূপ তাঁহার শ্রীচরণ পূজার উদ্দেশ্যে ফুল চন্দন লইয়া পুষ্পাঞ্জলি

* সঙ্কল্পমন্ত্র,—গুরুপ্রদীপে বর্ণিত পূর্ণাভিষেকান্তর্গত সংকল্প মন্ত্রেরই অনুরূপ। অভিজ্ঞগুরু তাহা হইতে যথা প্রয়োজন পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন।

প্রদান কালে, ব্রহ্মজ্ঞগুরু তাঁহার (শিষ্যের) হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে বাহ্যপূজা কার্য্যে নিরস্ত করিবেন ও লয়যোগ নির্দ্দিষ্ট বিন্দুধ্যানমূলক ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু উপদেশ প্রদান করিবেন।

লয়যোগরহস্য।

লয়যোগের প্রকৃতি ও নব অঙ্গভেদ।

পরমপুরুষ ও পরাপ্রকৃতির সংযোগোৎপন্ন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং তদন্তর্গত ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড বা মানবদেহপিণ্ড উভয়েই একবস্তু অর্থাৎ একই বিধানে গঠিত। ব্যষ্টি ও সমষ্টির একত্র সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্যষ্টির একাএক সম্বন্ধে পিণ্ড বলিয়া উক্ত হয়। কারণ ঋষি, দেবতা ও পিতৃগণ, প্রকৃতি পুরুষ, গ্রহনক্ষত্র ও রাশি আদি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যেমন সদা পরিব্যাপ্ত পরিলক্ষিত হয়, এই ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড বা পিণ্ডেও সেই ভাবেই সমস্ত বিদ্যমান আছে। শ্রীগুরূপদিষ্ট সাধনার কালে সর্ব্বশক্তি সমন্বিত পিণ্ডজ্ঞান হইলেই ব্রহ্মাণ্ডজ্ঞান আপনা আপনি হইয়া যায়। এই পিণ্ডজ্ঞান হইলেই লয়যোগের অপূর্ব্ব ক্রিয়া দ্বারা পিণ্ডস্থিত মূলাধারান্তর্গত কুণ্ডলিনী প্রকৃতি বা আত্মশক্তি ও সহস্রার কমলান্তর্গত পুরুষ বিন্দুর লয় সম্পাদন হইলেই লয়যোগ সিদ্ধ হয়। কুণ্ডলিনী প্রকৃতি সতত সুষুপ্তা থাকিবার কারণেই বহির্ম্মুখীশক্তি বা অবিদ্যার সৃষ্টি হইয়া থাকে। মুক্তিকামী যোগী সাধক শ্রীগুরূপদিষ্ট যে সমুদায় বিচিত্র যোগানুষ্ঠানের কালে সেই প্রসুপ্তা প্রকৃতিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া নবচক্রে পরিচালন পূর্ব্বক সহস্রারের মধ্যে পরমপুরুষের লয় করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারেন; তাহারই নাম লয়যোগ। মহাসাম্রাজ্য দীক্ষাভিষেকের অনুষ্ঠানে সাধক যে অর্দ্ধনারীশ্বরের স্থূল ধ্যান অভ্যাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে সূক্ষ্মতর ধ্যান সহযোগে সেই প্রকৃতি পুরুষেরই লয় সাধন করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথম চিত্তের লয়ানুষ্ঠানই অবলম্বনীয়।

বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে যত প্রকার পদার্থের সম্ভব হইতে পারে, তাহাদের প্রত্যেককেই লয়যোগ-সাধনার সহায়ক করিতে পারা যায়, অর্থাৎ চিত্তকে যে কোনও পদার্থের সহিত একতান করিতে পারিলেই লয়যোগের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সুতরাং লয়যোগানুষ্ঠান অসংখ্য প্রকার। শ্রীভগবান তাই বলিয়াছেন ঃ—

"লয়যোগশ্চিত্তযোগাৎ সঙ্কেতৈশ্চ প্রজায়তে।
আদিনাথেন সঙ্কেতানন্তকোটিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥"

"যোগতারাবলি"তেও দেখিতে পাওয়া যায় ঃ—

"সদাশিবোক্তানি সপাদলক্ষ লয়াবধানানি বসন্তি লোকে।"

সদাশিবপ্রোক্ত সওয়া-লক্ষ প্রকার লয়যোগ জগতে বিদ্যমান আছে। যোগ-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীমদ্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রভৃতি মহাত্মগণ নবচক্র-কমলের মধ্য দিয়াই আত্মশক্তিরূপ চিত্তলয় করিয়া লয়যোগ সাধন করিয়াছিলেন।

"কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদ্যৈস্তু সাধিতো লয়সংজ্ঞিতা।
নবস্বেব হি চক্রেষু লয়ং কৃত্বা মহাত্মভিঃ ॥"

মন্ত্রযোগ ও হঠযোগের ন্যায় লয়যোগ সাধনার পক্ষে ইহার নিম্নলিখিত নয় প্রকার অঙ্গের বিভাগ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

"অঙ্গানি লয়যোগস্য নবৈবেতি পুরাবিদঃ।
যমশ্চ নিয়মশ্চৈব স্থূলসূক্ষ্মক্রিয়ে তথা ॥
প্রত্যাহারো ধারণা চ ধ্যানঞ্চাপি লয়ক্রিয়া।
সমাধিশ্চ নবাঙ্গানি লয়যোগস্য নিশ্চিতম্ ॥"

অর্থাৎ যম, নিয়ম, স্থূলক্রিয়া, সূক্ষ্মক্রিয়া, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, লয়ক্রিয়া ও সমাধি, এই নয় প্রকার অঙ্গই যোগতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সাধকের অনুষ্ঠেয় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। ইহার মধ্যে যম ও নিয়ম অঙ্গদ্বয় সাধক প্রথমাবস্থাতেই অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এতদ্‌বিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ এস্থলে

নিষ্প্রয়োজন। স্থূল-শরীরের দ্বারা সাধ্য ক্রিয়া-বিশেষ লয়-যোগের তৃতীয় অঙ্গ 'স্থূল-ক্রিয়া' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগরহস্যে উক্ত আসন ও কোন কোন মুদ্রাদি এই স্থূল-ক্রিয়ার অন্তর্গত। প্রাণায়ামাদি বায়ু-সংযম-ক্রিয়াই লয়যোগের সূক্ষ্ম-ক্রিয়া নামক চতুর্থ অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অনন্তর পঞ্চম ও ষষ্ঠ অঙ্গ, প্রত্যাহার ও ধারণা ক্রিয়া, তাহা ইতিপূর্ব্বে অনেক-স্থলেই বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং তাহারও পুনরুল্লেখে প্রয়োজন নাই। সাধক তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগ-ক্রিয়ায় আয়ত্ব করিয়াছেন। এক্ষণে লয়যোগ নির্দ্দিষ্ট ধ্যান, লয়ক্রিয়া ও সমাধি-সম্বন্ধে যাহা বলিবার আছে, তাহাই ক্রমে বর্ণন করিতেছি।

লয়যোগের ধ্যান।

লয়যোগের সপ্তমাঙ্গ ধ্যান, ইহাতে পূর্ব্ব-কথিত বিন্দু-ধ্যান-প্রণালীই নির্দ্দিষ্ট আছে। শাস্ত্রে বিন্দুধ্যান-সম্বন্ধে উপদেশ আছে ঃ—

"স্থূলং মূর্ত্তিময়ং প্রোক্তং জ্যোতিস্তেজোময়ো ভবেৎ।
সূক্ষ্মবিন্দুময়ং ব্রহ্ম কুণ্ডলী পরদেবতা ॥"

স্থূল, মূর্ত্তিময় ব্রহ্ম ; জ্যোতিঃ বা সূক্ষ্ম, তেজোময় ; ব্রহ্ম-বিন্দু বা সূক্ষ্মতর বিন্দুময় ব্রহ্ম এই ত্রিবিধ ধ্যানেই আত্মময় কুণ্ডলিনী-শক্তি বিদ্যমান থাকেন। মন্ত্রযোগে যেরূপ অধ্যাত্মভাবের দ্বারা কল্পিত স্থূলমূর্ত্তি ধ্যান করিবার বিধি আছে, হঠযোগে যেরূপ কল্পিত জ্যোতির্ম্ময় ধ্যানের ব্যবস্থা আছে, লয়যোগে সেইরূপ কোন ধ্যেয়-বস্তুর কল্পনার বিধি নাই, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যোগসিদ্ধির ফলে লয়যোগ সাধনদ্বারা যখন সাধকের কুণ্ডলিনীরূপা প্রকৃতি বা আত্ম-জীবনীশক্তির উদ্বোধন হয়, তখন তাহারই প্রতিরূপে সাধকের ভ্রূযুগল-মধ্যে যোগ-হৃদয়ে নির্ম্মল জ্যোতিষ্মতীর আবির্ভাব হইয়া থাকে। ধ্যান-সাধনাদ্বারা সেই জ্যোতিষ্মতীর রূপকে ক্রমশঃ স্থায়ী করিতে পারিলেই বিন্দুধ্যান সিদ্ধ হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—

"বায়ুপ্রধানা সূক্ষ্মাস্তাৎ ধ্যানং বিন্দুময়ন্তবেৎ।

ধ্যানমেতদ্ধি পরমং লয়যোগসহায়কম্ ।।"

"যোগসংহিতায়" লিখিত আছে ঃ—

"লয়যোগায় যো ধ্যানবিধিঃ সমু বর্ণিতঃ।
বিন্দুধ্যানং চ সূক্ষ্মং বা তস্য সংজ্ঞা বিধীয়তে ।।
যোনিমুদ্রা তথা শক্তিচালিনী চাপ্যুভে পরম্।
সাহায্যং কুরুতো নিত্যং বিন্দুধ্যানস্য সিদ্ধয়ে ।।
সাধনেন প্রবুদ্ধা সা কুলকুণ্ডলিনী যদা।
তদা হি দৃশ্যতে কিন্তু ন স্থিরা প্রকৃতের্বশাৎ ।।
পরেণ পুংসা সঙ্গেন চাঞ্চল্যং বিজহাতি সা।
অতীন্দ্রিয়ৌ রূপপরিত্যক্তৌ প্রকৃতিপুরুষৌ ।।
তথাপি সাধকানাং বৈ হিতং কল্পয়িতুং প্রভুঃ।
জ্যোতির্ম্ময়ো যুগ্মরূপঃ প্রাদুর্ভবতি দৃকপথে ।।
জ্যোতির্ধ্যানমধিদৈবং বিন্দূধ্যানং প্রকীর্ত্তিতম্।
মুদ্রাসাহায্যতো ধ্যানং প্রারভ্য নিয়তেন্দ্রিয় ।।
নিশ্চলো নির্ব্বিকারো হি তত্র দার্ঢ্যং সমভ্যসেৎ ।।

অর্থাৎ লয়যোগের জন্য মহর্ষিগণ যে ধ্যানের বর্ণন করিয়াছেন, তাহাকে সূক্ষ্ম-ধ্যান অথবা বিন্দু-ধ্যান বলে। শক্তিচালিনী ও যোনিমুদ্রা উভয়ই বিন্দু-ধ্যান-সিদ্ধির পক্ষে পরম সহায়ক। সাধন দ্বারা যখন কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তির উদ্বোধন হইতে থাকে, তখনই উহা সাধকের দর্শন-পথে উপনীত হয়। কিন্তু প্রকৃতি স্বাভাবিক চঞ্চলতা বশতঃ অস্থির ভাবে অবস্থান করেন, ক্রমশঃ সেই মহাশক্তি পরমপুরুষে সংযুক্ত হইলে, তাঁহার চাঞ্চল্য বিদূরিত হইয়া যায়। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি উভয়ই অতীন্দ্রিয় বস্তু বা রূপবিহীন হইলেও অধিদৈব জ্যোতির রূপে সাধককে লয়োন্মুখ করিবার জন্য যুগলরূপে দর্শন দিয়া থাকেন। অধিদৈব জ্যোতিপূর্ণ বিন্দুময় উক্ত ধ্যানকেই বিন্দুধ্যান বলে। পূর্ব্বকথিত মুদ্রাদির সহায়তায় এই ধ্যানের আরম্ভ করিয়া পরে নিশ্চল নির্দ্বন্দ্ব হইয়া ধ্যানের

দৃঢ়তা সম্পাদন করা যায়।

অন্যত্র যোগোপদেশে কথিত আছে ঃ—

"বহুভাগ্যবশাদ্ যস্য কুণ্ডলী জাগ্রতো ভবেৎ॥
আত্মনঃ সহযোগেন নেত্ররন্ধ্রাদ্বিনির্গতা।
বিহরেদ্ রাজমার্গে চ চঞ্চলত্বান্ন দৃশ্যতে॥
শাম্ভবীমুদ্রয়া যোগী ধ্যানযোগেন সিধ্যতি।
সূক্ষ্মধ্যানমিদং গোপ্যং দেবানামপি দুর্লভং॥
স্থূলধ্যানাচ্ছতগুণং তেজোধ্যানং প্রচক্ষতে।
তেজোধ্যানাল্লক্ষগুণং সূক্ষ্মধ্যানং পরাৎপরং।
তেজোধ্যানাল্লক্ষগুণং সূক্ষ্মধ্যানং বিশিষ্যতে॥"

বহুভাগ্যবশে সাধকের কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগরিতা হইয়া আত্মার সহিত মিলিতা হইলে নয়নরন্ধ্রপথে বিনির্গতা হইয়া উর্দ্ধ-দেশস্থ রাজমার্গে ভ্রমণ করেন। ভ্রমণকালে সূক্ষ্মত্ব ও চাঞ্চল্য-নিবন্ধন ধ্যানযোগে সেই কুণ্ডলিনীকে দর্শন করিতে পারা যায় না। যোগী শাম্ভবীমুদ্রার আচরণপূর্ব্বক সেই কুণ্ডলিনী শক্তি-কেই অবিরতভাবে চিন্তা করিবেন। ইহাকেই সূক্ষ্মধ্যান বলে। এই ধ্যান অতি গুহ্য এবং ইহা দেবগণের পক্ষেও দুর্লভ! স্থূল-ধ্যান হইতে জ্যোতির্ধ্যান শতগুণ শ্রেষ্ঠ এবং জ্যোতির্ধ্যান হইতে সূক্ষ্ম বা বিন্দু-ধ্যান লক্ষ গুণ শ্রেষ্ঠ। ইহা হইতেই আত্ম-সাক্ষাৎ-কার প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব ইহাই বিশিষ্ট ধ্যান বলিয়া জানিবে। এই স্থূল ও সূক্ষ্ম ধ্যান-প্রক্রিয়ার মধ্যে যে সকল মুদ্রার উল্লেখ আছে, পাঠক তাহা "গুরুপ্রদীপে" যোগাধিকারের মধ্যে দেখিতে পাইবেন, তবে প্রয়োজন মত অভিজ্ঞ গুরুদেবের নিকট ভাল করিয়া বুঝিয়া লইবেন।

লয়ক্রিয়া ও ধ্যানের সাধন-ক্রম।

অতঃপর লয়যোগের অষ্টম অঙ্গ লয়ক্রিয়া, ইহা সিদ্ধ হইলেই সাধকের সমাধিলাভ হয়। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, ইহাই লয়যোগের সর্ব্বপ্রধান ক্রিয়া। কারণ এই

ক্রিয়ার নামানুসারেই "লয়যোগ" নামকরণ হইয়াছে। এই অতি সূক্ষ্ম যোগক্রিয়া সাধকের ধ্যান-সিদ্ধিপূর্ব্বক সমাধি-সিদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণ সহায়তা প্রদান করে। ইহা অলৌকিক ভাব-পূর্ণ অতি গোপ্য ক্রিয়াযোগ, ইহাকেই যোগতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ লয়ক্রিয়া বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহার ক্রিয়া অনন্তকোটী প্রকার, কিন্তু শ্রীমন্মহর্ষি ব্যাসদেব ইহার নয় প্রকার প্রক্রিয়া-সহযোগে সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। সাধক-বর্গের গোচরার্থ এস্থলে তাহাই সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি।

পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে যে, 'গুরুপ্রদীপের' যোগদীক্ষা-ভিষেকের মধ্যে শাস্ত্র-বচন উদ্ধৃত আছে যে ঃ—

"নবচক্রং কলাধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকম্।
স্বদেহে যো ন জানাতি স যোগী নামধারকঃ॥"

অর্থাৎ দেহস্থিত নবচক্র, ষোড়শ আধার, ত্রিলক্ষ্য ও পাঁচ প্রকার ব্যোম সম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান নাই, সে ব্যক্তি নামধারী যোগী বলিয়া খ্যাত অর্থাৎ তিনি যোগতত্ত্বের কিছুই জানেন না। সেই নবচক্র যে কি, তাহাও যোগদীক্ষাভিষেক অংশে ষট্‌চক্র-আলোচনা-উপ লক্ষে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। পাঠক, তাহা পুনরায় দেখিয়া লইবেন। এই নবচক্র সম্বন্ধে তন্ত্রান্তরেও উপদেশ আছে ঃ—

"মূলাধারং চতুষ্পত্রং গুদোর্দ্ধে বর্ত্ততে মহৎ।
লিঙ্গমূলেতু পীতাভং স্বাধিষ্ঠানন্ত ষড়্‌দলং॥
তৃতীয়ং নাভিদেশেতু দিগ্দলং পরমাদ্ভুতং!
অনাহতমিষ্টপীঠং চতুর্থকমলং হৃদি॥
কলাপত্রং পঞ্চমন্ত বিশুদ্ধং কণ্ঠদেশতঃ।
আজ্ঞাখ্যং ষষ্ঠকং চক্রং ভ্রূবোমর্মধ্যে দ্বিপত্রকম্॥
চতুঃষষ্টিদলং তালু মধ্যে চক্রন্ত মধ্যমং।
ব্রহ্মরন্ধ্রে হ্যষ্টমং চক্রং শতপত্রং মহাপ্রভং॥
নবমন্ত মহাশূন্যং চক্রন্ত তৎপরাপরং।

তন্মধ্যে বর্ত্ততে পদ্মং সহস্রদ

গুহ্যের উপরে চারি পত্র বিশিষ্ট মূলাধার চক্র, লিঙ্গমূলে পীতাভ ষট্ দল বিশিষ্ট স্বাধিষ্ঠান নামক দ্বিতীয় চক্র, নাভিদেশে দশদল বিশিষ্ট পরমদ্ভূত তৃতীয় মণিপুর চক্র, হৃদয়ে চতুর্থ কমল ইষ্টদেবতার আসন-স্বরূপ অনাহত চক্র, কণ্ঠদেশে ষোড়শ পত্র বিশিষ্ট বিশুদ্ধ নামক পঞ্চম চক্র, ভ্রুদ্বয়ের মধ্যে দ্বিপত্র বিশিষ্ট আজ্ঞা নামক ষষ্ঠ চক্র, তালুমধ্যে চতুঃষষ্টিদলযুক্ত মধ্য-চক্র, ইহাকেই তন্ত্রান্তরে ললনা চক্র বলা হইয়াছে, ব্রহ্মরন্ধ্রের নিম্নেই অষ্টম চক্র শতপত্র বিশিষ্ট ইহাকে তন্ত্রান্তরে মনশ্চক্র বলা হইয়াছে, নবম চক্র সকল চক্রের মধ্যে তৎপরাপর মহাশূন্যময় অনির্ব্বচনীয় বস্তু, তাহারই মধ্যে পরমাদ্ভুত চক্রাতীত চক্র সহস্রদল-পদ্ম বিরাজিত রহিয়াছে। যাহা হউক এইবার সাধকের অবগতির নিমিত্ত যোগশাস্ত্রোক্ত চক্র-নির্দ্দেশসহ সাধন-ইঙ্গিত মাত্র বলিতেছি।

"প্রথমং ব্রহ্মচক্রং স্যাত্রিরাবর্ত্তং ভগাকৃতি।
অপানে মূলকন্দাখ্যং কামরূপঞ্চ তজ্জগুঃ ॥
তদেব বহ্নিকুণ্ডে স্যাৎ তত্র কুণ্ডলিনী মতা।
তাং জীবরূপিণীং ধ্যায়েজ্জ্যোতিষ্কাং মুক্তিহেতবে ॥"

প্রথমে ব্রহ্মচক্র বা মূলাধার চক্র, উহা ভগাকৃতি বিশিষ্ট ও উহাতে তিনটী আবর্ত্ত আছে। ঐ স্থান অপান বায়ুর মূলদেশ ও নাড়ী সকলের উৎপত্তি স্থান, এই জন্য উহার কন্দমূল আখ্যা হইয়াছে। ঐ কন্দমূলের উপরিভাগে অগ্নিশিখার ন্যায় তেজস্বী কামবীজ বিদ্যমান আছে। উহাকে বহ্নিকুণ্ডও বলে, ঐ স্থানে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ 'আছেন, তাহাতেই জ্যোতির্ম্ময়ী কুণ্ডলিনী শক্তিকে জীবরূপে বা জীবের জীবনী-শক্তিরূপে ধ্যান করিয়া তাহাতেই চিত্তলয় করিতে পারিলে মুক্তি-লাভ হয়।

"স্বাধিষ্ঠানং দ্বিতীয়ং স্যাৎ চক্রং তন্মধ্যগং বিদুঃ।
পশ্চিমাভিমুখং তচ্চ প্রবালাঙ্কুরসন্নিভং ॥

তত্রোড্‌ডীয়ানপীঠে তু তদ্ধ্যাত্বাকর্ষয়েজ্জগৎ ।।"

স্বাধিষ্ঠান নামক দ্বিতীয় চক্র প্রবালাঙ্কুর সদৃশ, তাহা পশ্চিমাভিমুখী, তাহারই মধ্যে উড্ডীয়ান নামক পীঠের উপর কুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্থাপন করিয়া ধ্যানপূর্ব্বক তাহাতে চিত্তলয় করিলে ব্রহ্মময় জগৎ আকর্ষণেরও শক্তি জন্মে।

তৃতীয়ং নাভি চক্রং স্যাৎ তন্মধ্যে ভুজগী স্থিতা।
পঞ্চাবর্ত্তা মধ্যশক্তিশ্চিদ্রূপা বিদ্যুদাকৃতিঃ।
তাং ধ্যাত্বা সর্ব্বসিদ্ধীনাং ভাজনং জায়তে ধ্রুবম্ ॥"

তৃতীয় মণিপূর নামক নাভিচক্র, তন্মধ্যে পঞ্চাবর্ত্ত বিশিষ্ট বিদ্যুৎবরণী চিৎ-স্বরূপা মধ্যশক্তি ভুজগী অবস্থিতা আছেন। তাঁহাকে ধ্যান করিলে নিশ্চয়ই সর্ব্বসিদ্ধির ভাজন হয়। সাধক, এইস্থলে চিৎস্বরূপা মধ্যশক্তিতে চিত্তলয় করিবেন। এই মধ্যশক্তির সম্বন্ধে "জ্ঞানসঙ্কলিনী" মধ্যে শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঃ—

ঊর্দ্ধ্বশক্তির্ভবেৎ কণ্ঠঃ অধঃশক্তির্ভবেদ্‌গুদঃ।
মধ্যশক্তির্ভবেন্নাভিঃ শক্ত্যাতীতং নিরঞ্জনং ॥"

কণ্ঠে ঊর্দ্ধশক্তি বিশুদ্ধ চক্রে, গুহ্যদেশে বা মূলাধারে অধঃশক্তি কুণ্ডলিনী এবং মধ্যশক্তি নাভিমূলে বা মণিপুর চক্রে অবস্থিতা আছেন। এই ত্রিবিধা শক্তিই মেরুদণ্ড আশ্রয় করিয়া সতত বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই তিন ব্রহ্ম-শক্তিতে জীব আত্মচিত্তলয় করিয়া থাকেন। "গুরুপ্রদীপে" মণিপুর চক্র-নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মগ্রন্থি সাধনাই এই মধ্য-শক্তিতে মনোলয়-সিদ্ধি। এক্ষণে লয়যোগ-ক্রিয়ায় মণিপুরস্থিত ঐ মধ্যশক্তির ধ্যান ও তাহাতে চিত্তলয় করাই তৃতীয় চক্র সাধনার উদ্দেশ্য জানিতে হইবে।

"চতুর্থং হৃদয়ে চক্রং বিজ্ঞেয়ং তদধোমুখং।
জ্যোতিরূপঞ্চ তন্মধ্যে হং সঃ ধ্যায়েৎ প্রযত্নতঃ ॥
তং ধ্যায়তো জগৎ সর্ব্বং বশ্যং স্যান্নাত্র সংশয়ঃ ॥"

লয়ক্রিয়া-যোগের চতুর্থ সাধনায় সাধক হৃদয়স্থিত অধোমুখ

কমল (যোগদীক্ষাভিষেক অংশে বর্ণিত উপায়ে) উর্দ্ধমুখ করিয়া তাহারই মধ্যে জ্যোতিস্বরূপ দীপকলিকা-সদৃশ জীবাত্মা 'হংসঃ'কে সযত্নে ধ্যানপূর্ব্বক তাহাতেই চিত্তলয় করিতে হইবে। তাহা হইলে নিঃসন্দেহ চতুর্থলয়-সিদ্ধির সহিত ব্রহ্মময় সর্ব্বজগৎ-জ্ঞান আয়ত্ব হইবে।

"পঞ্চমং কালচক্রং স্যাৎ তত্র বামে ইড়া ভবেৎ।
দক্ষিণে পিঙ্গলা জ্ঞেয়া সুষুম্না মধ্যতঃ স্থিতা।
তত্র ধ্যাত্বা শুচির্জ্যোতিঃ সিদ্ধীনাং ভাজনং ভবেৎ॥"

পঞ্চম কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ বা কালচক্রের বাম অংশে ইড়া ও দক্ষিণাংশে পিঙ্গলা এবং মধ্যাংশে সুষুম্না নাড়ী অবস্থিতা আছে। এই চক্রপীঠস্থিত নিশ্চল পবিত্র জ্যোতির ধ্যান করিয়া তাহাতেই চিত্ত লয় করিলে সিদ্ধি ভাজন হইতে পারা যায়। ইহাই লয়-ক্রিয়ানুষ্ঠানে পঞ্চম সাধনা।

"ষষ্ঠঞ্চ তালুকাচক্রং ঘণ্টিকাস্থানমুচ্যতে।
দশমদ্বারমার্গন্তু লয়যোগবিদো জগুঃ॥
তত্র শূন্যে লয়ং কৃত্বা মুক্তো ভবতি নিশ্চিতং॥"

লয়যোগ ক্রিয়ার ষষ্ঠ সাধনায় সাধক তালুকাচক্র, যাহাকে "গুরুপ্রদীপে" ললনাচক্র বলা হইয়াছে। লয়যোগ-শাস্ত্রে তাহাই ঘণ্টিকাস্থল বা দশমদ্বার-মার্গ অর্থাৎ মুখ, দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকারন্ধ্র, মল ও মূত্রদ্বার; এই নয় দ্বার বাহিরের দিকে উন্মুক্ত। কিন্তু এই ললনা বা ঘণ্টিকাস্থান ব্রহ্মরন্ধ্র-পথে যাইবার জন্য লয়-যোগ-নির্দ্দিষ্ট সাধন-শাস্ত্রে দশমদ্বার বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহা-রই শূন্যময় স্থানে ব্যোম-বিন্দুতে চিত্ত লয় করিতে হইবে। তাহা হইলেই সাধক নিশ্চয় মুক্তি-লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

ভূচক্রং সপ্তমং বিদ্যাৎ বিন্দুস্থানঞ্চ তদ্বিদুঃ।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে বর্ত্তুলঞ্চ ধ্যাত্বা জ্যোতিঃ প্রমুচ্যতে॥"

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে ভূচক্র নামক সপ্তম চক্রের বর্ণনকালে আজ্ঞাচক্র

বলা হইয়াছে, সেই আজ্ঞাপীঠ বা যোগ-হৃদয়কে লয়যোগ-শাস্ত্রে বিন্দুস্থান বলে। এই স্থানে মণ্ডলাকার বা তদন্তর্গত বিন্দু-সদৃশ আত্ম-জ্যোতিঃ দর্শন হইয়া থাকে। লয়যোগে এই প্রধান ধ্যান-ভূমি বিন্দুস্থানে আত্ম-দর্শন সিদ্ধ হয় বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত বিন্দুধ্যান ইহার প্রধান লক্ষ্যরূপে স্থির হইয়াছে। যোগী এইস্থানে চিত্ত-লয় করিতে পারিলে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

"অষ্টমং ব্রহ্মরন্ধ্রং স্যাৎ পরং নির্ব্বাণসূচকং।
তদ্ধ্যাত্বা সূচিকাগ্রাভং ধূমাকারং বিমুচ্যতে॥
তচ্চ জালন্ধরং জ্ঞেয়ং মোক্ষদং লীনচেতসাং॥"

লয়-ক্রিয়াযোগের অষ্টম অনুষ্ঠান ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত অষ্টম চক্রে বা মানসচক্রে ধূম্রাকার জালন্ধর নামক স্থানে সূচিকার অগ্রভাগ-তুল্য বিন্দুময় নির্ব্বাণসূচক পরব্রহ্মের সহিত চিত্তলয় করিতে হইবে। ইহাতেই সাধকের মোক্ষ-লাভ হয়।

"নবমং ব্রহ্মচক্রং স্যাৎ দলৈঃ ষোড়শশোভিতং।
সচ্চিদ্রূপা চ তন্মধ্যে শক্তিরর্দ্ধস্থিতা পরা।
তত্র পূর্ণাং মেরুপৃষ্ঠে শক্তিং ধ্যাত্বা বিমুচ্যতে॥"

এই নবম ব্রহ্মচক্র যাহাকে 'গুরুপ্রদীপে' সোমচক্র বলা হই-য়াছে। তাহাতেই ভগবানের ষোড়শকলাযুক্ত ষোলটী দল আছে, তাহার মধ্যে মেরুপৃষ্ঠের উপর ব্রহ্মের অর্দ্ধাঙ্গে সৎ ও চিৎরূপা পরবিদ্যা বা পরশক্তি সর্ব্বদা দিব্যমান আছেন, সাধক সেই স্থানেই ব্রহ্মের পূর্ণকলা-বিন্দুময়ী পরমা-শক্তির ধ্যানপূর্ব্বক তাহাতেই চিত্ত-লয় করিতে পারিলে মুক্তিপদ লাভ হইয়া থাকে।

"এতেষাং নবচক্রাণামেকৈকং ধ্যায়তো মুনেঃ।
সিদ্ধয়ো মুক্তি সহিতাঃ করস্থাঃ স্যুর্দ্দিনে দিনে॥
কোদণ্ডদ্বয়মধ্যস্থং পশ্যতি জ্ঞানচক্ষুষা।
কদম্বগোলকাকারং ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি তে॥"

এই নবচক্রের মধ্যে এক একটী চক্রের ধ্যানকারী মুনিগণের

সিদ্ধিসহ মুক্তি তাঁহাদের করতলে অবস্থিত। তাহার কারণ তাঁহারা জ্ঞাননেত্র-দ্বারা কোদণ্ডদ্বয়-মধ্য কদম্ব-সদৃশ গোলাকার ব্রহ্মলোক দর্শন করেন ও অন্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিতেও সমর্থ হয়েন। ইহাই শ্রীমন্মহর্ষি ব্যাসদেবের অপূর্ব্ব সাধনলব্ধ লয়যোগানুষ্ঠান।

সিদ্ধগণ প্রবর্ত্তিত চতুর্বিধ লয়যোগ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাহ্যাভ্যন্তর-ভেদে লয়যোগ অসংখ্য কোটী প্রকার, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নবচক্রে লয়সাধনা ব্যতীত সিদ্ধ যোগাচার্য্য মহাত্মগণ সমস্ত লয়-ক্রিয়াকে সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া সাধনার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

"শাম্ভব্যাচৈব ভ্রামর্য্যা খেচর্য্যা যোনিমুদ্রয়া।
ধ্যানং নাদং রসানন্দং লয়সিদ্ধিশ্চতুর্ব্বিধা॥"

১ম। শাম্ভবী-মুদ্রাদ্বারা ধ্যান, ২য়। ভ্রামরী-কুম্ভক দ্বারা নাদ-শ্রবণ, ৩য়। খেচরী-মুদ্রা-সহযোগে রসাস্বাদন এবং ৪র্থ। যোনি-মুদ্রাদ্বারা আনন্দ-উপভোগরূপ চতুর্ব্বিধ লয়যোগ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

১ম। ধ্যান-লয়ঃ—

"শাম্ভবীং মুদ্রিকাং কৃত্বা আত্মপ্রত্যক্ষমানয়েৎ।
বিন্দুব্রহ্ম সকৃদ্দৃষ্ট্বা মনস্তত্র নিয়োজয়েৎ॥
খমধ্যে কুরুচাত্মানং আত্মমধ্যে চ খং কুরু।
আত্মানং খময়ং দৃষ্ট্বা ন কিঞ্চিদপি বাধ্যতে।
সদানন্দময়ো ভূত্বা সমাধিস্থো ভবেন্নরঃ॥"

খেচরী মুদ্রা অর্থাৎ নেত্রাজ্ঞানে বা ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া একান্তভাবে চিত্ত-স্থিরপূর্ব্বক আত্ম-প্রত্যক্ষ করিবে এবং কিছুক্ষণ সেই বিন্দু-ব্রহ্ম সন্দর্শন করিয়া তাহাতেই চিত্তলয় করিতে হইবে। পরে কিয়ৎক্ষণ শিরস্থিত ব্রহ্মলোকময় আকাশের মধ্যে জীবাত্মাকে এবং জীবাত্মার মধ্যে উক্ত ব্রহ্মলোকময় আকাশকে স্থাপন করিয়া, জীবাত্মাকে উক্ত আকাশময় দেখিয়া

অর্থাৎ উক্ত উভয় বস্তু বিন্দুতে পরিণত হইয়া একীভূত হইয়াছে, এইরূপ ধ্যান বা দর্শনপূর্ব্বক আত্মানন্দময় হইয়া সাধক সমাধিস্থ হইতে পারেন। ইহাকেই যোগিগণ ধ্যান-লয়-যোগ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

২য়। নাদ-লয় যোগ ঃ—

"অনিলং মন্দবেগেন ভ্রামরীকুম্ভকং চরেৎ।
মন্দং চ রেচয়েদ্বায়ুং ভৃঙ্গনাদং ততো ভবেৎ॥
অন্তঃস্থং ভ্রামরীনাদং শ্রুত্বা তত্র মনোলয়েৎ।
সমাধির্জ্জায়তে তত্র আনন্দঃ সোঽহমিত্যতঃ॥"

ভ্রামরী নামক কুম্ভকের অনুষ্ঠান দ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাসবায়ু রেচন করিবে অর্থাৎ মহানিশা বা অর্দ্ধরাত্রিকালে যোগী জীবগণের শব্দরহিত কোন একান্ত স্থানে উভয় কর্ণকুহরে উভয় হস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, পূরক কুম্ভক ও রেচক-ক্রিয়া করিতে করিতে দক্ষিণ কর্ণের নিকট হইতে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার বা ভ্রমরের গুঞ্জন শব্দের ন্যায় শরীরাভ্যন্তরস্থ নাদ বা অনাহত-ধ্বনি শ্রুত হইবে। তখন অন্তরস্থ সেই অনাহত ভ্রামরী-নাদের সহিত সাধক মনোরূপী আত্মাকে লয় করিবে, তাহা হইলেই গুরূপদিষ্ট নাদ-লয়যোগ-সহ সমাধি সিদ্ধি হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নাদ অর্থে অনাহতধ্বনি। এই ধ্বনিতে চিত্ত লয়-প্রাপ্ত হয়। "সারদাতিলকে" শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঃ—

শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ॥"

অর্থাৎ নাদ শব্দে প্রকৃতি-শক্তিকেও বুঝায়। সাধকের পিণ্ডমধ্যে জীবাত্মা বা জীবনী-শক্তিরূপে কুণ্ডলিনী-শক্তিই প্রকৃতি-শক্তি বলিয়া কথিত। সেই কুণ্ডলিনী-মহাশক্তি যতক্ষণ কুলকুণ্ডলিনী মহামায়ারূপ সহস্রারস্থিত পরম শিবে বা পরমাত্মায় লয়-প্রাপ্তা অর্থাৎ একীভূতা হইয়া না যান, ততক্ষণ সাধকের সেই নাদ বা অনাহতধ্বনির নিবৃত্তি হইবে না। যখন পূর্ব্বকথিতরূপে জীবাত্মা

পরমাত্মায় বিলীন হইবেন, তখনই সেই প্রকৃতি-শক্তিরূপে অনাহতধ্বনি পরব্রহ্মে লয় হইয়া যাইবে।

"ব্রহ্মরন্ধ্রে গতে বায়ৌ গিরিপ্রস্রবণং ভবেৎ।
শৃণোতি শ্রবণাতীতং নাদং মুক্তির্ন সংশয়ঃ॥"

ব্রহ্মরন্ধ্রে বায়ুরূপে জীবনীশক্তি সমুপস্থিত হইলেই পর্ব্বত-প্রস্রবণের ন্যায় শ্রবণাতীত অনাহত-নাদ-শব্দ অনুভূত হইতে থাকিবে। সেই নাদই যোগিবরের নিঃসন্দেহ মুক্তিপ্রদ বলিয়া যোগাচার্য্যগণ বর্ণন করিয়াছেন।

৩য়। রসাস্বাদন-লয়যোগ :—

"সাধয়েৎ খেচরীমুদ্রা রসনোর্দ্ধগতা যদা।
তদা সমাধিসিদ্ধিঃ স্যাদ্ধিত্বা সাধারণক্রিয়াম্॥"

খেচরী-মুদ্রার অনুষ্ঠান দ্বারা অর্থাৎ জিহ্বাকে ক্রমে ক্রমে তালুমধ্যে প্রবেশ করাইয়া উর্দ্ধদিকে উল্টাইয়া কপালকুহরে বা সুধাকূপ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া রাখিবে। তখন ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সুধাকূপস্থিত সুধাবিন্দুতে চিত্ত নিয়োজিত করিবে। তাহাতে লৌকিক সাধারণ ক্রিয়াসমূহ বিদূরিত হইয়া সাধকের রসাস্বাদন-লয়যোগ সিদ্ধিসহ সমাধি অবস্থা উপনীত হয়।

এই খেচরী-মুদ্রার অনুষ্ঠান-বিষয়ে "গুরুপ্রদীপেও" সংক্ষেপে কিছু বলা হইয়াছে। খেচরীমুদ্রা-বর্ণিত জিহ্বাদ্বারা সুধাকূপস্পর্শ করিবার জন্য হঠযোগ-শাস্ত্রে কথিত আছে যে, রসনার নিম্নস্থিত মাংসপেশী ধীরে ধীরে সুতীক্ষ্ণ নির্ম্মল অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিতে হইবে। প্রমতঃ এক লোম পরিমাণ ছেদন করিবে। হরিতকী ও সৈন্ধব চূর্ণদ্বারা এই সময় জিহ্বা মার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। পুনরায় সপ্তম দিনে আর এক লোম পরিমাণ পূর্ব্বকথিতভাবে ছেদন করিবে, এইভাবে ক্রামাগত ছয়মাস জিহ্বার নিম্নপেশী ছেদিত হইলে জিহ্বা সুদীর্ঘ হইয়া কপালকুহরগামী হইতে পারে। এই ক্রিয়ায় জিহ্বা ও চিত্ত আকাশগামী হইয়া থাকে বলিয়াই

ইহার নাম খেচরীমুদ্রা।

শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে ঃ—

"তালুমূলগতাং যত্নাৎ জিহ্বয়াক্রম্য ঘণ্টিকাং
ঊর্দ্ধ্বরন্ধ্রগতে প্রাণে প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে॥"

জীহ্বা বিপরীতগামিনী করিয়া আলিজিহ্বা নিপীড়ন-সহকারে নিশ্চলবায়ু রোধ করিলেই বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করে ও সমাধি হয়।

"আকুঞ্চনমপানস্য প্রাণস্য চ নিরোধনম্।
লম্বিকোপরি জিহ্বায়াঃ স্থাপনং যোগসাধনম্॥"

অপান বায়ুর আকুঞ্চন, প্রাণ বায়ুর রোধ ও আলিজিহ্বার উপরি জিহ্বা স্থাপনই প্রধান যোগসাধন। এই খেচরী-মুদ্রার অভ্যাসে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, আলস্য, রোগ, জরা, জীর্ণতা দূর হয়। শরীর দেব-সদৃশ হয়। সুতরাং সহজে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয় না, বায়ুদ্বারা শুষ্ক হয় না এবং জলে ক্লিন্ন বা সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট হয় না। শরীরে অপূর্ব্ব লাবণ্য হয় এবং পরিণামে নিশ্চয়ই সমাধি হয়। এই সাধনায় রসনায় নানা রসের আস্বাদ অনুভব হইয়া থাকে। এই কারণ পূজ্যপাদ যোগাচার্য্যগণ ইহাকে রসাস্বাদন-লয়যোগ বলিয়া বর্ণন করেন।

৪র্থ। আনন্দোপভোগ-লয়যোগ ঃ—

"যোনিমুদ্রাং সমাসাদ্য স্বয়ং শক্তিময়ো ভবেৎ।
সুশৃঙ্গাররসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি॥
আনন্দময়ঃ সংভূত্বা ঐক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ।
অহং ব্রহ্মেতি বাদ্বৈতং সমাধিস্তেন জায়তে॥"

যোগিব্যক্তি আদৌ যোনিমুদ্রা অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ প্রথমতঃ পূরক দ্বারা মন বা চিত্তকে মূলাধারে স্থাপন করিতে হইবে। পরে গুহ্যদ্বার ও উপস্থের মধ্যস্থলে যে যোনিমণ্ডল আছে, তাহা আকুঞ্চনপূর্ব্বক কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগরিত করিয়া যোগ-সাধনে

নিয়োজিত হইবে। এই যোনিমণ্ডলকে ব্রহ্মযোনিও বলা যায়; ইহাতে বন্ধুক-পুষ্প-সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট কোটিসূর্য্যের ন্যায় তেজসম্পন্ন ও কোটিচন্দ্রের ন্যায় সুশীতল কন্দর্পবায়ু নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। সেই বায়ুর মধ্যস্থলে সূক্ষ্ম শিখাস্বরূপা চৈতন্যরূপিনী পরমকলা কুণ্ডলিনী বা জীবনীশক্তি অবস্থিতা আছেন, তাহা জীবাত্মা-কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত ও একীভূতা হইয়াছেন অর্থাৎ যখন সাধক জীবাত্মাকে বা আপনাকে প্রকৃতি-বিন্দুরূপে চিন্তা করিয়া ক্রমে মূলাধার হইতে ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি, ও রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিয়া সুষুম্নান্তর্গত ব্রহ্মমার্গে গমন করিবেন, যখন আত্মময় কুলকুণ্ডলিনী বিন্দু, অকুল স্থানে বা সহস্রারে উপস্থিত হইবেন, তখন পরমাত্মাকে পুরুষ বা শিববিন্দুরূপ ভাবনা করিয়া প্রকৃতি-পুরুষরূপে আপনার সহিত পরমাত্মার শৃঙ্গার-রস নিমগ্ন বিহার বা সম্ভোগ-জনিত পরমানন্দে উভয় বিন্দুতে অভেদরূপে মিলিত বা একীভূত হইয়াছি অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মেতি' বা 'অদ্বৈতং' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ত্রিপুটীলয় হইয়া সমাধির উপস্থিত হইবে। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই লয়-ক্রিয়ার অনুষ্ঠেয় যোনিমুদ্রা বিভিন্ন যোগাচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহার গুরুদত্ত যেরূপ উপদেশ, তিনি সেই ভাবেই কার্য্য করিতে পারেন। তাহাতে বিশেষ কোন দোষ হইবে না।

প্রকারান্তে যোনিমুদ্রা ঃ—

সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা কর্ণদ্বয়, তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা লোচনদ্বয়, মধ্যাঙ্গুল দ্বারা নাসিকাবিবরদ্বয় এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা অধরোষ্ঠ বা মুখবিবর রুদ্ধ করিয়া কাকীমুদ্রা দ্বারা প্রাণ বায়ুকে আকর্ষণপূর্ব্বক নাভিমণ্ডল সন্নিকটে মণিপুর নামক চক্রে অপান বায়ুর সহিত তাহাকে সংযোগ করিতে হইবে। অনন্তর তৎসাহায্যে ঘট বা দেহস্থিত পূর্ব্বোক্ত নবচক্রের মধ্যে মূলাধার হইতে সুষুপ্তা কুণ্ডলিনীরূপা জীবনীশক্তিকে "হুঁ হং

সঃ" মন্ত্রে জাগাইয়া জীবাত্মার সহিত ধীরে ধীরে প্রত্যেক চক্রে চিন্তা করিবার পর সহস্রদল কমলান্তর্গত অকুল-স্থানে আনয়ন করিতে হইবে। তখন সাধক আপনাকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে শক্তিময় বিন্দু চিন্তা করিয়া পরমশিবের সহিত সম্মিলিত করিয়া আপনাকে আনন্দময় ও পরম সুখী বলিয়া ভাবনা করিবে। এই যোনিমুদ্রাও অতি গোপনীয়। দেবতাদিগের পক্ষেও দুর্জ্ঞেয় বা দুর্লভ। এই মুদ্রাসহ লয়যোগ-ক্রিয়া অভ্যাস করিলে অনায়াসে সম্পূর্ণ সিদ্ধি হয় ও অবিলম্বে সমাধিস্থ হইতে পারা যায়।

ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার বলা হইয়াছে যে, লয়যোগ ক্রিয়ানুষ্ঠানের সীমা নাই। স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে যে কোন বস্তু অবলম্বন করিয়া লয়-ক্রিয়া সাধনা হইতে পারে। পূর্ব্ববর্ণিত লয়বিধান ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার বিধি নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। পাঠকের স্মরণ আছে "গুরুপ্রদীপে" ভূতশুদ্ধির গুহ্য উপদেশসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই এই লয়যোগের প্রথম ও প্রধান অনুষ্ঠান। সমগ্র-যোগবিদ তন্ত্রাচার্য্য ও কুলগুরুবৃন্দ সেই কারণ তাহা প্রথম হইতেই মন্ত্রযোগের মধ্যে সন্নিবেশ করিয়া যোগসিদ্ধির অদ্ভুত বিধি-ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন ঃ—

"পঞ্চতত্ত্বাৎ ভবেৎ সৃষ্টিস্তত্ত্বে তত্ত্বং বিলীয়তে।"

অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব হইতেই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই তত্ত্বময় সমস্ত সৃষ্টিই পুনরায় তত্ত্ব-পঞ্চকে বিলীন হইয়া থাকে। সাধক সাধারণ ভাবে সে সময় স্থূল ভূতশুদ্ধির যে সাধনা সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই অনুরূপ সূক্ষ্মভূত অর্থাৎ সেই স্থূল ভূত-পঞ্চকের বিলয়াবশেষ তত্ত্ববিন্দু বা বীজ-পঞ্চক যাহা এক অন্যের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া আছে, তাহাও ধীরে ধীরে লয় করিতে হইবে। লয়ানুষ্ঠানের সূক্ষ্মতত্ত্ব লয়-বিষয়ে এস্থলে কিছু বলিতেছি। লয়-সাধনাভিলাষী যোগী সেই পূর্ব্বের ন্যায়ই সূক্ষ্মভূতশুদ্ধির দ্বারা মূলাধার হইতে পৃথ্বিতত্ত্ব, ক্রমে অন্যান্য তত্ত্ব, ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট চক্রে

লয় করিয়া বিশুদ্ধাখ্যচক্র হইতে "ব্যোমলয়", ক্রিয়া সাধন করিবে। ব্যোম বা আকাশের গুণ শব্দ ; তাহা লক্ষ্য করিয়াই ব্যোমলয়-সাধনা সম্পন্ন করিতে হয়। শব্দ উচ্চারণের প্রধান যন্ত্র কণ্ঠ, সেই কণ্ঠই ব্যোমভূমি, বিশুদ্ধাখ্য-চক্র-সমন্বিত। এই কারণ মূলাধার হইতে সমুত্থিতা কুণ্ডলিনী-শক্তি ধীরে ধীরে পৃথিব্যাদি সকল তত্ত্বের বীজভূতা হইয়া পরিশেষে বিশুদ্ধায় ব্যোমাত্মকরূপে উপনীত হইলে, সাধকের ব্যোম বা তদ্‌গুণস্বরূপ শব্দ-বিন্দুর সহিত আত্মার লয়যোগ সাধন করিতে হইবে। সকল শব্দের মূল বীজ বিন্দুগর্ভ প্রণব। প্রণব-সৃষ্টির বা প্রণব-বিকাশের অলৌকিক তত্ত্ব যাহা পরবর্ত্তী অংশে প্রণব-রহস্যমধ্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে পাঠক মনোযোগসহ আলোচনাপূর্ব্বক প্রণব বা ওঁকার-রূপ শব্দাত্মক ব্রহ্ম-বিন্দুকে ধ্যান করিয়া তাহাতে আত্মময় চিত্তকে লয় করিবেন, পরে সেই মন-চিত্ত ও শব্দের একীভূত আত্মবিন্দুকে ব্রহ্মস্থানে লইয়া পূর্ণভাবে বিলয় করিতে যত্নবান হইবেন। এই ভাবে সাধক যে কোনও তত্ত্ববিন্দু অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মবিন্দু-সহ আত্মবিলয়-রূপ তত্ত্বলয় বা সাধন করিতে সমর্থ হইলেই, সাধকের সমাধি-দশা উপস্থিত হইবে। অরণী-ক্রিয়োত্থিত শব্দব্রহ্মেরও এই প্রকারে লয়-সাধনা সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহা পূর্ব্বখণ্ডে যোগচতুষ্টয়ের সমাহার-অংশে বলা হইয়াছে। পাঠক প্রয়োজন বোধ করিলে তাহাও দেখিয়া লইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত অজপালয়, চৈতন্যলয়, কুটস্থ-চৈতন্যলয়াদি বিবিধ ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে। সুবিজ্ঞ গুরুদেব শিষ্যের অবস্থা ও প্রয়োজন বোধে তাহাদের যথাযথ উপদেশ দিবেন।

লয়যোগ-সমাধি।

লয়যোগের নবম ক্রিয়া সমাধি। ইহাই এই যোগানুষ্ঠানের অন্তিম ক্রিয়া। যোগীর লয়ক্রিয়া সিদ্ধ হইলেই সমাধি আপনা আপনি উপস্থিত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন :—

বলা হইয়াছে, সেই আজ্ঞাপীঠ বা যোগ-হৃদয়কে লয়যোগ-শাস্ত্রে বিন্দুস্থান বলে। এই স্থানে মণ্ডলাকার বা তদন্তর্গত বিন্দু-সদৃশ আত্ম-জ্যোতিঃ দর্শন হইয়া থাকে। লয়যোগে এই প্রধান ধ্যান-ভূমি বিন্দুস্থানে আত্ম-দর্শন সিদ্ধ হয় বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত বিন্দুধ্যান ইহার প্রধান লক্ষ্যরূপে স্থির হইয়াছে। যোগী এইস্থানে চিত্ত-লয় করিতে পারিলে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

"অষ্টমং ব্রহ্মরন্ধ্রং স্যাৎ পরং নির্ব্বাণসূচকং।
তদ্‌ধ্যাত্বা সূচিকাগ্রাভং ধূমাকারং বিমুচ্যতে॥
তচ্চ জালন্ধরং জ্ঞেয়ং মোক্ষদং লীনচেতসাং॥"

লয়-ক্রিয়াযোগের অষ্টম অনুষ্ঠান ব্রহ্মরন্ধ্রে অবস্থিত অষ্টম চক্রে বা মানসচক্রে ধূম্রাকার জালন্ধর নামক স্থানে সূচিকার অগ্রভাগ-তুল্য বিন্দুময় নির্ব্বাণসূচক পরব্রহ্মের সহিত চিত্তলয় করিতে হইবে। ইহাতেই সাধকের মোক্ষ-লাভ হয়।

"নবমং ব্রহ্মচক্রং স্যাৎ দলৈঃ ষোড়শশোভিতং।
সচ্চিদ্রূপা চ তন্মধ্যে শক্তিরর্দ্ধেস্থিতা পরা।
তত্র পূর্ণাং মেরুপৃষ্ঠে শক্তিং ধ্যাত্বা বিমুচ্যতে॥"

এই নবম ব্রহ্মচক্র যাহাকে 'গুরুপ্রদীপে' সোমচক্র বলা হইয়াছে। তাহাতেই ভগবানের ষোড়শকলাযুক্ত ষোলটী দল আছে, তাহার মধ্যে মেরুপৃষ্ঠের উপর ব্রহ্মের অর্দ্ধাঙ্গে সৎ ও চিৎরূপা পরবিদ্যা বা পরশক্তি সর্ব্বদা দিপ্যমান আছেন, সাধক সেই স্থানেই ব্রহ্মের পূর্ণকলা-বিন্দুময়ী পরমা-শক্তির ধ্যানপূর্ব্বক তাহাতেই চিত্ত-লয় করিতে পারিলে মুক্তিপদ লাভ হইয়া থাকে।

"এতেষাং নবচক্রাণামেকৈককং ধ্যায়তো মুনেঃ।
সিদ্ধয়ো মুক্তি সহিতাঃ করস্থাঃ স্যুর্দ্দিনে দিনে॥
কোদণ্ডদ্বয়মধ্যস্থং পশ্যতি জ্ঞানচক্ষুষা।
কদম্বগোলকাকারং ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি তে॥"

এই নবচক্রের মধ্যে এক একটী চক্রের ধ্যানকারী মুনিগণের

সিদ্ধিসহ মুক্তি তাঁহাদের করতলে অবস্থিত। তাহার কারণ তাঁহারা জ্ঞাননেত্র-দ্বারা কোদণ্ডদ্বয়-মধ্য" কদম্ব-সদৃশ গোলাকার ব্রহ্মলোক দর্শন করেন ও অন্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিতেও সমর্থ হয়েন। ইহাই শ্রীমন্মহর্ষি ব্যাসদেবের অপূর্ব্ব সাধনলব্ধ লয়যোগানুষ্ঠান।

সিদ্ধগণ প্রবর্ত্তিত চতুর্বিধ লয়যোগ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাহ্যাভ্যন্তর-ভেদে লয়যোগ অসংখ্য কোটী প্রকার, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নবচক্রে লয়সাধনা ব্যতীত সিদ্ধ যোগাচার্য্য মহাত্মগণ সমস্ত লয়-ক্রিয়াকে সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া সাধনার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

"শাম্ভব্যাচৈব ভ্রামর্য্যা খেচর্য্যা যোনিমুদ্রয়া।
ধ্যানং নাদং রসানন্দং লয়সিদ্ধিশ্চতুর্ব্বিধা॥"

১ম। শাম্ভবী-মুদ্রাদ্বারা ধান, ২য়। ভ্রামরী-কুম্ভক দ্বারা নাদ-শ্রবণ, ৩য়। খেচরী-মুদ্রা-সহযোগে রসাস্বাদন এবং ৪র্থ। যোনি-মুদ্রাদ্বারা আনন্দ-উপভোগরূপ চতুর্ব্বিধ লয়যোগ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

১ম। ধ্যান-লয় ঃ—

"শাম্ভবীং মুদ্রিকাং কৃত্বা আত্মপ্রত্যক্ষমানয়েৎ।
বিন্দুব্রহ্ম সকৃদ্দৃষ্ট্বা মনস্তত্র নিয়োজয়েৎ॥
খমধ্যে কুরুচাত্মানং আত্মমধ্যে চ খং কুরু।
আত্মানং খময়ং দৃষ্ট্বা ন কিঞ্চিদপি বাধ্যতে।
সদানন্দময়ো ভূত্বা সমাধিস্থো ভবেন্নরঃ॥"

খেচরী মুদ্রা অর্থাৎ নেত্রাঞ্জানে বা ভ্রূযুগলের মধ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া একান্তভাবে চিত্ত-স্থিরপূর্ব্বক আত্ম-প্রত্যক্ষ করিবে এবং কিছুক্ষণ সেই বিন্দু-ব্রহ্ম সন্দর্শন করিয়া তাহাতেই চিত্তলয় করিতে হইবে। পরে কিয়ৎক্ষণ শিরস্থিত ব্রহ্মলোকময় আকাশের মধ্যে জীবাত্মাকে এবং জীবাত্মার মধ্যে উক্ত ব্রহ্মলোকময় আকাশকে স্থাপন করিয়া, জীবাত্মাকে উক্ত আকাশময় দেখিয়া

অর্থাৎ উক্ত উভয় বস্তু বিন্দুতে পরিণত হইয়া একীভূত হইয়াছে, এইরূপ ধ্যান বা দর্শনপূর্ব্বক আত্মানন্দময় হইয়া সাধক সমাধিস্থ হইতে পারেন। ইহাকেই যোগিগণ ধ্যান-লয়-যোগ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

২য়। নাদ-লয় যোগ ঃ—

"অনিলং মন্দবেগেন ভ্রামরীকুম্ভকং চরেৎ।
মন্দং চ রেচয়েদ্বায়ুং ভৃঙ্গনাদং ততো ভবেৎ॥
অন্তঃস্থং ভ্রামরীনাদং শ্রুত্বা তত্র মনোলয়েৎ।
সমাধির্জ্জায়তে তত্র আনন্দঃ সোঽহমিত্যতঃ॥"

ভ্রামরী নামক কুম্ভকের অনুষ্ঠান দ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাসবায়ু রেচন করিবে অর্থাৎ মহানিশা বা অর্দ্ধরাত্রিকালে যোগী জীবগণের শব্দরহিত কোন একান্ত স্থানে উভয় কর্ণকুহরে উভয় হস্তদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, পূরক কুম্ভক ও রেচক-ক্রিয়া করিতে করিতে দক্ষিণ কর্ণের নিকট হইতে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার বা ভ্রমরের গুঞ্জন শব্দের ন্যায় শরীরাভ্যন্তরস্থ নাদ বা অনাহত-ধ্বনি শ্রুত হইবে। তখন অন্তরস্থ সেই অনাহত ভ্রামরী-নাদের সহিত সাধক মনোরূপী আত্মাকে লয় করিবে, তাহা হইলেই গুরূপদিষ্ট নাদ-লয়যোগ-সহ সমাধি সিদ্ধি হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নাদ অর্থে অনাহতধ্বনি। এই ধ্বনিতে চিত্ত লয়-প্রাপ্ত হয়। "সারদাতিলকে" শ্রীভগবান বলিয়াছেন ঃ—

শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ॥"

অর্থাৎ নাদ শব্দে প্রকৃতি-শক্তিকেও বুঝায়। সাধকের পিণ্ডমধ্যে জীবাত্মা বা জীবনী-শক্তিরূপে কুণ্ডলিনী-শক্তিই প্রকৃতি-শক্তি বলিয়া কথিত। সেই কুণ্ডলিনী-মহাশক্তি যতক্ষণ কুলকুণ্ডলিনী মহামায়ারূপ সহস্রারস্থিত পরম শিবে বা পরমাত্মায় লয়-প্রাপ্তা অর্থাৎ একীভূতা হইয়া না যান, ততক্ষণ সাধকের সেই নাদ বা অনাহতধ্বনির নিবৃত্তি হইবে না। যখন পূর্ব্বকথিতরূপে জীবাত্মা

পরমাত্মায় বিলীন হইবেন, তখনই সেই প্রকৃতি-শক্তিরূপে অনাহতধ্বনি পরব্রহ্মে লয় হইয়া যাইবে।

"ব্রহ্মরন্ধ্রে গতে বায়ৌ গিরিপ্রস্রবণং ভবেৎ।
শৃণোতি শ্রবণাতীতং নাদং মুক্তির্ন সংশয়ঃ॥"

ব্রহ্মরন্ধ্রে বায়ুরূপে জীবনীশক্তি সমুপস্থিত হইলেই পর্ব্বত-প্রস্রবণের ন্যায় শ্রবণাতীত অনাহত-নাদ-শব্দ অনুভূত হইতে থাকিবে। সেই নাদই যোগিবরের নিঃসন্দেহ মুক্তিপ্রদ বলিয়া যোগাচার্য্যগণ বর্ণন করিয়াছেন।

৩য়। রসাস্বাদন-লয়যোগ :—

"সাধয়েৎ খেচরীমুদ্রা রসনোর্দ্ধগতা যদা।
তদা সমাধিসিদ্ধিঃ স্যাদ্ধিত্বা সাধারণক্রিয়াম্॥"

খেচরী-মুদ্রার অনুষ্ঠান দ্বারা অর্থাৎ জিহ্বাকে ক্রমে ক্রমে তালুমধ্যে প্রবেশ করাইয়া ঊর্দ্ধদিকে উল্টাইয়া কপালকুহরে বা সুধাকূপ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া রাখিবে। তখন ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সুধাকূপস্থিত সুধাবিন্দুতে চিত্ত নিয়োজিত করিবে। তাহাতে লৌকিক সাধারণ ক্রিয়াসমূহ বিদূরিত হইয়া সাধকের রসাস্বাদন-লয়যোগ সিদ্ধিসহ সমাধি অবস্থা উপনীত হয়।

এই খেচরী-মুদ্রার অনুষ্ঠান-বিষয়ে "গুরুপ্রদীপেও" সংক্ষেপে কিছু বলা হইয়াছে। খেচরীমুদ্রা-বর্ণিত জিহ্বাদ্বারা সুধাকূপস্পর্শ করিবার জন্য হঠযোগ-শাস্ত্রে কথিত আছে যে, রসনার নিম্নস্থিত মাংসপেশী ধীরে ধীরে সুতীক্ষ্ণ নির্ম্মল অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিতে হইবে। প্রথমতঃ এক লোম পরিমাণ ছেদন করিবে। হরিতকী ও সৈন্ধব চূর্ণদ্বারা এই সময় জিহ্বা মার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। পুনরায় সপ্তম দিনে আর এক লোম পরিমাণ পূর্ব্বকথিতভাবে ছেদন করিবে, এইভাবে ক্রমাগত ছয়মাস জিহ্বার নিম্নপেশী ছেদিত হইলে জিহ্বা সুদীর্ঘ হইয়া কপালকুহরগামী হইতে পারে। এই ক্রিয়ায় জিহ্বা ও চিত্ত আকাশগামী হইয়া থাকে বলিয়াই

ইহার নাম খেচরীমুদ্রা।

শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে ঃ—

"তালুমূলগতাং যত্নাৎ জিহ্বয়াক্রম্য ঘণ্টিকাং
ঊর্দ্ধ্বরন্ধ্রগতে প্রাণে প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে॥"

জীহ্বা বিপরীতগামিনী করিয়া আলিজিহ্বা নিপীড়ন-সহকারে নিশ্চলবায়ু রোধ করিলেই বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করে ও সমাধি হয়।

"আকুঞ্চনমপানস্য প্রাণস্য চ নিরোধনম্।
লম্বিকোপরি জিহ্বায়াঃ স্থাপনং যোগসাধনম্॥"

অপান বায়ুর আকুঞ্চন, প্রাণ বায়ুর রোধ ও আলিজিহ্বার উপরি জিহ্বা স্থাপনই প্রধান যোগসাধন। এই খেচরী-মুদ্রার অভ্যাসে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, আলস্য, রোগ, জরা, জীর্ণতা দূর হয়। শরীর দেব-সদৃশ হয়। সুতরাং সহজে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয় না, বায়ুদ্বারা শুষ্ক হয় না এবং জলে ক্লিন্ন বা সর্পাদি কর্ত্তৃক দষ্ট হয় না। শরীরে অপূর্ব্ব লাবণ্য হয় এবং পরিণামে নিশ্চয়ই সমাধি হয়। এই সাধনায় রসনায় নানা রসের আস্বাদ অনুভব হইয়া থাকে। এই কারণ পূজ্যপাদ যোগাচার্য্যগণ ইহাকে রসাস্বাদন-লয়যোগ বলিয়া বর্ণন করেন।

৪র্থ। আনন্দোপভোগ-লয়যোগ ঃ—

"যোনিমুদ্রাং সমাসাদ্য স্বয়ং শক্তিময়ো ভবেৎ।
সুশৃঙ্গাররসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি॥
আনন্দময়ঃ সংভুত্বা ঐক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ।
অহং ব্রহ্মেতি বাদ্বৈতং সমাধিস্তেন জায়তে॥"

যোগিব্যক্তি আদৌ যোনিমুদ্রা অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ প্রথমতঃ পূরক দ্বারা মন বা চিত্তকে মূলাধারে স্থাপন করিতে হইবে। পরে গুহ্যদ্বার ও উপস্থের মধ্যস্থলে যে যোনিমণ্ডল আছে, তাহা আকুঞ্চনপূর্ব্বক কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগরিত করিয়া যোগ-সাধনে

নিয়োজিত হইবে। এই যোনিমণ্ডলকে ব্রহ্মযোনিও বলা যায়; ইহাতে বন্ধুক-পুষ্প-সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট কোটিসূর্য্যের ন্যায় তেজসম্পন্ন ও কোটিচন্দ্রের ন্যায় সুশীতল কন্দর্পবায়ু নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে। সেই বায়ুর মধ্যস্থলে সূক্ষ্ম শিখাস্বরূপা চৈতন্যরূপিনী পরমকলা কুণ্ডলিনী বা জীবনীশক্তি অবস্থিতা আছেন, তাহা জীবাত্মা-কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত ও একীভূতা হইয়াছেন অর্থাৎ যখন সাধক জীবাত্মাকে বা আপনাকে প্রকৃতি-বিন্দুরূপে চিন্তা করিয়া ক্রমে মূলাধার হইতে ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি, ও রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিয়া সুষুম্নান্তর্গত ব্রহ্মমার্গে গমন করিবেন, যখন আত্মময় কুলকুণ্ডলিনী বিন্দু, অকুল স্থানে বা সহস্রারে উপস্থিত হইবেন, তখন পরমাত্মাকে পুরুষ বা শিববিন্দুরূপ ভাবনা করিয়া প্রকৃতি-পুরুষরূপে আপনার সহিত পরমাত্মার শৃঙ্গার-রস নিমগ্ন বিহার বা সম্ভোগ-জনিত পরমানন্দে উভয় বিন্দুতে অভেদরূপে মিলিত বা একীভূত হইয়াছি অর্থাৎ 'অহং ব্রহ্মেতি' বা 'অদ্বৈতং' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ত্রিপুটী-লয় হইয়া সমাধির উপস্থিত হইবে। এস্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই লয়-ক্রিয়ার অনুষ্ঠেয় যোনিমুদ্রা বিভিন্ন যোগাচার্য্যগণ-কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপদিষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহার গুরুদত্ত যেরূপ উপদেশ, তিনি সেই ভাবেই কার্য্য করিতে পারেন। তাহাতে বিশেষ কোন দোষ হইবে না।

প্রকারান্তে যোনিমুদ্রা ঃ—

সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বারা কর্ণদ্বয়, তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা লোচনদ্বয়, মধ্যাঙ্গুল দ্বারা নাসিকাবিবরদ্বয় এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা অধরোষ্ঠ বা মুখবিবর রুদ্ধ করিয়া কাকীমুদ্রা দ্বারা প্রাণ বায়ুকে আকর্ষণপূর্ব্বক নাভিমণ্ডল সন্নিকটে মণিপুর নামক চক্রে অপান বায়ুর সহিত তাহাকে সংযোগ করিতে হইবে। অনন্তর তৎসাহায্যে ঘট বা দেহস্থিত পূর্ব্বোক্ত নবচক্রের মধ্যে মূলাধার হইতে সুষুপ্তা কুণ্ডলিনীরূপা জীবনীশক্তিকে "হুঁ হং

সঃ” মন্ত্রে জাগাইয়া জীবাত্মার সহিত ধীরে ধীরে প্রত্যেক চক্রে চিন্তা করিবার পর সহস্রদল কমলান্তর্গত অকুল-স্থানে আনয়ন করিতে হইবে। তখন সাধক আপনাকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে শক্তিময় বিন্দু চিন্তা করিয়া পরমশিবের সহিত সম্মিলিত করিয়া আপনাকে আনন্দময় ও পরম সুখী বলিয়া ভাবনা করিবে। এই যোনিমুদ্রাও অতি গোপনীয়। দেবতাদিগের পক্ষেও দুর্জ্ঞেয় বা দুর্লভ। এই মুদ্রাসহ লয়যোগ-ক্রিয়া অভ্যাস করিলে অনায়াসে সম্পূর্ণ সিদ্ধি হয় ও অবিলম্বে সমাধিস্থ হইতে পারা যায়।

ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার বলা হইয়াছে যে, লয়যোগ ক্রিয়ানুষ্ঠানের সীমা নাই। স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে যে কোন বস্তু অবলম্বন করিয়া লয়-ক্রিয়া সাধনা হইতে পারে। পূর্ব্ববর্ণিত লয়বিধান ব্যতীত আরও কয়েক প্রকার বিধি নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। পাঠকের স্মরণ আছে “গুরুপ্রদীপে” ভূতশুদ্ধির গুহ্য উপদেশসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই এই লয়যোগের প্রথম ও প্রধান অনুষ্ঠান। সমগ্র-যোগবিদ তন্ত্রাচার্য্য ও কুলগুরুবৃন্দ সেই কারণ তাহা প্রথম হইতেই মন্ত্রযোগের মধ্যে সন্নিবেশ করিয়া যোগসিদ্ধির অদ্ভুত বিধি-ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন ঃ—

“পঞ্চতত্ত্বাৎ ভবেৎ সৃষ্টিস্তত্ত্বে তত্ত্বং বিলীয়তে।”

অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব হইতেই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই তত্ত্বময় সমস্ত সৃষ্টিই পুনরায় তত্ত্ব-পঞ্চকে বিলীন হইয়া থাকে। সাধক সাধারণ ভাবে সে সময় স্থূল ভূতশুদ্ধির যে সাধনা সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই অনুরূপ সূক্ষ্মভূত অর্থাৎ সেই স্থূল ভূত-পঞ্চকের বিলয়াবশেষ তত্ত্ববিন্দু বা বীজ-পঞ্চক যাহা এক অন্যের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া আছে, তাহাও ধীরে ধীরে লয় করিতে হইবে। লয়ানুষ্ঠানের সূক্ষ্মতত্ত্ব লয়-বিষয়ে এস্থলে কিছু বলিতেছি। লয়-সাধনাভিলাষী যোগী সেই পূর্ব্বের ন্যায়ই সূক্ষ্মভূতশুদ্ধির দ্বারা মূলাধার হইতে পৃথ্বিতত্ত্ব, ক্রমে অন্যান্য তত্ত্ব, ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট চক্রে

লয় করিয়া বিশুদ্ধাখ্যচক্র হইতে "ব্যোমলয়", ক্রিয়া সাধন করিবে। ব্যোম বা আকাশের গুণ শব্দ ; তাহা লক্ষ্য করিয়াই ব্যোমলয়-সাধনা সম্পন্ন করিতে হয়। শব্দ উচ্চারণের প্রধান যন্ত্র কণ্ঠ, সেই কণ্ঠই ব্যোমভূমি, বিশুদ্ধাখ্য-চক্র-সমন্বিত। এই কারণ মূলাধার হইতে সমুত্থিতা কুণ্ডলিনী-শক্তি ধীরে ধীরে পৃথিব্যাদি সকল তত্ত্বের বীজভূতা হইয়া পরিশেষে বিশুদ্ধায় ব্যোমাত্মকরূপে উপনীত হইলে, সাধকের ব্যোম বা তদ্‌গুণস্বরূপ শব্দ-বিন্দুর সহিত আত্মার লয়যোগ সাধন করিতে হইবে। সকল শব্দের মূল বীজ বিন্দুগর্ভ প্রণব। প্রণব-সৃষ্টির বা প্রণব-বিকাশের অলৌকিক তত্ত্ব যাহা পরবর্ত্তী অংশে প্রণব-রহস্যমধ্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে পাঠক মনোযোগসহ আলোচনাপূর্ব্বক প্রণব বা ওঁকার-রূপ শব্দাত্মক ব্রহ্ম-বিন্দুকে ধ্যান করিয়া তাহাতে আত্মময় চিত্তকে লয় করিবেন, পরে সেই মন-চিত্ত ও শব্দের একীভূত আত্মবিন্দুকে ব্রহ্মস্থানে লইয়া পূর্ণভাবে বিলয় করিতে যত্নবান হইবেন। এই ভাবে সাধক যে কোনও তত্ত্ববিন্দু অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মবিন্দু-সহ আত্মবিলয়-রূপ তত্ত্বলয় বা সাধন করিতে সমর্থ হইলেই, সাধকের সমাধি-দশা উপস্থিত হইবে। অরণী-ক্রিয়োত্থিত শব্দব্রহ্মেরও এই প্রকারে লয়-সাধনা সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহা পূর্ব্বখণ্ডে যোগচতুষ্টয়ের সমাহার অংশে বলা হইয়াছে। পাঠক প্রয়োজন বোধ করিলে তাহাও দেখিয়া লইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত অজপালয়, চৈতন্যলয়, কূটস্থ-চৈতন্যলয়াদি বিবিধ ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে। সুবিজ্ঞ গুরুদেব শিষ্যের অবস্থা ও প্রয়োজন বোধে তাহাদের যথাযথ উপদেশ দিবেন।

লয়যোগ-সমাধি।

লয়যোগের নবম ক্রিয়া সমাধি। ইহাই এই যোগানুষ্ঠানের অন্তিম ক্রিয়া। যোগীর লয়ক্রিয়া সিদ্ধ হইলেই সমাধি আপনা আপনি উপস্থিত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন :—

"দত্তাত্রেয়াদিভিঃ পূর্ব্বং সাধিতোঽয়ং মহাত্মভিঃ।
রাজযোগো মনোবায়ুং স্থিরীকৃত্বা প্রযত্নতঃ॥"

দত্তাত্রেয়াদি যোগিশ্রেষ্ঠ মহাত্মগণ প্রাচীনকালে প্রথমে বায়ু ও মন স্থির করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বকথিতরূপ মন্ত্রমূলক হঠ ও লয়াদি যোগ সিদ্ধ হইয়া, পরে এই যোগশ্রেষ্ঠ রাজযোগের সাধনা করিয়াছিলেন। ইহার লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—

"সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং হেতুতা মনসি স্থিতা।
তৎসহায়াৎ সাধ্যতে যো রাজযোগ ইতি স্মৃত॥
অন্তঃকরণভেদাস্তু মনোবুদ্ধিরহঙ্কৃতিঃ।
চিত্তঞ্চেতি বিনির্দ্দিষ্টাশ্চত্বারো যোগপারগৈঃ॥
তদন্তঃকরণং দৃশ্যমাত্মা দ্রষ্টা নিগদ্যতে।
বিশ্বমেতত্তয়োঃ কার্য্যকারণত্বং সনাতনম্॥
দৃশ্যদ্রষ্ট্রোশ্চ সম্বন্ধাৎ সৃষ্টির্ভবতি শাশ্বতী।
চাঞ্চল্যং চিত্তবৃত্তীনাং হেতুমত্র বিদুর্বুধাঃ॥
বৃত্তীর্জিত্বা রাজযোগঃ স্বস্বরূপং প্রকাশয়েৎ।
বিচারবুদ্ধেঃ প্রাধান্যং রাজযোগস্য সাধনে॥
ব্রহ্মধ্যানং হি তদ্ধ্যানং সমাধির্নির্ব্বিকল্পকঃ।
তেনোপলব্ধিসিদ্ধির্হি জীবন্মুক্তঃ প্রকথ্যতে॥"

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, এই তিনের কারণ বা মূলীভূত উপাদান-বস্তু অন্তঃকরণ, তাহারই সহায়তাদ্বারা যে সাধন সম্পন্ন হয়, তাহাকেই 'রাজযোগ' বলে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার ইহাই অন্তঃকরণের চারি ভেদ। (১) অন্তঃকরণের যে ভাব বা অবস্থা এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে সতত প্রধাবিত হইতে থাকে, কোন এক লক্ষ্য-বস্তুর উপর যখন আদৌ স্থির থাকিতে পারে না, তখন অন্তঃকরণের সেই অবস্থাকে মন বলে। (২) যখন অন্তঃকরণ কোন এক লক্ষ্য-বিষয়ে স্থির থাকিয়া জ্ঞানের সহায়তায় সৎ বা অসৎ বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার ঐ প্রকাশবান স্থির অবস্থাকে

বলে। (৩) অন্তঃকরণের যে অবস্থা মন ও বুদ্ধিদ্বারা কৃত-কর্ম্মের স্মরণ রাখে, অর্থাৎ যাহাতে জীবের প্রত্যেক কৃতকর্ম্মের সংস্কার রহিয়া যায়, তাহারই নাম চিত্ত। স্মৃতিও চিত্তের অংশ-মাত্র। কারণ চিত্তেই সকল কর্ম্মের সংস্কার থাকে এবং তাহার এতদূর শক্তি যে, জীবের লোকান্তর-প্রাপ্তি হইলেও জন্মার্জ্জিত সংস্কাররূপে তাহা বিদ্যমান থাকে। (৪) অহঙ্কার অন্তঃকরণের এমন এক ভাব, যাহাতে সে আপনাকে এক স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মানিয়া লয়। এই অহঙ্কার আবার ত্রিগুণ-ভেদে ছয় প্রকার, অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণের প্রত্যেকের দুইটী করিয়া অহঙ্কার আছে। তামসিক অহঙ্কার—অতি নিম্ন শ্রেণীর, তাহা কেবল রূপ ও গুণময়। স্থূল দৈহিক রূপ ও তদাত্মক গুণই তাহার স্বরূপ। আমি রূপবান, আমার এমন রূপ, আমি গুণবান্ আমার এতগুণ, এই অহঙ্কারের সেবায় জীব ঈশ্বরকে ভুলিয়া ক্রমেই নিম্নগামী হইয়া থাকে। রাজসিক অহঙ্কার—জ্ঞান ও শক্তিময়, সুতরাং তাহা মধ্য-শ্রেণীর বলিতে হইবে। আমি জ্ঞানী আমি শক্তিশালী। এই উভয়বিধ অহঙ্কারে জীব তাহার স্থূল দৈহিক রূপ ছাড়িয়া কিছু অন্তরের দিকে কোন সূক্ষ্ম ও অসাধারণ সামর্থ্যযুক্ত জ্ঞান ও শক্তির আশ্রিত বলিয়া নিজেকে মনে করে, এই কারণ জীব আর তাঁহাকে ভুলিয়া নিম্নগামী হইতে ত পারেই না, বরং এই উভয় ভাবে জীবকে উন্নত করিয়াই তুলে। সাত্ত্বিক অহঙ্কার—মুক্তি ও ব্রহ্মময়। ইহাই যে উত্তম শ্রেণীর অহঙ্কার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমি মুক্ত পুরুষ, আমিই সেই ব্রহ্ম-স্বরূপ; এইরূপ ভাবে জীব জীবন্মুক্তির পথে অগ্রসর হন। যখন এ অহঙ্কারও নাশ হয়, তখনই জীব সেই অনির্ব্বচনীয় কৈবল্য-মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহা হউক, সাত্ত্বিক অহ-ঙ্কারে ব্রহ্মেই পূর্ণ লক্ষ্য বর্ত্তমান থাকে, রাজসিকে লক্ষ্যচ্যুত হইলেও সৎকর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তামসিকে তাহাও

থাকে না—অবিদ্যাশ্রিত আমিই বদ্ধ-জীব স্থূলরূপের অহঙ্কারে সংবাসনাটুকু পর্য্যন্ত বর্জ্জিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। অন্তঃকরণে এইরূপ অহং-তত্ত্ব উৎপত্তির কারণ, জীবের চৈতন্য অবিদ্যা-প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া যায়। এই অহঙ্কার সকল সময়েই অন্তঃকরণে বর্ত্তমান থাকে। এই হেতু অন্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে সর্ব্বদা বিভিন্ন ক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কাররূপী অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য-প্রভাব জন্য পূর্ণ জ্ঞানরূপ চৈতন্য আপনার স্বরূপের অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। যখন সাধক যোগ-সাধন-দ্বারা অন্তঃকরণের এই সমুদায় বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিতে পারেন অর্থাৎ এই চারি ভাবের এক ভাবও যখন আর বিদ্যমান থাকে না, তখনই অন্তঃকরণ দৃশ্য ও আত্মা দ্রষ্টারূপে পরিণত হন। সাধক, লয়যোগ পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের চতুর্ব্বিধ বৃত্তির মধ্যে প্রধানতঃ মনটীকে লইয়াই সাধন করিয়াছ, অর্থাৎ তাহার সেই উদ্দাম চঞ্চল ভাবটীকে স্থির করিয়া জীবাত্মাসহ একীভূত করিয়াছিলে, এই রাজযোগের সাধনায় চিত্তবৃত্তিরই সূক্ষ্মতর চাঞ্চল্য-হেতু অন্তঃকরণরূপী কারণ-দৃশ্যের সহিত জগৎরূপী কার্য্য-দৃশ্যের যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, অর্থাৎ দৃশ্যে দ্রষ্টার সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার কারণ যাহাতে অহরহঃ কর্ম্মসমূহের সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে, অন্তঃকরণের সেই বৃত্তিগুলিকে যে অভিনব যোগ-ক্রিয়া-দ্বারা জয় করিয়া স্ব-স্বরূপের প্রকাশ অনুভব করিতে পারা যায়, তাহাকেই রাজযোগ কহে। এই রাজযোগ-সাধনায় বিচার-বুদ্ধিকেই প্রধান করিয়া কার্য্য করিতে হয়। বিচার-বুদ্ধির পূর্ণতাদ্বারা রাজযোগের সাধনা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। এই রাজ-যোগকেই ব্রহ্মধ্যানের অবলম্বন করিয়া সাধক নির্ব্বিকল্প-সমাধি প্রাপ্ত হইতে পারেন। রাজযোগ সিদ্ধ মহাত্মাই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্ববরণ্যে হইয়া থাকেন। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে :—

"পূর্ব্বাভ্যস্তৌ মনোবাতৌ মূলাধারনিকুঞ্চনাৎ।

পশ্চিমং দণ্ডমার্গন্তু শঙ্খিন্যন্তঃ প্রবেশয়েৎ ॥
গ্রন্থিত্রয়ং ভেদয়িত্বা নীত্বা ভ্রমরকন্দরং ।
ততস্তু নাদয়েদ্‌বিন্দুং ততঃ শূন্যালয়ং ব্রজেৎ ॥”

সাধক মন্ত্র-হঠাদি পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ যোগের সমন্বয়ভূত সাধনা-দ্বারা মূলাধার আকুঞ্চন পূর্ব্বক মনাত্মক প্রাণবায়ুকে পশ্চিম অর্থাৎ পশ্চাৎদিকস্থিত দণ্ডমার্গে অবস্থিত শঙ্খিনী নাড়ীর অ্যভন্তরে প্রবেশ করাইবে। পরে গ্রন্থিত্রয় (নাভিমূলে বা মণিপুরে ব্রহ্ম-গ্রন্থি, হৃদয়ে বা অনাহতে বিষ্ণুগ্রন্থি এবং ললাটে বা আজ্ঞাচক্রে রুদ্রগ্রন্থি) ভেদ করিয়া ভ্রমরকন্দর অর্থাৎ সহস্রার-কমলে উপনীত হইবে, তথায় বিন্দুস্থান হইতে নাদ বা শব্দ-ব্রহ্মরূপী অবিচ্ছেদ প্রণবধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে শূন্যালয়ে গমন করিবে অর্থাৎ ঘটাকাশ মহাকাশে মিশাইয়া দিতে যত্নবান হইবে। ইহাই রাজযোগের প্রধান স্থূল অনুষ্ঠান। ইহা কতকটা লয়যোগের অন্তিম সাধনা, তাহা যোগানুরাগী পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। তবে চিত্তাদির বৃত্তি এই ভাবে নিবৃত্তি করিয়া জ্ঞানালোচনায় অধিকতর অগ্রসর হওয়াই রাজযোগের প্রাথমিক প্রক্রিয়া। তন্ত্রান্তরে রাজযোগ-বর্ণন-স্থানে উক্ত আছে যে, মূলা-ধারস্থিত বিষতন্তুসদৃশী অতি সূক্ষ্মাকৃতি প্রসুপ্তা অর্থাৎ নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীকে গুপ্ত-সাধন-প্রক্রিয়া-বলে জাগরিত করিয়া সুষুম্না-নালমধ্যে প্রবেশ করাইয়া চক্রগুলি যথাক্রমে ভেদ-করণানন্তর সহস্রদল-কমলান্তর্গত শশাঙ্কসদৃশ নির্ম্মলকান্তি পরমাত্মা পরমশিবের সহিত সংযুক্ত করিবে। তৎপরে শিব-শক্তি-যোগে যে সুধাক্ষরণ হইবে, সেই সুধাদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হইতেছে, এইরূপ ভাবাপন্ন হইয়া থাকিবে। ইহার পর আর কিছুই চিন্তা করিবে না। তাহা হইলে নিস্তরঙ্গিনী নদী বা নির্ব্বাত জলাশয়ের ন্যায় নিশ্চলা সমাধি উৎপন্ন হইবে। এইরূপ নিরন্তর অভ্যাস করিলেই রাজ-যোগ সিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা যোগিগণ স্থিরান্তঃকরণে শান্ত,

ঊর্দ্ধরেতা, জরামরণবর্জ্জিত এবং পরমানন্দময় জীবন্মুক্ত মহা-পুরুষ হইতে পারেন।

শ্রীসদাশিব মহাপূর্ণ দীক্ষাধিকারে রাজযোগের সাধনা-বিষয়ে যাহা তন্ত্রান্তরে বর্ণন করিয়াছেন, সাধকবৃন্দের অবগতির কারণ তাহাও এস্থলে বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতেছি।

"শিরঃকপালবিবরে ধ্যায়েৎ দুগ্ধমহোদধিম্।
অত্র স্থিত্বা সহস্রারে পদ্মে চন্দ্রং বিচিন্তয়েৎ॥
শিরঃকপালবিবরে দ্বিরষ্টকলয়া যুতঃ।
পীযূষভানুং হংসাখ্যং ভাবয়েত্তং নিরঞ্জনম্॥
নিরন্তর কৃতাভ্যাসাৎ ত্রিদিনে পশ্যতি ধ্রুবম্।
দৃষ্টিমাত্রেণ পাপৌঘং দহত্যেব স সাধকঃ॥"

ব্রহ্মকপালবিবরে বা ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্যে প্রথমতঃ দুগ্ধ-মহাসমুদ্র চিন্তা করিতে হইবে। পরে সেই স্থানে থাকিয়া অর্থাৎ লয়-যোগানুষ্ঠানের দ্বারা সেইস্থানেই জীবাত্মাকে স্থিরতর করিয়া সহস্র-দল-কমলের অধঃস্থিত চন্দ্রমণ্ডল স্মরণ করিতে হইবে। ব্রহ্মরন্ধ্র-মধ্যে ষোড়শকলা-যুক্ত সুধারশ্মি-বিশিষ্ট বা অমৃতবর্ষী যে চন্দ্র আছে তাহা হংসঃ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এই নিরঞ্জন হংসের সদা ধ্যান করিতে হইবে। সর্ব্বদা এই ধ্যান-যোগ অভ্যাস করিলে, দিবসত্রয়ের মধ্যেই সেই নিরঞ্জনের সাক্ষাৎ লাভ হয়, ইহাতে সংশয়মাত্র নাই। এই দর্শনেই সাধকের সকল পাপ বিদূরিত হইয়া তিনি মুক্ত হইতে পারেন।

সহস্রদল-কমলান্তর্গত চন্দ্রমণ্ডল-সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ-স্থলে শ্রীভগবান বলিয়াছেনঃ—"আজ্ঞাচক্রের বিপরীত দিকে কিঞ্চিৎ উপরে মনশ্চক্র নামে একটী গুপ্তচক্র আছে। তাহা ষড়্‌দলযুক্ত পদ্মের অনুরূপ। তাহার ছয়টী দলের এক একটীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের পঞ্চজ্ঞান এবং স্বপ্নরূপ ছয়টী বৃত্তি যথাক্রমে বিদ্যমান আছে। "গুরুপ্রদীপে" ষট্‌চক্র-বর্ণন-সময়ে তাহা বলা

হইয়াছে, সাধনার্থী পাঠকের তাহা নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। যদি না থাকে, সেই অংশ আর একবার দেখিয়া লইবেন ; এস্থলে তাহা পুনরায় সংক্ষেপে বলা হইতেছে। উক্ত মনশ্চক্রের কিঞ্চিৎ উপরে ব্রহ্মরন্ধ্র-মুখের সামান্য নিম্ন অংশে সোমচক্র নামে আর একটী গুপ্তচক্র আছে, রাজযোগ-বর্ণনায় শ্রীভগবান তাহাকেই চন্দ্র-মণ্ডল বলিয়াছেন, ইহাও ষোড়শদল কমলের অনুরূপ। শাস্ত্রে এই ষোড়শদলকে চন্দ্রের ষোড়শকলা বলিয়াছেন এবং সেই কলা-ষোড়শের ভিন্ন ভিন্ন ষোলটী নাম বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :— ১ম। কৃশা, ২য়। মৃদুতা, ৩য়। ধৈর্য্য, ৪র্থ। বৈরাগ্য, ৫ম। ধৃতি, ৬ষ্ঠ। সম্পৎ, ৭ম। হাস্য, ৮ম। রোমাঞ্চ, ৯ম। বিনয়, ১০ম। ধ্যান, ১১শ। সুস্থিরতা, ১২শ। গাম্ভীর্য্য, ১৩শ। উদ্যম, ১৪শ। অক্ষোভ, ১৫শ। ঔদার্য্য এবং ১৬শ। একাগ্রতা। সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে যে অপূর্ব্ব মার্গ আছে, তাহা ত্রিকোণাকার, এই ত্রিকোণ-পথই ব্রহ্মরন্ধ্র বিবর শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ত্রিকোণ ব্রহ্ম-মার্গ-মধ্যেই সোমচক্র বা চন্দ্রমণ্ডল অবস্থিত রহিয়াছে ও ষট্‌চক্র-ভেদের সময়েও এই গুপ্তচক্র ভেদ করিয়া যাইতে হয়। এই সোমচক্রের মধ্যেই হংসঃ-পীঠ। কোন কোন তন্ত্রে ইহার উপরেই নিরালম্বপুরী বলা হইয়াছে। ঋষিগণ এই নিরালম্বপুরী-তেই জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর সাক্ষাৎ করেন। এই পুরীর উপরিভাগে দীপশিখাসদৃশ জ্যোতির্ম্ময় প্রণব রহিয়াছেন। ইহার উপরেই শ্বেতবর্ণ নাদ, তদুপরি বিন্দু, অনন্তর কলা ও কলাতীত-রূপের স্থূল আভাস অনন্ত গগনাত্মক ছত্রাকারে অধোমুখ সহস্রদল-কমল এবং তদন্তর্গত ঊর্দ্ধমুখ একটী দ্বাদশদল-কমল অবস্থিত আছে। এই শেষোক্ত পদ্ম শ্বেতবর্ণ, ইহার কর্ণিকায় বিদ্যুৎ-সদৃশ অক-থাদি ত্রিকোণ-মণ্ডল ও ত্রিকোণ-রেখা রহিয়াছে। ইহার মধ্য-স্থলেই সুষুম্না নাড়ীর শেষসীমা বা নানাবর্ণময় সহস্রদল-কমল ইহা-রই উপর ছত্রাকারে বিরাজিত। সহস্রদলের ক্রোড়ে উক্ত দ্বাদশ-

দল-কমলের উপরেই পরমশিবের স্থান। কুণ্ডলিনীরূপা জীবনী-শক্তিকে উত্থাপন করিয়া এই পরমশিবের সহিত সংযুক্ত করিতে হয়। পরমশিব আকাশরূপী অনন্ত, ইনিই পরমাত্মা, অজ্ঞান তিমিরের সূর্য্য-স্বরূপ। এই স্থানকে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন নামে বলিয়াছেন। শিবস্থান, পরমপুরুষস্থান, হরিহরস্থান, পরব্রহ্ম, পরমহংস, পরমজ্যোতিঃ, পরমদেবী, কামকলা, প্রকৃতি-পুরুষের স্থান, কুলস্থান ও অকুলস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে হঠযোগের গুরুধ্যানের সময়েও এই স্থান সম্বন্ধে কিছু বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক পাঠক, এই চন্দ্রমণ্ডলান্তর্গত চন্দ্র বা হংস-নিরঞ্জন ধ্যান করিলে, রাজযোগ-সমাধির স্ফুরণ হয় ও চিত্তশুদ্ধি হয়। ইহাদ্বারাই অনায়াসে খেচরী ও ভূচরী আদি সিদ্ধির ফল সম্পূর্ণ রাজযোগ-সিদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। অধিক কি, এই সাধনাদ্বারাই সাধক আমার (শিবের) সদৃশ হইতে পারেন। ইহা অতি সত্য কথা। যোগশাস্ত্রের মধ্যে ইহা যোগীদিগের অতীব সন্তোষজনক ও আশু-সিদ্ধি-প্রদ। শ্রীসদাশিব তাই পুনঃ বলিয়াছেন :—

"সততাভ্যাসযোগেন সিদ্ধো ভবতি নান্যথা ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং মম তুল্যো ভবেৎ ধ্রুবম্।
যোগশাস্ত্রেঽপ্যভিরতং যোগিনাং সিদ্ধিদায়কম্ ॥"

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মরন্ধ্র বা ব্রহ্মপথের উর্দ্ধদেশস্থিত কমল, কৈলাস বলিয়াও খ্যাত। এইস্থলে ক্ষয়-বৃদ্ধি-বিরহিত পরিণামশূন্য অবিনাশী পরমশিব দেবাদিদেব মহেশ অবস্থান করিতেছেন। ইনি অকুল বা নকুল নামেও বর্ণিত হইয়াছেন। রাজযোগী নিরন্তর এই অকুল-স্থান জ্ঞানযোগে ধ্যান করিবেন। তাহা হইলে ভূতগ্রামের সৃষ্টি ও সংহার করিতেও সমর্থ হইবেন। এই হংস-নিবাস-ভূত পরম-শিবস্থানে বা কৈলাস নামক পরমধামে যে যোগী চিত্তসন্নিবেশ করেন, তাঁহার অচিরে সমুদায় চিত্তবৃত্তি অকুল নামক পরমশিবে

বিলীন হইয়া যায়। তখনই যোগী সমাধিস্থ হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করেন। অতএব রাজযোগী নিত্য-নিরন্তর এই অকুলস্থান ধ্যান করিবেন। তাহা হইলে সমুদায় নশ্বর জগৎ, সাধকের হৃদয় হইতে বিস্মৃত হইয়া যাইবে। এই যোগবলে তাঁহার অত্যদ্ভুত ক্ষমতা হইবে ও উক্ত কমল-নিসৃত অমৃতধারা পান করিয়া মৃত্যুরও মৃত্যুবিধান করিতে পারিবেন। এই সময় সহস্রারে সমাগতা কুলনামা কুণ্ডলিনী বা কুলকুণ্ডলিনী অকুল নামে অভিহিত পরম-শিবকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ংই তাহাতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে বিলীনা হইয়া থাকেন। তখনই সেই পরমশিবে তদনুবর্ত্তিনী চতুর্ব্বিধা সৃষ্টি * অর্থাৎ যৌগিকী বা আরম্ভ-সৃষ্টি, পরিণাম-সৃষ্টি, মানসী বা বিবর্ত্ত-সৃষ্টি এবং অদৃষ্ট-সৃষ্টি লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। শ্রীসদাশিব "শিবসংহিতায়" এই কথাই ইঙ্গিতে বলিয়াছেন ঃ—

"অত্র কুণ্ডলিনী শক্তির্লয়ং যাতি কুলাভিধা।
তদা চতুর্ব্বিধা সৃষ্টির্লীয়তে পরমাত্মনি॥"

অর্থাৎ এই স্থানে কুণ্ডলিনী-শক্তিসহ তদনুবর্ত্তিনী চারি প্রকার সৃষ্টিও পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়। জীবের আর কোনরূপে পুনরাগমন বৃত্তি থাকে না। অতএব সাধক এই সময়েই যথার্থ জীবন্মুক্ত হইতে পারেন। এই কারণ সতত এই অকুল ধ্যান করিলে অন্তঃকরণের চিত্তবৃত্তি বাহ্যবিষয় সমুদায় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া এই পরম ধ্যানেই লয়প্রাপ্ত হয়, তখনই সাধক অখণ্ড জ্ঞানময় নিরঞ্জনকে অবগত হইতে পারেন বা তৎকালে যোগী স্বয়ংই ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া বিরাজমান থাকেন।

রাজযোগের এই ধ্যান ও সমাধি-বিষয়ে শ্রীসদাশিব আরও বলিয়াছেন যে ঃ—

"ব্রহ্মাণ্ডবাহ্যে সংচিন্ত্য স্বপ্রতীকং যথোদিতম্।
তমাবেশ্য মহচ্ছূন্যং চিন্তয়েদবিরোধতঃ॥

* চতুর্ব্বিধা সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে পঞ্চমোল্লাসে দেখ।

আদ্যন্তমধ্যশূন্যন্তৎ কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্।
চন্দ্রকোটিপ্রতিকাশমভ্যস্য সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ॥
এতদ্ধ্যানং সদা কুর্য্যাদনালস্যং দিনে দিনে।
তস্য স্যাৎ সকলা সিদ্ধির্ব্বৎসরান্নাত্র সংশয়ঃ॥"

পূর্ব্ববর্ণিত ষট্চক্র অতিক্রমপূর্ব্বক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড-বাহ্যে যথোক্ত স্বপ্রতীক চিন্তা করিবে অর্থাৎ এরূপ ভাবনা করিতে হইবে যে, ব্রহ্মাণ্ড বা বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড নাই এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বা আমার শরীরও নাই কেবল মাত্র ছায়া-শরীর আছে, পরে সেই শূন্যময় ছায়া-শরীর আশ্রয় করিয়া এমন ভাবে মহাশূন্য চিন্তা করিবে যে, কোন স্থলেই যেন সেই মহাশূন্যের বাধা বা বিরোধ নাই, তাহার আদি শূন্য, অন্ত শূন্য ও মধ্যও শূন্য, অথচ কোটিসূর্য্যসদৃশ প্রভাত সম্পন্ন ও কোটিচন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ প্রতীয়মান পরমব্যোম ধ্যান করিলে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়। যিনি নিরলস হইয়া নিত্য নিয়মপূর্ব্বক এই ধ্যান করেন সম্বৎসরের মধ্যে তাঁহার সিদ্ধিলাভ হয়।

"ক্ষণার্দ্ধং নিশ্চলং তত্র মনো যস্য ভবেদ্ধ্রুবম্।
স এব যোগী মদ্ভক্তঃ (সদ্ভক্তঃ) সর্ব্বলোকেষু পূজিতঃ॥"

ক্ষণার্দ্ধমাত্রও যাঁহার মন এই ধ্যানবিষয়ে নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে, তিনিই যোগী, তিনিই আমার ভক্ত বা তিনিই প্রকৃত ভক্ত এবং তিনিই সর্ব্বলোকে পূজিত হইয়া থাকেন। তাঁহার আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না। অতএব সাধকের স্বাধিষ্ঠান-পথ অবলম্বন করিয়া যত্নসহকারে এই ধ্যান অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—এই ধ্যানের মাহাত্ম্য আমিও সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন করিতে অসমর্থ। যিনি ইহা সাধন করেন তিনিই জ্ঞাত হইতে পারেন, আমিও তাদৃশ ব্যক্তিকে সম্মানিত করিয়া থাকি।

"এতদ্ধ্যানস্য মাহাত্ম্যং ময়া বক্তুং ন শক্যতে।

যঃ সাধয়তি জানাতি সোঽস্মাকমপি সম্মতঃ ॥"

অতঃপর শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"রাজযোগো ময়াখ্যাতঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতঃ ॥"

অর্থাৎ সকল তন্ত্রের মধ্যেই সুগুপ্ত এই রাজযোগ বিষয়ে বর্ণন করিলাম।

পরমপূজ্য যোগাচার্য্য শ্রীমদ্ ঘেরণ্ডদেব রাজযোগের সমাধি-বিষয়ে বলিয়াছেন :—

"মনোমূর্চ্ছাং সমাসাদ্য মন আত্মনি যোজয়েৎ।
পরাত্মনঃ সমাযোগাৎ সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ ॥"

মনোমূর্চ্ছানামক কুম্ভকের অনুষ্ঠানদ্বারা মনকে পরমাত্মার সহিত একীভূত করিতে হইবে। এই প্রকার পরমাত্মার সংযোগ-বশতঃই সমাধি-সিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহাই রাজযোগের সমাধি বলিয়া অভিহিত। রাজযোগ-সমাধি, উন্মনী, সহজাবস্থা প্রভৃতি যে কোনরূপ যোগ হউক না, সমস্তই একমাত্র আত্মলক্ষ্য করিয়া সাধিত হয়। ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ড সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, এই প্রকার চিন্তা করিতে হইবে। আত্মবিৎ ব্যক্তি তাহা হইলে সমস্তই আত্মাতে পরিদর্শন করিতে পারেন। পরমাত্মা ও ঘটস্থ আত্মা বা জীবাত্মায় কোনও ভেদ নাই, যিনি আত্মাকে এই দেহ হইতে পৃথকরূপে জানিতে পারেন, তাঁহার সংসার-অনুরাগ ও বাসনা বিগত হয়। সর্ব্বসঙ্কল্প-বিবর্জ্জিত হইয়াই এই সমাধি-সাধনা করা কর্ত্তব্য। স্বীয় দেহ, পুত্র, দারা, বান্ধব ও ধনাদি সমস্ত পদার্থের মমতা রহিত হইয়া এই সমাধির অনুষ্ঠান করিবে। শ্রীসদাশিব "লয়ামৃত" আদি তন্ত্রে নানাবিধ গোপনীয় তত্ত্ব বর্ণন করিয়াছেন ; তাহা হইতেই সার-সংগ্রহ করিয়া এই পরমদুর্লভ রাজযোগ ও সমাধি-মুক্তির লক্ষণ বর্ণন করিলাম, ইহা বিদিত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যথা :—

"তত্ত্বং লয়ামৃতং গোপ্যং শিবোক্তং বিবিধানি চ।
তাসাং সংক্ষেপমাদায় কথিতং মুক্তিলক্ষণম্ ॥

ইতি তে কথিতং চণ্ড ! সমাধিদুর্লভঃ পরঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্জ্জন্ম জায়তে ভুবিমণ্ডলে।"

রাজ ও রাজাধি-রাজযোগ সমন্বয়

রাজযোগের এই সকল পদ্ধতি দেখিয়া সকলেরই সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, পূর্ব্ব-পূর্ব্বানুষ্ঠিত যোগক্রিয়ার সিদ্ধির ফলেই ইহা উন্নত সাধকযোগিগণের সুসাধ্য হইয়া থাকে। সুতরাং ভগবান শ্রীপতঞ্জলি-নির্দ্দিষ্ট অষ্টাঙ্গ যোগ-সূত্রানুযায়ী কার্য্যাবলী যে সর্ব্ব-প্রকার যোগেরই ভিত্তিস্বরূপ, তাহা বলাই বাহুল্য। এই কারণ রাজযোগেরও সাধনভেদে যমাদি-ক্রিয়ার উপদেশ যাহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যোগাভিলাষী সাধকের অবগতির জন্য এইবার তাহাই বর্ণন করিব।

ষোড়শাঙ্গ মন্ত্রযোগ, সপ্তমাঙ্গ হঠযোগ ও নবাঙ্গ লয়যোগের ন্যায় রাজযোগও যে ষোড়শাঙ্গ-বিশিষ্ট, যোগশাস্ত্রে তাহারও বিশেষ নির্দ্দেশ আছে। তাহাও মূল যোগসূত্রের কথিত যমাদি অষ্টবিধ সাধারণ যোগাঙ্গেরই অনুরূপ। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাজযোগের সাধন-ক্রিয়া কেবল অন্তঃকরণের দ্বারা সূক্ষ্মতর-রূপে হইবার কারণ স্থূল শারীরিক বা সূক্ষ্ম প্রাণাদি বায়ু-সম্বন্ধীয় কোন প্রকার কার্য্য নাই অর্থাৎ মন্ত্র, হঠ ও লয়যোগ-নির্দ্দিষ্ট যথাক্রম সাধনাবলীর দ্বারা চিত্তবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্তি-দশা প্রাপ্ত হইলেই সূক্ষ্ম অন্তঃকরণসম্ভূত রাজযোগাঙ্গের অতীব সূক্ষ্ম ও বিচিত্র ক্রিয়াবলীর অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। এইস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, রাজযোগ ও রাজাধিরাজযোগের মধ্যে এতই সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে যে, যাহা উন্নততম যোগসিদ্ধির অবস্থা ব্যতীত সাধারণভাবে কেহই ঠিক অনুভব করিতে পারিবে না। সেই কারণ এতদুভয়ের সমন্বয় ক্রিয়া-পদ্ধতি যথাক্রমে আলোচনা করা যাইবে। যোগী সাধক তাহা অনায়াসে যথাসময়ে আপনাআপনি বিশ্লেষণ করিয়া লইতে পারিবেন। প্রকৃত কথা

এই যে, রাজযোগের পূর্ণ সমাধির ভাবেই শম্ভুশাস্ত্রে রাজাধিরাজ-যোগ বলা হইয়াছে। যাহা হউক, যোগের মূলসূত্রাস্বরূপ এই অন্তিম যোগেরও নিয়মাদির যেরূপ নির্দ্দেশ আছে, পাঠকের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা যথাযথভাবে বর্ণিত হইতেছে।

যোগসংহিতায় শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন :—

রাজযোগের ষোড়শাঙ্গ

"জ্ঞানলাভো হি শাস্ত্রাণাং শ্রবণান্মননাত্তথা।
যমো হি নিয়ম স্ত্যাগো মৌনং দেশশ্চ কালকঃ॥
আসনং মূলবন্ধশ্চ দেহসাম্যং চ দৃক্স্থিতিঃ॥
প্রাণসংযমনং চৈব প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
আত্মধ্যানং সমাধিশ্চ প্রোক্তান্যঙ্গানি বৈ ক্রমাৎ॥

১। শাস্ত্রের জ্ঞান লাভই শ্রবণ ও মনন; ২। যম, ৩। নিয়ম, ৪। ত্যাগ, ৫। মৌন, ৬। দেশ, ৭। কাল, ৮। আসন, ৯। মূলবন্ধ, ১০। দেহসাম্য, ১১। দৃকস্থিতি, ১২। প্রাণসংযম, ১৩। প্রত্যাহার, ১৪। ধারণা, ১৫। আত্মধ্যান ও ১৬। সমাধি, রাজযোগের এই ষোল প্রকার অঙ্গ।

১ম। (ক) শাস্ত্রজ্ঞান, (খ) শ্রবণ ও (গ) মননাদি :—

(ক) বেদ-তন্ত্রাদি আধ্যাত্মিক-শাস্ত্রসমূহের আলোচনা তথা শ্রবণ মননাদি-সহকারে যাবতীয় বিকারময় দৃশ্য পদার্থের নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া তত্তৎ বস্তুর বাহ্যাভ্যন্তরস্থিত একমাত্র সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য ব্যতীত আর কিছুমাত্র সত্য পদার্থ নাই, এইরূপ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তুর অনুভবাত্মক যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-জ্ঞান, তাহারই নাম শাস্ত্রজ্ঞান।

(খ) শ্রবন-সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশ এই যে, নিম্নলিখিত ছয় প্রকার লিঙ্গ বা উহার দ্বারা প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয়-ব্রহ্ম-বস্তুতে সমস্ত বেদান্তাদি জ্ঞানতন্ত্রের তাৎপর্য্য-নিরূপণের নাম শ্রবণ।

(১) উপক্রমোপসংহার :—অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বস্তুর আদিতে ও অন্তে সেই বস্তুরই প্রতিপাদন করা। (২) অভ্যাস:—অর্থাৎ যে

প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য সেই প্রকরণের মধ্যে সেই বস্তুকে পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদন করা। (৩) অপূর্ব্বতা—অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রমাণাতিরিক্ত প্রমাণের অবিষয়রূপে সেই বস্তুর প্রতিপাদনের নাম অপূর্ব্বতা। (৪) ফল—প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রয়োজন শ্রবণের নাম ফল। (৫) অর্থবাদ—প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রশংসা শ্রবণের নাম অর্থবাদ। (৬) উপপত্তি—প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রতিপাদনের যুক্তির নাম উপপত্তি।

(গ) মনন সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশ এই যে, বেদান্তাদি আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের অবিরোধ যুক্তিদ্বারা সর্ব্বদা শ্রুত অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু চিন্তনের নাম মনন।

(ঘ) নিদিধ্যাসন সম্বন্ধে উপদেশ এই যে, তত্ত্বজ্ঞান-বিরোধী দেহাদি জড়পদার্থের জ্ঞান পরিহারপূর্ব্বক অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর অবিরোধী জ্ঞান-প্রবাহকে নিদিধ্যাসন বলে।

এই সমুদায়ই ষোড়শাঙ্গ-রাজযোগের শাস্ত্রজ্ঞানরূপ প্রথম অঙ্গ। *

২। যম :—

সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাদিন্দ্রিয়গ্রামসংযমঃ।
যমোঽয়মিতি সম্প্রোক্তোঽভ্যাসনীয়ো মুহুর্ম্মুহুঃ॥

সমস্ত জগতই ব্রহ্মস্বরূপ ইহাই জানিয়া ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম করিতে হয়। ইহাকেই রাজযোগের যম বলে, সাধকের নিরন্তর এই যম অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

৩য়। নিয়ম :—

"স্বজাতীয় প্রবাহশ্চ বিজাতীয় তিরস্কৃতিঃ।
নিয়মো হি পরানন্দো নিয়মাৎ ক্রিয়তে বুধৈঃ॥"

স্বজাতীয় প্রবাহ ও বিজাতীয় তিরস্কৃতি অর্থাৎ চেতনরূপী সত্তা-

* পরবর্ত্তী পঞ্চমোল্লাসে জ্ঞানতত্ত্ব বিচারান্তর্গত বেদান্তমতে সাধন চতুষ্টয়ও এই প্রসঙ্গে রাজযোগীর অবশ্য দ্রষ্টব্য।

বের গ্রহণ এবং জড়রূপী অসদ্ভাবের ত্যাগ-করণ-যোগ্য বিচার-কেই নিয়ম বলে।

৪র্থ। ত্যাগ :—

"ত্যাগপ্রপঞ্চরূপস্য চিদাত্মত্বাবলোকনাৎ।
ত্যাগোহি মহতা পূজ্যঃ সদ্যোমোক্ষময়ো মতঃ॥"

চিদাত্মভাবের অবলোকনদ্বারা প্রপঞ্চ-স্বরূপের পরিত্যাগই রাজযোগাঙ্গে ত্যাগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। মহাত্মাব্যক্তিগণ এই সাধনার যথেষ্ট আদর করিয়া থাকেন, কারণ ইহাদ্বারা শীঘ্র মোক্ষ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

৫ম। মৌন :—

"যস্মাদ্ বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
যন্মৌনং যোগিভির্গম্যং তদ্ভবেৎ সর্ব্বদা বুধঃ॥
বাচো যস্মান্নিবর্ত্তন্তে তদ্বক্তুং কেন শক্যতে।
প্রপঞ্চো যদি বক্তব্যঃ সোঽপি শব্দবিবর্জ্জিতঃ॥
ইতি বা তদ্ভবেন্মৌনং সতাং সহজসংজ্ঞিতম্।
গিরা মৌনস্তু বালানাং প্রযুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ॥"

যাহাকে বাক্য ও মন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেবল যোগী-ব্যক্তিই যাহাকে অনুভব করিতে পারেন, এরূপ পরম ব্রহ্মপদকেই মৌন সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। সেই ভাব লাভ করিবার জন্যই জ্ঞানি ব্যক্তিগণকে সর্ব্বদা যত্ন করা আবশ্যক। যাহার বর্ণনা করিতে করিতে বাক্‌শক্তি অবশ হইয়া পড়ে অর্থাৎ বাক্যেরদ্বারা কেহই যাহা বর্ণন করিতে পারে না—যদি প্রপঞ্চ মাত্রেরই বর্ণন করা যায়, তথাপি সেই বর্ণনামধ্যে শব্দ-সামর্থ্যে কুলায় না, অত-এব সাধুদিগের এই সহজাবস্থাকেই মৌন বলা হইয়া থাকে। বাক্য বন্ধ করিয়া যে মৌন, তাহা নিম্ন অঙ্গের ক্রিয়ামাত্র। ব্রহ্ম-বাদীদিগের অর্থে তাহা বালক্রীড়া বলিতে হইবে।

৬ষ্ঠ। দেশ :—

"আদাবন্তে চ মধ্যে চ জনো যস্মিন্ন বিদ্যতে।
যেনেদং সততং ব্যাপ্তং স দেশো বিজনঃ স্মৃতঃ ॥"

যে দেশের আদি, মধ্য ও অন্তে জনতার সম্বন্ধ বিদ্যমান নাই, যে দেশ সততঃ পরমাত্মাদ্বারাই পরিব্যাপ্ত থাকে, সেই সংস্কার-সম্বন্ধ-পরিশূন্য দেশকেই বিজন দেশ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

৭ম। কাল ঃ—

"কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং নিমেষতঃ।
কালশব্দেন নির্দ্দিষ্টশ্চাখণ্ডানন্দ অদ্বয়ঃ ॥"

যাঁহার নিমেষমাত্র মধ্যেই ব্রহ্মাদি হইতে সর্ব্বভূতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া যায়, সেই অখণ্ডানন্দরূপ অদ্বিতীয় ভাবকেই কাল বলা হইয়াছে।

৮ম। আসন ঃ—

"সুখেনৈব ভবেদ্যস্মিন্নজস্রং ব্রহ্মচিন্তনম।
আসনং তদ্বিজানীয়ান্নেতরৎ সুখনাশনম্ ॥
সিদ্ধং যৎ সর্ব্বভূতাদি বিশ্বাধিষ্ঠানমব্যয়ম্।
যস্মিন্ সিদ্ধাঃ সমাবিষ্টাস্তদ্বৈ সিদ্ধাসনং বিদুঃ ॥

যে অবস্থায় সুখে ব্রহ্মচিন্তন হইতে থাকে, তাহাকেই রাজ-যোগাঙ্গে আসন বলে, ইহার অতিরিক্ত যে সামান্য স্থূলভাব, তাহা সুখাসন নহে, তাহা সুখনাশন অর্থাৎ তাহাতে প্রকৃত সুখ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যাহা সমস্ত ভূতের আদি, যাহা বিশ্বের অধিষ্ঠান স্বরূপ ও অব্যয় এবং যে স্বরূপে সিদ্ধ-লোক স্থিত হইয়া থাকেন, তাহাকেই সিদ্ধাসন বলে।

৯ম। দেহসাম্য ঃ—

"অঙ্গানাং সমতাং বিদ্যাৎ স মে ব্রহ্মণি লীয়তে।
নোচেন্নৈব সমানত্বমৃজুত্বং শুষ্কবৃক্ষবৎ ॥"

সমভাবাপন্ন ব্রহ্মে লীন হওয়াকেই দেহসাম্য কহে। শুষ্ক-বৃক্ষের ন্যায় ঋজুতাকে দেহসাম্য বলে না।

১০ম। দৃক্‌স্থিতি :—

"দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্যেদ্ ব্রহ্মময়ং জগৎ।
সাদৃষ্টিঃ পরমোদারা ন নাসাগ্রাবলোকিনী॥
দৃষ্টিদর্শন দৃশ্যানাং বিরামো যত্র বা ভবেৎ।
দৃষ্টিস্তত্রৈব কর্ত্তব্যা ন নাসাগ্রাবলোকিনী॥"

দৃষ্টিকে জ্ঞানময়ী করিয়া সমস্ত প্রপঞ্চময় জগৎকে ব্রহ্মময় দেখাকেই দৃক্‌স্থিতি কহে। এইরূপ দৃক্‌স্থিতিই পরম মঙ্গলকরী। নাসিকার অগ্রভাগে দেখাকে দৃক্‌স্থিতি বলে না। যে অবস্থা বা ভাবে দৃষ্টি, দর্শন ও দর্শকের একীকরণদ্বারা বিরাম হইয়া যায়, সেই ভাবকেই প্রকৃত দৃক্‌স্থিতি বলিতে পারা যায়। ঐরূপ দৃক্‌স্থিতির অভ্যাস করাই রাজযোগীর যোগ্য। নাসাগ্রে অবলোকনরূপ দৃক্‌স্থিতি এরূপ উচ্চাধিকারীর কার্য্য নহে।

১১শ। মূলবন্ধ :—

"যন্মূলং সর্ব্বভূতানাং যন্মূলং চিত্তবন্ধনম্।
মূলবন্ধঃ সদা সেব্যো যোগ্যোঽসৌ রাজযোগিনাম্॥"

যাহা সর্ব্বভূতের মূল-স্বরূপ এবং যাহা চিত্তবৃত্তি নিরোধের কারণ-স্বরূপ তাহাকেই যোগতন্ত্রে মূলবন্ধ কহে। রাজযোগ-সাধনার্থীর এই অবস্থা সর্ব্বদা সেবন করা কর্ত্তব্য।

১২শ। প্রাণসংযম :—

"চিত্তাদি সর্ব্বভাবেষু ব্রহ্মত্বে সর্ব্বভাবনাৎ।
নিরোধঃ সর্ব্ববৃত্তিনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥
নিষেধনং প্রপঞ্চস্য রেচকাখ্যঃ সমীরণঃ।
ব্রহ্মৈবাস্মীতি যা বৃত্তিঃ পূরকো বায়ুরীরিতঃ॥
অতস্তদ্ বৃত্তিনৈশ্চল্যং কুম্ভকঃ প্রাণসংযমঃ।
অয়ং চাপি প্রবুদ্ধানাং ঘ্রাণপীড়নম্॥"

চিত্ত আদি সর্ব্বপ্রকার ভাবগুলিকে ব্রহ্মভাবে পরিণত করিলে, যখন সমস্ত প্রকার বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই রাজযোগের প্রাণা-

য়াম্ অবস্থা বলা হয়। ভাবনাদ্বারা সমস্ত প্রপঞ্চের নাশ করিয়া দেওয়াকেই ইহার রেচক বলে, তাহার পর নিশ্চলরূপে ব্রহ্মভাবে স্থির থাকিবার নাম কুম্ভক। ইহাকেই জ্ঞানমার্গের প্রাণায়াম ক্রিয়া বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার নিম্নঅঙ্গে নাসিকা পীড়ন দ্বারাই প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সেরূপ স্থলে প্রথমে পূরক, পরে কুম্ভক, তাহার পর রেচক, কিন্তু মহাপূর্ণদীক্ষার উপদেশে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব বর্ণিত হইয়াছে। সাধক দেখিবেন, ইহার প্রথমেই রেচক, পরে পূরক, শেষে কুম্ভক বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে কোন মাত্রারও নির্দ্দেশও নাই। প্রথমে চিন্তাদ্বারা প্রপঞ্চগুলির নাশপূর্ব্বক "ব্রহ্মোঽহং" রূপ মন্ত্র চিন্তায় ব্রহ্মভাবাপন্ন যোগী অখণ্ডকাল নিশ্চলভাবে তন্ময় হইয়া থাকিবেন।

১৩শ। প্রত্যাহার :—

"বিষয়েম্বাত্মনাং দৃষ্ট্বামনসশ্চিতিমজ্জনম্।
প্রত্যাহারঃ সবিজ্ঞেয়োনভ্যাসনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ॥"

বিষয়ের মধ্যে আত্মতত্ত্বকে দেখিয়া মনকে ফিরাইয়া চৈতন্য-স্বরূপে সংলগ্ন করাকেই এ অবস্থার প্রত্যাহার ক্রিয়া বলা হয়। মুমুক্ষুগণের পক্ষে এই প্রত্যাহার ক্রিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

১৪শ। ধারণা :—

"যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ।
মনসো ধারণং চৈব ধারণা সা পরামতা॥

যাহাতে যাহাতে মন যাইতে থাকে, যোগী সেই সেই বস্তুতেই ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া দর্শন করিতে করিতে মনের স্থিরতা সাধনকেই সর্ব্বোত্তম ধারণা বলিয়া রাজযোগ-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

১৫শ। আত্মধ্যান :—

"ব্রহ্মৈবাস্মীতি সদ্‌বৃত্ত্বা নিরালম্ব তথাস্থিতিঃ।
ধ্যানশব্দেন বিখ্যাতা পরমানন্দদায়িনী॥"

আমিই ব্রহ্ম এই প্রকার সদ্‌বৃত্তি দ্বারা নিরালম্বরূপে যে স্থিতি তাহাকেই ধ্যান কহে। ইহাদ্বারা পরমানন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

১৭শ। সমাধি :—

"নির্ব্বিকার তথা বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকার তথা পুনঃ।
বৃত্তিবিস্মরণং সম্যক্ সমাধির্জ্ঞানসংজ্ঞকঃ॥
ঊর্দ্ধ্বপূর্ণ মধঃ পূর্ণং মধ্যপূর্ণং তদাত্মকম্।
সর্ব্বপূর্ণং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥"

নির্ব্বিকার চিত্ত হইয়া আপনাকেই ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সম্পূর্ণ বৃত্তিসহিত সৃষ্টিভাবরহিত অবস্থাকেই রাজযোগের সমাধি বলা যায়। যিনি ঊর্দ্ধ্বপূর্ণ, অধঃপূর্ণ, মধ্যপূর্ণ এবং সর্ব্বপূর্ণ, অর্থাৎ সকল স্থানেই যিনি বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই পরমাত্মা। তাঁহাকে জানিতে পারিলেই সাধকের সমাধি হইয়া যায়, আর তাঁহার সেই পূর্ণতা ভাবই এই সমাধির লক্ষণ জানিতে হইবে।

এস্থলে পুনরায় বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, রাজযোগের এই সমুদায় ক্রিয়ানুষ্ঠান সাধক মনে মনে কল্পনা করিলেই সম্পন্ন করিতে পারিবেন না। অনেকে কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা শুনিয়া অথবা উপর্যুক্ত শাস্ত্রবাক্যসমূহ মুখস্থ করিয়া আপনাকে সিদ্ধ রাজযোগী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়া ধারণা করিয়া বসেন, লোককে অহরহঃ কত উপদেশই দেন, কিন্তু আপনার দিকে একবার ফিরিয়াও দেখেন না যে, বাস্তবিক আমার অবস্থিতির স্থান কোথায়? আমি যাহা বলিতেছি, তাহা প্রকৃত পক্ষে আমার কতটুকু আয়ত্ব হইয়াছে? নিজে নিজেই সতত তাহার বিচার কর, তাহা হইলেই আত্ম-অভাব বুঝিতে পারিবে, পুনরায় আত্মদৃষ্টির প্রবৃত্তি আসিবে। তাই পূজ্যপাদ ঠাকুর যখন তখন বলিতেন :—

"মুখের কথায় নয় যাদুধন!
সাধন বিনা এ হয় কি পূরণ?"

অতএব যাঁহারা পূর্ব্বানুষ্ঠেয় মন্ত্র, হঠ ও লয়-যোগাত্মক যোগদীক্ষা

ও পূর্ণ দীক্ষার ক্রমোন্নত সাধনায় সিদ্ধি বা উন্নতিলাভ করিতে না পারিয়াছেন, তাঁহাদের এই উন্নততম রাজযোগের ক্রিয়া সহসা অবলম্বন করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত নহে। তাহাতে "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট" হইবারই আশঙ্কা অধিক। রাজযোগে যে ভাবে অন্তঃকরণের সূক্ষ্মতম সাধনা করিতে হয়, বলিতে কি তাহা কেবলমন্ত্র চিন্তা দ্বারা হৃদয়ে অনুভব করাও দুঃসাধ্য। কেবল শাস্ত্রবাক্যে যদি ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞানানুভূতি হইত, তাহা হইলে জগতের শাস্ত্রাধ্যাপক ও ধর্ম্মবক্তা মাত্রেই আজ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষরূপে পরিণত হইতে পারিতেন। শ্রীভগবান সদাশিব এই কারণ পুনঃ পুনঃ আজ্ঞা করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-জ্ঞানাভিলাষী সাধক, মন্ত্রযোগাদি ক্রমোন্নত সাধনাপথেই অগ্রসর হইবার জন্য সর্ব্বযোগাভিজ্ঞ ব্রহ্মজ্ঞানী তন্ত্রাচার্য্য শ্রীগুরুদেবেরই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

ষোড়শাঙ্গরাজযোগের বিভিন্ন ক্রম।

সপ্তজ্ঞানভূমি প্রভৃতি বিষয়ক রাজযোগের অন্য ষোড়শ প্রকার অঙ্গ সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে যেরূপ উল্লেখ আছে, এইবার তাহাই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। রাজযোগ-তন্ত্রে শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

"কলা ষোড়শকোপেতা রাজযোগস্য ষোড়শঃ।
সপ্তচাঙ্গানি বিদ্যন্তে সপ্তজ্ঞানানুসারতঃ॥
বিচারমুখ্যং তজ্জ্ঞেয়ং সাধনং বহু তস্য চ।
ধারণাঙ্গে দ্বিধাজ্ঞেয়ে ব্রহ্ম-প্রকৃতি-ভেদতঃ॥
ধ্যানস্য ত্রীনি চাঙ্গানি বিদুঃ পূর্ব্বে মহর্ষয়ঃ।
ব্রহ্মধ্যানং বিরাট্ধ্যানং চেশধ্যানং যথাক্রমম্॥
ব্রহ্মধ্যানে সমাপ্যন্তে ধ্যানান্যন্যানি নিশ্চিতম্।
চত্বার্য্যঙ্গানি জায়ন্তে সমাধেরিতি যোগিনঃ॥
সবিচারং দ্বিধাভূতং নির্ব্বিচারং তথা পুনঃ।
ইত্থং সংসাধনং রাজযোগস্যাঙ্গানি ষোড়শঃ॥
কৃতকৃত্যো ভবত্যাশু রাজযোগপরো নরঃ।

মন্ত্রে হঠে লয়েচৈব সিদ্ধিমাসাদ্য যত্নতঃ।
পূর্ণাধিকার মাপ্নোতি রাজযোগপরো নরঃ ॥"

পূর্ণ ষোড়শকলা বিশিষ্ট রাজযোগের ষোড়শবিধ অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার মধ্যে সপ্তজ্ঞানভূমির অনুসারে সাত অঙ্গ; এই গুলির প্রত্যেকটীই বিচার-প্রধান। শ্রীগুরুর মুখে উহার বিবিধ প্রকার সাধনের উল্লেখ আছে। রাজযোগে উপদিষ্ট ধারণার দুই অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট আছে; এক প্রকৃতি ধারণা, অন্য পুরুষ ধারণা। এইরূপে ইহাতে ধ্যানের তিন অঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা:—বিরাট্ ধ্যান, ঈশধ্যান ও ব্রহ্মধ্যান। এই ব্রহ্মধ্যানেই রাজযোগের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। অনন্তর সমাধি, তাহাও চারি-অঙ্গ বিশিষ্ট, তন্মধ্যে দুইটী সবিচার ও দুইটী নির্ব্বিচাররূপী অঙ্গ বিশিষ্ট। এইরূপে (জ্ঞানভূমি) ৭টী + (ধারণা) ২টী + (ধ্যান) ৩টী + (সমাধি) ৪টী = মোট ১৬ প্রকার রাজযোগের অঙ্গ। সাধক এই ষোল প্রকার সাধনায় যথাক্রমে সিদ্ধ হইলে কৃতকৃত্য হইতে পারেন। প্রথমে মন্ত্রযোগ, পরে হঠ ও লয় যোগের সাধনায় সিদ্ধ হইলে সাধক রাজযোগের পূর্ণ অধিকারী হইতে পারেন।

এই ষোল অঙ্গের মধ্যে প্রথম সাত অঙ্গ সপ্তদর্শন-বিজ্ঞানের অনুকূল সপ্তপদীভূমিকা নামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। এই সপ্তভূমি আবার তিনস্তরে বিভক্ত।

সপ্তপদী ভূমিকা

(১) কর্ম্ম বা যোগ, (২) উপাসনা ও (৩) জ্ঞান, এই তিনে প্রায় এক হইলেও প্রত্যেকের মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবের পার্থক্য আছে, তাহাও পাঠকের জানিয়া রাখা আবশ্যক। অতএব এই ত্রিবিধ ভূমি-সপ্তকের বিষয়েই নিম্নে যথাক্রমে আলোচনা করিতেছি। প্রথমেই সপ্ত কর্ম্ম বা যোগভূমির সম্বন্ধে বলিব। শাস্ত্রান্তরে এই যোগভূমিকেই আবার জ্ঞানভূমি বলা হইয়াছে। যাহা হউক, সে নামের জন্য বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না, এক্ষণে আসল বিষয়টীর

মর্ম্ম অবগত হইলেই হইল। বিশেষতঃ এই যোগভূমিও যে জ্ঞানান্তর্গত, সুতরাং ইহাকে জ্ঞানভূমি বলিলেও কোন আপত্তি নাই। শ্রীমন্মহর্ষি বশিষ্টদেব বলিয়াছেন :—

"চতুর্ভাগাত্মনি কৃতে ইত্যবিদ্যাক্ষয়ে ক্রমাৎ।
সমকালাচ্চ যচ্ছিষ্টং তদনামার্থ সন্ময়ং॥
অববোধং বিদুজ্ঞানং তদিদং সপ্তভূমিকং।
যুক্তস্তজ্‌জ্ঞেয় মিত্যুক্তো ভূমিকাসপ্তকং পরং॥"

জ্ঞান-ভূমির অভ্যাস কালে ক্রমে ক্রমে অবিদ্যা বা অহং জ্ঞানের চারি ভাগ (অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার) ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া নাম-রূপ-বর্জ্জিত সন্ময়-ব্রহ্ম-পদার্থ উপলব্ধি হইয়া থাকে। এক্ষণে সেই জ্ঞান সপ্তভূমি বিশিষ্ট বা সাত প্রকার। যিনি ইহা সম্যক অবগত হইতে সমর্থ হন, তিনিই মোক্ষভাগী হইয়া সেই পরম ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন।

শাস্ত্রে সপ্ত যোগভূমি সম্বন্ধে উক্ত আছে :—

সপ্তকর্ম্ম বা যোগভূমি :

"যোগভূমিঃ * শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা।
বিচারণাদ্বিতীয়াস্যাত্তৃতীয়া তনুমানসা॥
সত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাত্ততোঽসংশক্তিনামিকা।
পরার্থভাবিনী ষষ্ঠী সপ্তমী তূর্য্যগাস্মৃতা॥"

জ্ঞানান্তর্গত প্রথমা যোগভূমির নাম—শুভেচ্ছা, দ্বিতীয়া—বিচারণা, তৃতীয়া—তনুমানসা, চতুর্থী—সত্বাপত্তি, পঞ্চমী—অসংশক্তিকা, ষষ্ঠী—পরার্থভাবিনী এবং সপ্তমী—তূর্য্যগা। এই সাত প্রকার ভূমির জ্ঞান হইলেই সাধকের মুক্তি হইয়া থাকে। যোগী সেই মুক্তির অবস্থায় উপনীত হইতে পারিলে আর তাঁহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এ সকল ভূমির সবিশেষ লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রেই বর্ণিত আছে যে,—(১) "আমি মূঢ় হইয়া কেন অবস্থিতি করিতেছি, শ্রীগুরুর উপদেশ-ক্রমে সৎশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান-ক্রমে অর্থাৎ শমদ-

* শাস্ত্রান্তরে "জ্ঞানভূমি শুভেচ্ছাখ্যা" ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

মাদি সাধনপূর্ব্বক বিবেক ও বৈরাগ্য দ্বারা ভগবৎ সাক্ষাৎ করিয়া মুক্তিলাভ করিব। "এই সুপবিত্র ইচ্ছাই জ্ঞানের প্রথম স্ফূরণ, ইহাই 'শুভেচ্ছা' নামক রাজযোগীর প্রথম যোগভূমি। (২) বিচারণা—পূর্ব্ব কথিত শ্রবণ-মননাদিদ্বারা বৈরাগ্যের অভ্যাস পূর্ব্বক সৎশাস্ত্র ও সজ্জন-সম্পর্কীয় সদাচারে যে প্রবৃত্তি বা বিচার-বুদ্ধি সমুদিত হয়, তাহাকেই 'বিচারণা' বলে। (৩) শুভেচ্ছা ও বিচারণাদ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে বিরক্তি জন্মিলে বা বিষয়-বাসনা ক্ষীণ হইলে অর্থাৎ তনুতা বা সূক্ষ্মতা প্রাপ্তি হইলে নিদিধ্যাসনদ্বারা সৎস্বরূপে অবস্থিত হওয়ার নাম "তনুমানসা।" (৪) উক্ত শুভেচ্ছা, বিচারণা ও তনুমানসা এই ভূমিত্রয়ের অভ্যাসদ্বারা দৃশ্য-বস্তুতে চিত্তের বিরতি সমুপস্থিত হওয়াতে যে শুদ্ধ সত্তাত্মাতে অবস্থিতিরূপ আত্মাই সত্য বা আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ অপরোক্ষ বৃত্তি বা জ্ঞান উপস্থিত হওয়াকে সত্তাপত্তি কহে। (৫) পূর্ব্বোক্ত দশা চতুষ্টয়ের অভ্যাস দ্বারা বিষয়ে অসংসর্গ বা বাসনা না থাকা অর্থাৎ সত্ত্বগুণের প্রভাবে যে সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্তি-ভাবের উদয় হয়, তাহার নাম "অসংশক্তি।" (৬) উক্ত পঞ্চ জ্ঞানাত্মক যোগভূমির অভ্যাসদ্বারা স্বীয় আত্মাতে অতিশয় রমণ-হেতু বাহ্য ও অন্তরের যে কোন পদার্থের ভাবনা এককালে দূরীভূত হইয়া পরব্রহ্মে চির-প্রযত্নদ্বারা যে ব্রহ্ম-ভাবনার অবির্ভাব হয়, তাহাই "পরার্থভাবিনী। (৭) এই ছয় প্রকার জ্ঞানভূমির দৃঢ় অভ্যাসদ্বারা ভেদ-জ্ঞানের অভাব হইলে যে স্বাভাবিক এক-নিষ্ঠত্ব সমুদিত হয় এবং তদ্ব্যতীত স্বতঃ বা পরতঃ যে কোনরূপে চিত্তের কিছুমাত্র চাঞ্চল্য-ভাব না হইলেই যোগীর "তূর্য্যগা" গতি বলা হয়।

যে মহাভাগ মহাত্মা রাজযোগের এই সপ্তম অবস্থায় তূর্য্যগা প্রাপ্ত হন, তিনিই আত্মাতে দৃঢ় আরাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন বা আত্মারাম হন। এই তূর্য্যগা-অবস্থা জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরই ঘটিয়া

থাকে। তন্ত্রান্তরে ইহাকেই যোগীর তূরীয়াবস্থা বা প্রকৃতি-পুরুষের ওতপ্রোত-ভাবানুভূতি-অবস্থা বলা হইয়াছে। ইহার পর বিদেহমুক্তি বিষয়ক তূর্য্যাতীত ব্রহ্মপদ। যাহা হউক, এই সপ্তপদী জ্ঞানাত্মক কর্ম্ম বা যোগভূমি মহাপূর্ণ-দীক্ষার পর রাজযোগরূপ জ্ঞানযোগেরই বিষয়ীভূত। রাজযোগ-তন্ত্রে উক্ত আছে :—

"যোগোহি কর্ম্মনৈপুণ্যং কর্ম্মযোগেন তেন বৈ।
অতিক্রমন্ সপ্তযোগভূমিকামধিগম্যতে॥
জীবন্মুক্ত পদং নিত্যং রাজযোগস্য সাধকাঃ॥"

নিপুণতাপূর্ণ কর্ম্মের নামই যোগ। সাধক সেই নিপুণতাপূর্ণ কর্ম্মযোগের দ্বারা রাজযোগ-নির্দ্দিষ্ট এই সপ্তভূমি অতিক্রম করিয়া জীবন্মুক্ত পদবী প্রাপ্ত হইতে পারেন।

সপ্ত উপাসনা ভূমি

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যোগভূমির ন্যায় জ্ঞানমূলক উপাসনাভূমিও সাত প্রকার। যোগশাস্ত্র-বর্ণিত উপাসনাভূমি যথা :—

"প্রথমাভূমিকানামপরা রূপপরাঽপরা।
স্যাদ্বিভূতিপরা নাম্না তৃতীয়া ভূমিকামতা॥
তথা শক্তিপরা নাম চতুর্থী ভূমিকা ভবেৎ।
এবং গুণপরাজ্ঞেয়া ভূমিকা পঞ্চমী বুধৈঃ॥
ষষ্ঠীভাবপরা সপ্তমী স্বরূপপরা স্মৃতা।
লক্ষৈক্যং ধারণাধ্যান সমাধীনাস্তু যদ্ভবেৎ॥"

উপাসনা-বিষয়ক সপ্তভূমির মধ্যে ১ম। নামপরা, ২য়। রূপপরা, ৩য়। বিভূতিপরা, ৪র্থ। শক্তিপরা, ৫ম। গুণপরা, ৬ষ্ঠ। ভাবপরা, ৭ম। স্বরূপপরা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অনন্তর ধারণা, ধ্যান ও সমাধির একীভূত একই লক্ষ্য যুক্ত অবস্থা, যাহা এই দশায় সংযম বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। (১) সেই সংযমের দ্বারা যোগীর যে প্রথম পরমাত্মভাব দর্শন হয়, তাহাকে "দিব্যনাম" কহে। ইহাই 'নামপরা' প্রথম উপাসনাভূমি। (২) এইভাবে যোগীর দ্বিতীয়-

পরমাত্মারূপ দর্শনকে, "দিব্যরূপ" দর্শন কহে, ইহা রাজযোগে রূপপরা নামক দ্বিতীয় উপাসনা ভূমি। (৩) এইরূপ বিভূতি-সমূহের মধ্যে তাঁহার তৃতীয় দর্শনকে "বিভূতিপরা" উপাসনা-ভূমি বলে। (৪) স্থূল ও সূক্ষ্ম শক্তিতত্ত্ব-সমূহের মধ্যে তাহার চতুর্থ দর্শনকে "শক্তিপরা" উপাসনা-ভূমি কহে। (৫) সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের মধ্য দিয়া তাঁহার পঞ্চম দর্শনই "গুণপরা" উপাসনা-ভূমি। (৬) সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই ত্রিভাবের মধ্য দিয়া তাঁহার ষষ্ঠ দর্শনকেই "ভাবপরা" উপাসনা ভূমি এবং (৭) পরমাত্মাকে স্বরূপে দর্শনরূপ তাঁহার অন্তিম দর্শনকেই স্বরূপপরা বা সপ্তম উপাসনা ভূমি বলা হইয়াছে। এই অবস্থায় আসিয়াই সাধক মন্ত্রযোগে বর্ণিত তাহার প্রথমাঙ্গরূপ ভক্তির চরম অবস্থা বা পরাভক্তির অধিকারী হইয়া জীবন্মুক্ত বা পরমানন্দপদ লাভ করিয়া থাকেন।

জ্ঞানাত্মক প্রথম সাত প্রকার যোগভূমি, পরে সাত প্রকার উপাসনাভূমি ও তাহার সাত প্রকার দর্শন-বিষয়ে বলা হইল।

সপ্তজ্ঞান ভূমি। এক্ষণে সপ্তবিধ সূক্ষ্ম জ্ঞানভূমি-বিষয়ে রাজযোগ-তন্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাই বলিতেছি।

"জ্ঞানদা জ্ঞানভূমের্হি প্রথমা ভূমিকা মতা।
সন্ন্যাসদা দ্বিতীয়া স্যাৎ তৃতীয়া যোগদা ভবেৎ॥
লীলোন্মুক্তি শ্চতুর্থী বৈ পঞ্চমী সৎপদাম্মৃতা।
ষষ্ঠ্যানন্দপদা জ্ঞেয়া সপ্তমী চ পরাৎপরা॥"

সপ্তজ্ঞানভূমির মধ্যে প্রথমা জ্ঞান-ভূমির নাম জ্ঞানদা, দ্বিতীয়ের নাম সন্ন্যাসদা, এইভাবে তৃতীয় যোগদা, চতুর্থ লীলোন্মুক্তি, পঞ্চম সৎপদা, ষষ্ঠ আনন্দপদা এবং সপ্তম পরাৎপরা জ্ঞানভূমি বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট।

আর্য্যশাস্ত্রসমূহের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রগুলিকে জ্ঞান-বিষয়ক বলিয়া সকলেই জানেন। ন্যায়, বৈশেষিক, পাতঞ্জল, সাংখ্য, কর্ম্ম বা পূর্ব্ব-মীমাংসা, দৈব বা মধ্য অথবা ভক্তি-মীমাংসা এবং ব্রহ্ম

বা উত্তর মীমাংসা এই সাতখানি দর্শনশাস্ত্রই সপ্ত জ্ঞান-ভূমির অনুকূল ঔপপত্তিক (Theoritical) তত্ত্ব-গ্রন্থ ; উন্নত রাজযোগাদি জ্ঞানতন্ত্রের (Practical) ক্রিয়াসিদ্ধতত্ত্ব-সাধনার মধ্যে সাধক শ্রীগুরুর কৃপায় যথাক্রমে যেমন যেমন অনুভব করেন, তাহাই সেই সপ্ত-দর্শন-নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানতত্ত্বরূপ সাতটী সোপান বা সাতটী জ্ঞান-ভূমি। তত্ত্ব-জ্ঞানাভিলাষী পাঠক এক্ষণে প্রত্যেক জ্ঞান-ভূমির প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত যথাক্রমে দর্শন-সপ্তকের সমন্বয় আলোচনা করিলে সহজেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন। ষষ্ঠোল্লাসে বর্ণিত "দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়" অংশও এই প্রসঙ্গে পাঠকের অতি মনোযোগ সহকারে আলোচনা করা আবশ্যক।

(১) পরমাণুর নিত্যতা, ব্রহ্মকেই সৃষ্টির কারণভূত অনুভব করা এবং ষোড়শ প্রকার পদার্থের জ্ঞানদ্বারা পরমতত্ত্ব প্রাপ্তি করাকেই "জ্ঞানদা" নামক (প্রথম জ্ঞানভূমি) দর্শন কহে। ইহাই ন্যায় দর্শনের প্রতিপাদ্যানুভূতি। আমার যাহা কিছু জানিবার ছিল, সে সমস্তই জানিয়াছি, এ অবস্থায় সাধকের এইরূপই অনুভব হইয়া থাকে।

(২) ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় ও ষট্ বা সপ্ত-পদার্থের জ্ঞানদ্বারা পরমতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করাকে "সন্ন্যাসদা" নামক (দ্বিতীয় জ্ঞানভূমি) দর্শন বলে। ইহা বৈশেষিক-প্রতিপাদ্য * অনুভূতি। এ অবস্থায় সাধকের অনুভব হয় যে, আমার যাহা কিছু ত্যাগ করিবার ছিল, সে সমুদায়ই ত্যাগ হইয়া গিয়াছে।

(৩) জগতের মূলে বৃত্তি আছে, চিত্তও বৃত্তিপূর্ণ, অতএব চিত্ত-বৃত্তিকে নিরোধদ্বারা জগদাত্মরূপ পরমতত্ত্বের লাভ করাই "যোগদা" নামক (তৃতীয় জ্ঞানভূমি) দর্শন। ইহাই পতঞ্জলী-প্রতিপাদ্য অনুভূতি। এ অবস্থায় রাজযোগী-সাধকের মনে হয়, আমার যে সকল শক্তি লাভ করিবার ছিল, তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ লাভ

* ষষ্ঠোল্লাসে "দর্শনশাস্ত্র সমন্বয়" অংশের পাদটীকা দেখ।

করিয়াছি।

(৪) প্রকৃতিকে সম্যক প্রকারে জানিয়া পরমতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করাকে 'লীলোন্মুক্তি' নামক (চতুর্থ জ্ঞানভূমি) দর্শন কহে। ইহাই সাংখ্য-প্রতিপাদ্য অনুভূতি। এ অবস্থায় মায়ার সকল লীলাই দেখা যাইতেছে, আমি আর তাহাতে মোহিত হইতেছি না, এই-রূপ অনুভব হয়।*

(৫) কর্ম্মের প্রধানতায় জগৎই ব্রহ্ম এইরূপ দর্শন "সৎপদা" নামক (পঞ্চম জ্ঞানভূমি) ভূমিকা। ইহাই কর্ম্ম বা পূর্ব্ব-মীমাংসা-প্রতিপাদ্য অনুভূতি। এ অবস্থায় সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের সদ্‌ভাব-প্রধান 'জগৎই ব্রহ্ম' যোগীর এইরূপই অনুভব হয়।

(৬) দৈবী বা মধ্য অথবা ভক্তি-মীমাংসার প্রতিপাদ্য, ভক্তির প্রধানতাদ্বারা আনন্দ-স্বরূপ 'ব্রহ্মই জগৎ' এইরূপ দর্শন "আনন্দ-পদা" নামক (ষষ্ঠজ্ঞান-ভূমি) ভূমিকা। এ অবস্থায় সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের আনন্দভাব-প্রধান 'ব্রহ্মই জগৎ'রূপে যোগীর অনুভব হয়।

(৭) ব্রহ্ম বা উত্তর-মীমাংসার প্রতিপাদ্য অনুভূতিতে 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানের প্রধানতাদ্বারা যে দর্শন হয়, তাহারই নাম "পরাৎপরা (সপ্তম জ্ঞানভূমি)।" এই অবস্থায় সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের চৈতন্য-ভাব-প্রধান 'আমিই অদ্বিতীয়, নির্ব্বিকার, বিভু, চৈতন্যস্বরূপ বা সম্পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম' এইরূপ অনুভব হইয়া থাকে। যোগী-সাধক এই ভূমি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান। রাজযোগ-নির্দ্দিষ্ট এই সাত প্রকার জ্ঞানভূমি-বিষয়ে যোগীর পূর্ণ অভিজ্ঞতা জন্মিলেই মুক্তি অবশ্যম্ভাবী জানিতে হইবে।

এইবার রাজযোগ-তন্ত্রোক্ত 'ধারণা' বর্ণন করিব। এই সম্বন্ধে

* (৩) যোগদা ও (৪) লীলোন্মুক্তির শ্রেণী-বিভাগ-বিষয়ে সামান্য মতদ্বৈধ আছে। কেহ লীলোন্মুক্তিকে তৃতীয় ও যোগদাকে চতুর্থ জ্ঞানভূমি বলিয়া উল্লেখ করেন। সাংখ্য ও পাতঞ্জল হিসাবে এইরূপ পরিবর্ত্তনই অধিকতর সঙ্গত।

ধারণা। শ্রীভগবান আজ্ঞা করিয়াছেন ঃ—

"মুদ্রাভ্যাসাদ্ধারণায়াঃ সিদ্ধিং তত্ত্বাবধারণে।
প্রাপ্য সূক্ষ্মাং ক্রিয়াং কুর্ব্বন্ পঞ্চতত্ত্বজয়ে ক্ষমঃ॥
ধারণাসিদ্ধয়ে পঞ্চমুদ্রা সূক্ষ্মলয়ক্রিয়াঃ।
সাহায্যং বৈ বিদধতে প্রোক্ত মেতন্মহর্ষিভিঃ॥"

পঞ্চ-ধারণা মুদ্রার অভ্যাস দ্বারা যোগিরাজ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচ তত্ত্বের ধারণায় সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চ সূক্ষ্ম-ক্রিয়ার সাধনদ্বারা এই পঞ্চ-তত্ত্বের জয় করিতেও সমর্থ হইয়া থাকেন। রাজযোগের এই ধারণা-সিদ্ধি-কল্পে পূর্ব্বানুষ্ঠিত পঞ্চভূত-ধারণা ও পঞ্চভূত-লয়ক্রিয়া-রূপ সূক্ষ্মতর ভূতশুদ্ধি বিশেষ সহায়তা প্রদান করে।

অনন্তর যোগিবর উন্নত ভূমিতে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ব্রহ্ম-ধ্যানের সাধনায় উন্নত হইয়া থাকেন। যোগী অনিষ্পন্ন বা অপরিপক্ক দশায় ধারণার অভ্যাস-কল্পে যথাক্রমে বিরাট, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এই ত্রিবিধ ধারণাদ্বারা অগ্রসর হইলেও প্রকৃত পক্ষে ধারণার দুইটী অঙ্গই দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকৃতি-ধারণা, অন্য ব্রহ্ম-ধারণা। জীবন্মুক্ত শ্রীগুরুদেবের কৃপাবলেই যোগী এই উভয় ধারণার অধিকারী হইতে পারেন।

অতঃপর ধ্যান-সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন ঃ—রাজযোগী ধ্যানা-ভ্যাস করিবার সময় বেদ-তন্ত্রাদি শাস্ত্র ও শ্রীগুরুর সহায়তায় বিরাট, ঈশ্বর ও ব্রহ্মরূপী ত্রিবিধ ধ্যান করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। রাজযোগ-নির্দ্দিষ্ট ধ্যানের বিশিষ্টতা এই যে, মন্ত্রযোগ, হঠযোগ ও লয়যোগের সাধকের পক্ষে স্থূল, জ্যোতিঃ ও বিন্দুরূপ এক এক প্রকার ধ্যানেরই নির্দ্দেশ আছে, তাহাই তাহাদের পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ, অন্যথায় হানির সম্ভাবনা আছে; কিন্তু রাজযোগের জন্য তিন প্রকার ধ্যানের ব্যবস্থা যোগশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহা সম্পূর্ণ হিতকর বা সিদ্ধিপ্রদ। জীবন্মুক্ত

ধ্যান।

শ্রীনাথের কৃপায় মহাপূর্ণদীক্ষান্তে সাধক-যোগী তাহা অবগত হইতে পারেন। 'বিরাট'-ধ্যানে সাধক প্রথমেই চিন্তা করিতে পারেন যে, "আমিই পিণ্ডমধ্যে সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ," অনন্তর দ্বিতীয় "ঈশ্বর"-ধ্যানে "আমিই সমস্ত দৃশ্যের দ্রষ্টা-স্বরূপ" এবং সর্ব্বশেষে "ব্রহ্ম"-ধ্যানে সাধক-চূড়ামণি "সচ্চিদানন্দরূপোঽহং" অর্থাৎ "আমিই সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ" এই চিন্তা করিতে থাকেন। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মধ্যান। এই ত্রিবিধ ধ্যানের সিদ্ধি হইলেই নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হইয়া থাকে। রাজযোগ ও রাজাধিরাজযোগে এইভাবে সিদ্ধিলাভ করিবার বিবিধ বিধান যোগ-শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেও তাহার কয়েক প্রকার বিধানের উল্লেখ করা হইয়াছে; সাধক শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদে যে কোনও অনুষ্ঠানদ্বারা হউক উক্তরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়া পূর্ণমনস্কাম হইতে পারেন।

প্রস্থানত্রয়। যাহাহউক এই ত্রিবিধ ধ্যান অর্থাৎ বিরাট, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম ধ্যানের প্রাধান্যভাবে পরমাত্মা সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। এক অদ্বৈতপদেই তিনি তিন বিলাসে বিদ্যমান আছেন। তত্ত্বাতীত পদ মনোবুদ্ধির অগোচর, কিন্তু ত্রিবিধ ভাবের অনুসারে এই যোগাবস্থায় ত্রিবিধ পরিবর্ত্তন হওয়াও স্বভাবসিদ্ধ। যদিও রাজযোগে দ্বৈতভাব থাকে না, তথাপি সূক্ষ্মরূপে সচ্চিদানন্দ-ভাবের দ্বারা ত্রিবিধ বিলাস অনুসারে এক সময় সৎ-সত্তার বিলাস, এক সময় আনন্দ-সত্তার বিলাস এবং অন্য সময় চিৎ-সত্তার বিলাস বিদ্যমান থাকে। অতএব সচ্চিদানন্দ-ভাব এক অদ্বৈতরূপে স্থিত হইলেও ভাব-প্রাধান্য অনুসারে সৎ, চিৎ ও আনন্দের বিলাসরূপ "প্রস্থানত্রয়ের" কল্পনার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

এইরূপে ব্রহ্ম-সারূপ্য-প্রাপ্তি হইবার জন্য মন্ত্র, হঠ ও লয় যোগের সাধনাক্রম-সহযোগে সাধক-যোগীরাজ যোগের সাধন-

পথে ক্রমে অগ্রসর হইয়া তাঁহার অন্তিম লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারেন।

রাজযোগে শুদ্ধিত্রয়।

রাজযোগী আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিকরূপ তিন প্রকার শুদ্ধি সর্ব্বদা সম্পাদন করিবেন। যজ্ঞ এবং মহাযজ্ঞ-সাধনেরদ্বারা আধিভৌতিক শুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্বীয় ইহ-পরলোক-সম্বন্ধীয় উন্নতিকল্পে প্রয়োজন-মত যে কোনও ক্রিয়া-মূলক সাধনার নাম "যজ্ঞ" এবং কোন জাতি, সমাজ বা জগতের সাধারণ সমষ্টিগত সর্ব্ব প্রাণীর ইহ-পরলোক-সম্বন্ধীয় উন্নতি বিধানকারী সাধনার নাম "মহাযজ্ঞ।" রাজযোগী নিষ্কাম ভাবে এই সাধনায় জগতের মঙ্গলকল্পে সতত ব্যাপৃত থাকিবেন।

মন্ত্রযোগের মূল-ভিত্তি ভক্তি; রাজযোগী এখন সেই ভক্তির সার অপূর্ব্ব পরাভক্তির সাধনায় প্রকৃত ভগবদ্ভক্তি-লাভসহ আধিদৈবিক শুদ্ধি সম্পাদন করিবেন; এবং রাজযোগের পূর্ব্ব অনুষ্ঠান-রূপ আত্মা ও পরমাত্মার বিচারদ্বারা আধ্যাত্মিক শুদ্ধি সাধন করিবেন। ইহাই রাজযোগের ত্রিবিধ শুদ্ধি-সম্পাদন-ক্রিয়া। সিদ্ধ যোগিগণ ইহা সর্ব্বদা সাধন করিয়া থাকেন।

নিষ্কাম কর্ম্মযোগ।

সাধক-যোগিবর সর্ব্ব প্রকার কামনা ও সঙ্কল্প পরিবর্জ্জিত হইয়া ব্যষ্টি বা সমষ্টিভাবে জগৎ কল্যাণকর যে কোন কর্ম্মই ব্রহ্মকর্ম্ম বোধে করিয়া যাইবেন, তাহাই তাঁহার প্রধান কর্ম্মযোগ। ব্রহ্মভাবে থাকিয়া কর্ম্ম করিলে আর কর্ম্ম-বন্ধনের আশঙ্কা থাকিবে না। সে কর্ম্মফল ব্রহ্মেই লয়-প্রাপ্ত হইবে। তাই রাজযোগী সন্ন্যাসী আহারাদি সকল কর্ম্মেই বলিয়া থাকেন:—

"ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্ ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥"

শ্রীভগবান গীতোপনিষদেও সেই কথা যেন সূত্রাকারে

বলিয়াছেন :—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥"

কেবল কর্ম্মতেই তোমার অধিকার আছে, তাহার কোনরূপ ফলের জন্য বা তাহার বিনিময়ে কিছু পাইবার জন্য তুমি সর্ব্বদা কামনা-বিহীন থাকিবে, অর্থাৎ তুমি কর্ম্মযোগ-সাধনায় কোন কামনার ভাব আদৌ চিত্তে আনিবে না, তুমি কর্ম্মফলের হেতু হইও না, অকর্ম্মতেও যেন তোমার আসক্তি না থাকে।

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥"

হে ধনঞ্জয়! যোগস্থানে অবস্থিত হইয়া সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি সমান জ্ঞানপূর্ব্বক বাসনা-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর। ফলাফলের সমতাকেই যোগ বলে। এই কর্ম্মযোগও সাত প্রকার বলিয়া রাজযোগতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। প্রথম ও প্রধান কর্ম্মযোগ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত যে কোন কর্ম্ম করা। এইভাবে (২) শারীরিক কর্ম্মযোগ, (৩) মানসিক কর্ম্মযোগ অর্থাৎ বিষয়রাগ-রাহিত্য বা বিষয়ের লালসা-বিহীনতা, (৪) রসানুভবসময়ে 'আত্মলক্ষ্য বিস্মৃত না হওয়া, (৫) সপ্ত-উপাসনা-ভূমির অনুকূল সাত প্রকার ধ্যানে নিরত থাকা, (৬) তটস্থ জ্ঞানদ্বারা আত্মানুসন্ধান এবং (৭) স্বরূপজ্ঞান-প্রকাশক বিজ্ঞানানুসন্ধান সপ্তম কর্ম্মযোগ। এই সাত প্রকার কর্ম্মযোগের মধ্যে কোনও না কোন কর্ম্মে সাধকের সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য। ইহাদ্বারাই রাজযোগী সাধকের সমাধি-সিদ্ধি সুগম হইয়া থাকে।

যোগাবলীর মধ্যে এই অন্তিম যোগানুষ্ঠানে ধারণা ও ধ্যান-

সমাধি, পরোক্ষ ও অপরোক্ষানুভূতি

ভূমি হইতে ইহার ক্রিয়া আরব্ধ হইলেও, সমাধি-ভূমিই ইহার প্রধান সাধন-ভূমি। তাহা রাজযোগ-রহস্য আলোচনার প্রসঙ্গে অনেকবার বলা হইয়াছে,

পাঠকের অবশ্যই তাহা স্মরণ আছে, অথবা যোগাভিলাষির সেকথা সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। রাজযোগপ্রধান এই সমাধির সাধন-কালে প্রথমে যোগীর সমাধি-ভূমিতে বিতর্ক বিদ্যমান থাকে, তাহার পর সমাধি-সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যথাক্রমে বিচার ও আনন্দানুগত অবস্থা, অনন্তর অস্মিতানুগত অর্থাৎ দ্রষ্টারূপ আত্মার সহিত দর্শন-শক্তিরূপা বুদ্ধিতত্ত্বের ঐক্য বা তদাত্ম্যাধ্যাস অবস্থা উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—রাজযোগের সমাধি চারি প্রকার, তন্মধ্যে দুই প্রকার সবিচার সমাধি ও দুই প্রকার নির্ব্বিচার সমাধি। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে :—

"বিশেষলিঙ্গং ত্ববিশেষলিঙ্গং লিঙ্গং তথাঽলিঙ্গমিতি প্রভেদান্।
বদন্তি দৃশ্যস্য সমাধিভূমিবিবেচনায়াং পঠবোমুনীন্দ্রাঃ ॥"

বিশেষ লিঙ্গ, অবিশেষ লিঙ্গ, লিঙ্গ ও অলিঙ্গ * ভেদে এই চারি-প্রকার দৃশ্যের ভেদ হইয়া থাকে। এ সমস্তই ত্যাগ হইয়া এমন কি "আমিই ব্রহ্ম" এভাবও নির্ব্বিকল্প সমাধি-অবস্থায় থাকিতে পারে না বা থাকে না। প্রকৃত কথা, সে সময় যাহা অনুভব হয় বা না হয়, তাহা শাস্ত্রজ্ঞানে বিচার করিয়া ভাষায় পরিব্যক্ত হইতে পারে না, অথবা তাহার সাধনক্রমও শাস্ত্রপাঠে বুঝিবার উপায় নাই। তাহা সেই পরম পূজ্যপাদ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ যাঁহার অপরোক্ষানুভূতি বা তূরীয়াবস্থা হইয়াছে, তিনিই কেবল অন্তরে অনুভব করিতে পারেন।

পরোক্ষ ও অপরোক্ষ অনুভূতির মধ্যে সাধারণভাবে পার্থক্য এই যে, পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ এবং অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষরূপে ব্রহ্মের অনুভব হওয়া। অর্থাৎ স্থুল উদাহরণে পরোক্ষ কতকটা

---

* পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত, কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এই ১৫টী স্থূলতত্ত্ব বিশেষ লিঙ্গ, ৫টী তন্মাত্র ও মন এই ৬টী সূক্ষ্মতত্ত্ব অবিশেষ লিঙ্গ. অহঙ্কার ও মহতত্ত্ব এই দুইটী লিঙ্গ এবং কেবল মূলাপ্রকৃতি এইটী অলিঙ্গ দৃশ্য।

যেন পরের অক্ষিতে বা চক্ষে দেখা এবং অপরোক্ষ যেন নিজের চক্ষে দেখা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্রপাঠ ও শ্রীগুরুদেবের উপদেশ-ক্রমে সাধনালব্ধ ব্রহ্মবস্তু-সম্বন্ধে একটা বিশেষরূপ দৃঢ়-ধারণা স্থির-কল্পনা বা অভ্রান্ত-চিন্তামাত্র, যাহা সাধক-যোগী মনে মনেই অনুভব করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন, তাহাই পরোক্ষানুভূতি এবং সকল সাধন-সিদ্ধির ফলে যখন সাধক যোগিবররূপে আত্মারাম ও যোগযুক্ত হইয়া ব্রহ্মের স্বরূপ অবস্থা অনুভব করিতে থাকেন, তাহাকেই অপরোক্ষানুভূতি বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। একদিন গুণ গুণ করিতে করিতে পরোক্ষ-অপরোক্ষ-বিচারে আপন মনে তিনি যে ভৈরবীতে গাহিয়াছিলেন :—

"কোথা আছ তুমি, কোথা আছি আমি,
পরোক্ষেতে বুঝি সদা সাথী তুমি,
কিন্তু হয় একি, সাথী নাহি দেখি,
যেন কত দূরে তুমি আছ গো!
কাতর অন্তরে ডাকিলে তোমারে,
কোথা হ'তে সাড়া দাও যে আমারে,
খুঁজি চারি দিক, পাই নাহি ঠিক,
কত গোপনে অন্তরেই আছ গো!
নাভিতে যেমতি মৃগ-কস্তুরীর,
সৌরভে মাতায় অন্তর বাহির,
বন-বনান্তরে ছুটায় তাহারে,
তেমতি আমি যে তোমায় খুঁজি গো!
কত নিশি দিন অতীত হইল,
কত জনম জীবন বৃথা চলে গেল,
(আছি) তোমারই আশায় পতিত ধরায়,
কবে স্বরূপে দেখা দেবে গো!
এস এস এস অপরোক্ষে ব'স,

খেলিব উভয়ে ধ্যান-ক্রিয়া-শেষ,
সচ্চিদানন্দ আজ ব্রহ্মানন্দে ভাস,
পূর্ণ পূর্ণ তব চির সাধন গো !"

পরোক্ষাবস্থায় সাধকের অহং শব্দ কদাচ তাঁহার বদনপুটে উচ্চারিত হয়, তিনি বিশ্বের সমস্ত বস্তুতেই আত্মস্বরূপ দর্শন করেন। আর যখন সাধকের কি বন্ধ, কি মোক্ষ, কোনরূপ বিবেচনাই থাকে না, তিনি নিরন্তর একমাত্র আত্মাতেই অবস্থিত থাকেন, আমি, তুমি এই দ্বিধা ভাব বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অখণ্ড ভাবে ধ্যান-ক্রিয়ার শেষ সমাধি-দশায় উপস্থিত হন, যখন অধ্যারোপ * ও অপবাদ † দ্বারা সকলই তাঁহার বিলীন হইয়া যায়, তখনই সেই সর্ব্বসঙ্গ-পরিবর্জ্জিত একমাত্র জ্ঞান-মূর্ত্তিতে বীজস্বরূপে পরিণত যোগীরই চিদানন্দরূপ অপরোক্ষানুভূতি হইতে থাকে। নতুবা মূঢ়মতি বচন-সর্ব্বস্ব সাধনা-বিহীন শুষ্ক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ প্রলাপস্বরূপ চিদানন্দ-পরিপূর্ণ অপরোক্ষ আত্মাকে বিসর্জ্জন করিয়া পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিচার করিয়া অহোরাত্র ভ্রামিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎকে পরোক্ষ করিয়া অপরোক্ষ পরব্রহ্মকে বিসর্জ্জন করে সে মূর্খ বিশ্বেই বিলীন হয়। শ্রীভগবান শিব তাই বলিয়াছেন :—

"অপরোক্ষং চিদানন্দং পূর্ণং ত্যক্ত্বা প্রমাকুলম্।
পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ কৃত্বা মূঢ়া ভ্রমন্তিবৈ॥
চরাচরমিদং বিশ্বং পরোক্ষং য করোতি চ।
অপরোক্ষং পরংব্রহ্ম ত্যক্তং তস্মিন্ বিলীয়তে॥"

যাহাহউক মন্ত্রযোগের মহাভাব, হঠযোগের মহাবোধ এবং লয়যোগের মহালয় নামক ত্রিবিধ সমাধি দ্বারাই যোগীর চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার পক্ষে প্রায় সম্পূর্ণ সহায়তা হইয়া

* সদ্বস্তু ব্রহ্মের উপর অসদ্বস্তু জগৎকে আরোপ করা।
† ব্রহ্ম বস্তুতে অবস্তুরূপ অজ্ঞান ভ্রম নাশ হওয়া।

থাকে। এই তিন সমাধিই সবিকল্প শ্রেণীর। পূর্ব্বে বলা হই-য়াছে, লয়যোগ পর্য্যন্ত সাধক চিত্তের মনোপ্রধান বৃত্তিগুলিরই লয় সাধন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তখন অন্তঃকরণের সেই চঞ্চল বৃত্তি-কেই তিনি আয়ত্ব করিয়া ছিলেন; কারণ লয়যোগের অধিকার এই পর্য্যন্তই ছিল। তাহার পরবর্ত্তী অন্তঃকরণের প্রকৃত চিত্তরূপ অবস্থা, যাহাতে মন ও বুদ্ধি-সম্ভূত কর্ম্মের স্মৃতি বিজড়িত থাকে, তাহার বিলয় না হইবার কারণ, চিত্তবৃত্তির মূল একেবারে উৎ-পাটিত হইতে পারে নাই। সুতরাং এ পর্য্যন্ত মন্ত্র, হঠ বা লয় যোগের যে কোনও সমাধি-দশায় চিত্তবৃত্তির পুনরুত্থানের সম্ভা-বনা থাকে। সাধক লয়-সমাধির পর হইতেই উন্নত জ্ঞান-সম্বন্ধ-যুক্ত দেবদুর্লভ রাজযোগের নির্ব্বিকল্প-সমাধিভূমি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এইভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমোন্নত সাধনার ফলে সাধক ক্রমে ষোড়শাঙ্গ রাজযোগের ক্রিয়ার শেষ প্রান্তে আসিয়া যে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া থাকেন, তাহার লক্ষ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত আছে—"পরমাত্মা সকল নিস্কল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, মোক্ষদ্বার-বিনি-র্গত, মুক্তির হেতু, অব্যয় ও পরব্রহ্মস্বরূপ; ইনিই অন্তিমরূপী জ্যোতিঃস্বরূপ, সর্ব্বভূতের আশ্রয়স্বরূপ, সর্ব্বব্যাপক, চেতনাধার, আত্মা ও পরমাত্মাময় ব্রহ্ম। যে সাধক নিরন্তর "আমিই সমস্ত বিশ্ব ও ব্রহ্ম স্বরূপ" এইরূপ বিচার করিতে পারেন, তিনি যে প্রকার আচারী হউন না স্বয়ং অখিল কামনার বিনাশ সাধন করিয়া প্রকাশবান ও অবিনাশী পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারেন। সর্ব্বযোগশ্রেষ্ঠ এই অন্তিম রাজযোগের দ্বারাই তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

"ভাববৃত্ত্যাহি ভাবত্বং শূন্যবৃত্ত্যা হি শূন্যতাম্।
ব্রহ্মবৃত্ত্যা হি পূর্ণত্বং তথা পূর্ণত্বমভ্যসেৎ॥
যেষাং বৃত্তিঃ সমাবৃদ্ধা পরিপক্কা চ সা পুনঃ।

তে বৈ সন্ব্রহ্মতাং প্রাপ্তা নেতরে শব্দবাদিনঃ ॥
কুশলা ব্রহ্মবার্ত্তায়াঃ বৃত্তিহীনাঃ সুরাগিণঃ।
তেঽপ্যজ্ঞানী তথা ন্যূন পুনরায়াতি যান্তি চ ॥"

যখন অন্তঃকরণে সৃষ্টিভাব-বিশেষের উদয় হয়, তখন অন্তঃকরণ সেই ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, যখন অন্তঃকরণে শূন্যতত্ত্বের উদয় হয়, তখনই তাহা বৃত্তিশূন্যতা অবস্থায় পরিণত হয়, এবং যখন পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-বিধ সাধনদ্বারা অন্তঃকরণ ব্রহ্মভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে, তখনই ব্রহ্মপদের উদয় হয়। এই কারণ এই শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিবার জন্য শ্রীগুরুদত্ত সাধন-ক্রিয়ার অভ্যাস করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহাতে অন্তঃকরণে অন্যান্য বৃত্তি নাশ হইয়া সাধনার পরিপক্ক অবস্থায় যখন ব্রহ্মভাবের উদয় হইতে থাকে, তখন সাধকের এই শ্রেষ্ঠ অবস্থা বলিতে হইবে। নতুবা সাধনা-বিহীন ব্যক্তি কেবল বাচিক-জ্ঞানী বা বচনসর্ব্বস্ব হইয়া পড়েন। যে ব্যক্তি ব্রহ্মের অনুভব ব্যতীত কেবল বাক্যের দ্বারাই ব্রহ্মভাব প্রকাশ করিতে যত্ন করেন, তাহাকে শাস্ত্র অজ্ঞানী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাকে পুনঃ পুনঃ গমনাগমনের দ্বারা সংসার পরিভ্রমণ করিতে হয়। সুতরাং সাধক নিরন্তর পূর্ব্ব কথিতরূপ যোগানুষ্ঠানে রত থাকিবেন। যিনি সর্ব্বদা এই যোগ-সাধন করেন, তিনি অল্পকালের মধ্যেই বাসনাশূন্য হইতে পারেন। তৎকালে সেই যোগীর এইরূপ ধারণা হয় যে, এই জগতে অহং পদ-বাচ্য আর কেহই নাই, কেবল একমাত্র আত্মাই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। এই জগতে বন্ধনও নাই মুক্তিও নাই, কারণ সেই সময় সেই যোগী সর্ব্বদা একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই দেখিতে পান না, যে সাধক প্রতিদিন এইরূপ অভ্যাস করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ সন্দেহ নাই।

রাজযোগী সতত সঙ্গ-বিবর্জ্জিত হইয়া জ্ঞানলাভ করিবার উদ্দেশে সমুদায় ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া বিষয়-ভোগ-বিরহিত

সুষুপ্তাবস্থার * ন্যায় নিঃসঙ্গ হইয়া অবস্থান করিবেন। নিয়ত এইরূপ অভ্যাস করিলে, স্বপ্রকাশ পরমাত্মা স্বয়ংই প্রকাশমান হন। সেই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের আলোচনা দ্বারা স্বয়ং জ্ঞান সমুদিত হয়। বাক্য ও মন যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া প্রতি-নিবৃত্ত হয়, এই ব্রহ্ম-সাধনদ্বারা সেই নির্ম্মল জ্ঞান স্বয়ংই তখন প্রকাশমান হইয়া থাকে। "জ্ঞানপ্রদীপে" এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাধি-মূলক জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনাই প্রধানতম লক্ষ্য।

বৈরাগ্য ও চতুর্থাশ্রম।

মন্ত্র, হঠ ও লয়াদি যোগ-সিদ্ধ সাধক যখন অবিরত অভ্যাস ও জ্ঞান-সাধনার দ্বারা নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার করিতে সমর্থ হন, যখন মহামায়ার বিশ্ববিমোহিনী মায়াজাল-রহস্য বা সংসারের অনিত্যতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারেন, তখনই তাঁহার হৃদয়ে সংসার-বিরাগের ভাব উদয় হয়; অথবা এই সংসার যে সম্পূর্ণ মিথ্যা-প্রপঞ্চে পরিপূর্ণ, এইরূপ অনুভব হইলেও, সাধ-কের মনে বৈরাগ্যের ছায়া পড়ে। নিত্য পরিবর্ত্তনশীল সংসারে বা বিষয়ে আসক্তিই দুঃখের কারণ, সেই বিষয়ের আসক্তি কোন-রূপে শিথিল করিতে পারিলেই, সাধকের প্রকৃত সুখোদয় হয়। কিন্তু সেই বিষয়সমূহের মধ্যে সর্ব্বত্র তাহার দোষ পরিলক্ষিত না হইলে ত সহজে তাহাতে বিতৃষ্ণা জন্মিবে না! তাই পূজ্যপাদ অষ্টাবক্রদেব রাজর্ষি শ্রীমদ্ জনককে জ্ঞান-বৈরাগ্যের উপদেশ

---

* সুষুপ্তি ও নির্ব্বিকল্প সমাধিতে প্রভেদ এই যে, সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণে ব্রহ্মা-কার বৃত্তি থাকে না, কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অন্তঃকরণে সদৈব ব্রহ্মাকার বৃত্তি বিদ্যমান থাকে, কোন সময় তাহার অভাব হয় না। অর্থাৎ সুষুপ্তিতে বৃত্তি সহিত অন্তঃকরণ লয় হইয়া যায় এবং নির্ব্বিকল্প সমাধিতে বৃত্তি সহিত অন্তঃকরণ বিদ্যমান থাকিলেও উহার প্রতীতি হয় না। এই কারণ এই সমাধি কালে যোগীর দেহ নিদ্রিতের ন্যায় ভূপতিত হয় না। সবিকল্প সমাধির নিত্য অভ্যাসদ্বারাই ইহা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

দিবার সময় প্রথমেই বলিয়াছেন :—

"মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবদ্ভজ॥"

অর্থাৎ হে তাত! যদি মুক্তির ইচ্ছা হয়, তবে বিষয়-বাসনাসমূহকে বিষের তুল্য বিবেচনা করিয়া সত্বর তাহা পরিত্যাগ কর এবং তৎপরিবর্ত্তে ক্ষমা, সরলতা, দয়া; সন্তোষ ও সত্যবস্তুকে অমৃত-তুল্য জ্ঞান করিয়া সতত তাহাদের ভজনা কর। তাহা হইলেই বৈরাগ্যের উদয় হইবে। পরমযোগী শ্রীমদ্ দত্তাত্রেয়দেবও অলর্ক-রাজকে বিষয়-বাসনা ত্যাগের উপদেশ ক্রমে বলিয়াছেন :—

"তস্মাৎ সঙ্গং প্রযত্নেন মুমুক্ষুঃ সন্ত্যজেন্নরঃ।
সঙ্গাভাবে মমেত্যস্যাঃ খ্যাতের্হানিঃ প্রজায়তে॥
নির্ম্মমত্বং সুখায়ৈব বৈরাগ্যাদ্দোষদর্শনম্।
জ্ঞানাদেব চ বৈরাগ্যং জ্ঞানং বৈরাগ্যপূর্ব্বকম্॥"

অর্থাৎ হে রাজন্, জীবের চিত্ত বিষয়ে মমত্বরূপ মোহিনী-মায়াতে আসক্ত হইলেই ভবদুঃখের আবির্ভাব হয়। সেই কারণ মুমুক্ষু অর্থাৎ মুক্তিকামী মানব অতীব যত্ন-সহকারে সেই সংসার-দুঃখ-কারণ মমত্ব বা বিষয়াসক্তির সঙ্গও ত্যাগ করিবে। সেই সঙ্গের অভাব হইলেই, অর্থাৎ বিষয়ভোগে অনাসক্তির ভাব আসিলেই অন্তঃকরণের অহঙ্কাররূপ আমিত্বের বা "আমার" এই জ্ঞানের বিনাশ-প্রাপ্ত হইবে। তখনই যোগরত সাধকের সংসারে নির্ম্মমত্ব বা মমতা-বিহীনতাদ্বারা সুখোৎপত্তি হইতে থাকিবে এবং সেই নিত্য-সুখের কারণভূত অন্তরে যে বৈরাগ্যের ভাব উপস্থিত হইবে, তাহাদ্বারাই এই সংসার মিথ্যারূপে প্রতীত হইতে থাকিবে। এই সংসার-বৈরাগ্য কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, এই কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানই বৈরাগ্যের মূলীভূত কারণ-স্বরূপ। অজ্ঞান-মোহে জীবের হৃদয়-অন্তর-বাহির পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কাররূপে তাহা স্তূপীকৃত আবর্জ্জনায়

পরিণত হইয়াছে, তাহার পূতিগন্ধও নিত্য-সহযোগে উৎকট বলিয়া আর অনুভব হয় না, অধঃপতিত সাধারণ জীব তাহারই মধ্যে সতত পড়িয়া থাকিতে ভালবাসে, বিষ্ঠার ক্রিমি যেমন বিষ্ঠা ছাড়িয়া পবিত্র পুষ্প-সৌরভ সহসা সহ্য করিতে পারে না, মোহান্ধ জীবও সেইরূপ সহসা বিবেক-জ্যোতিঃ দেখিতে পায় না বা সহ্য করিতে পারে না। যদি কোনরূপে তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফলের প্রারব্ধবশে শ্রীগুরুদেবের কৃপায় হৃদয় পবিত্র হয়, ভক্তির বিমল-ধারা অন্তরে একবার সঞ্চিত হয়, তাহা হইলেই কোন দিন না কোন দিন বিবেক-প্রবাহে জ্ঞান-বৈরাগ্যের অবিরোধ তুমুল বন্যায় অন্তরের অন্তস্থল হইতেও সেই চির-সঞ্চিত সংসার-বৃত্তিরূপ আবর্জ্জনারাশি বিধৌত করিয়া কোথায় যে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, তাহার সন্ধানও পাওয়া যাইবে না! মনের অগোচরে চির-পরিপুষ্ট সংসার-সংস্কার-নাশই বৈরাগ্য। নতুবা কেবল অনিত্য সংসার-সুখ-ভোগে বিঘ্নানুভব-হেতু কাতর হইয়া সাময়িক বিবেক-বৈরাগ্যের বশে উন্মত্ত হইয়া বাহিরের এই সংসার-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত বৈরাগীর বৈরাগ্যভাব কখনই শান্তিপ্রদ হইতে পারে না। সময়ে প্রবৃত্তি-সম্পর্কে পুনরায় তাহা অশান্তিরই কারণ হইবে। মনের শতধা-বিক্ষিপ্ত অবস্থার নাশই বৈরাগ্য। ইন্দ্রিয়ারাম অনুগত বিষয়াসক্ত মন লইয়া কেবল মুখের কথায় বৈরাগ্য আলোচনা করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না। শুধু বাহ্যত্যাগরূপে সন্ন্যাসীবেশে বিচরণ করিলেও চলিবে না; অন্তর-বাহির সমান করিতে হইবে, বিষয়ের স্তরে স্তরে দোষ পরিদর্শনরূপ অভ্যাস-যোগ সাধনা করিতে হইবে, তবেই শাস্ত্রকথিত বিমল বৈরাগ্যের উদয় হইবে, জীবের ঘোর সংসার-যাতনা-নিবারণের উপায় হইবে ও অন্তরে তখনই প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইবে। শ্রীমন্মহর্ষি বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশ-প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—

"শাস্ত্রসজ্জনসংসর্গপূর্ব্বকৈঃ সতপোদমৈঃ।

আদৌ সংসারমুক্ত্যর্থং প্রজ্ঞামেবাতিবর্দ্ধয়েৎ ॥”

এই দারুণ সংসার-যাতনা নিবারণের নিমিত্ত সদা শাস্ত্রালোচনা কর, সাধুসঙ্গ কর, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কর এবং তপস্যাদ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি কর, তাহা হইলেই আপনাআপনি বৈরাগ্যের উদয় হইবে, দৃঢ়-বৈরাগ্যের দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ হইবে। (অবিদ্যা নাশের উপায়সম্বন্ধে সপ্তমোল্লাসে ‘মুক্তিতত্ত্ব’ মধ্যে আলোচিত হইয়াছে।) অবিদ্যার বিনাশ হইলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাতেই জীব আত্মাকে জানিতে পারে। সেই আত্মজ্ঞানলাভেই জীবের ভব-যন্ত্রণা দূর হয়। মণিরত্নমালায় এই কথাই শ্রীভগবান প্রশ্নোত্তরে কেমন সংক্ষেপে অত্যুজ্জ্বল নিত্য-মণিকণার মালার ন্যায় গ্রথিত করিয়াছেন ঃ—

“বন্ধো হি কো? যো বিষয়ানুরাগঃ।
কোবা বিমুক্তঃ? বিষয়ে বিরক্তিঃ ॥

বন্ধন কাহাকে বলে? বিষয়-ভোগে মনের যে অবিরত অনুরাগ তাহারই নাম বন্ধন। আর মুক্তি কাহাকে বলে? বিষয়-বাসনা-রাহিত্য বা বিষয়ে বিরক্তি অর্থাৎ তাহাতে বৈরাগ্যই মুক্তির কারণ বলিয়া সর্ব্বদা অভিহিত। শ্রীমন্মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন ঃ—

“অতএব শনৈশ্চিত্তং প্রসক্তমসতাং পথি।
ভক্তিযোগেন তীব্রেণ বিরক্ত্যা চ নয়েদ্বশম্ ॥”

অতএব সংসার নিস্তার-কামী মুমুক্ষু-পুরুষ সুদৃঢ় ভক্তিযোগে ও বৈরাগ্য-অবলম্বনদ্বারা চিত্তকে ধীরে ধীরে বশীভূত করিয়া অসৎ-পথ বা বিষয় বাসনা হইতে নিবৃত্ত হইবেন।

“দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥”

দৃষ্ট বিষয় অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, ধন-ঐশ্বর্য্যাদি লৌকিক বিষয় এবং আনুশ্রবিক বিষয় অর্থাৎ স্বর্গাদি ভোগরূপ পারলৌকিক বিষয়-সমূহের সম্বন্ধদ্বারা যখন অন্তঃকরণে আর তাহাদের আকর্ষণ থাকে না বা তাহাতে বিতৃষ্ণা অনুভব হইতে থাকে, তখনই সাধ-

কান্তঃকরণে সেই আসক্তি-রহিত অবস্থাকে বৈরাগ্য কহে। শাস্ত্রে বৈরাগ্যের চারি অবস্থার উল্লেখ আছে। যথা (১) যতমান সংজ্ঞা, (২) ব্যতিরেক সংজ্ঞা, (৩) একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা, (৪) বশীকার সংজ্ঞা। সাধকের এই চারিপ্রকার বৈরাগ্য অবস্থায় পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ যথাক্রমে মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র ও পর-ভেদে চতুর্ব্বিধ বৈরাগ্যের লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন।

১ম। যতমান বা মৃদু বৈরাগ্য।

শ্রীগুরু-কৃপায় যখন সাধক শাস্ত্রমর্ম্ম অবগত হইয়া সকল বস্তুর মধ্যে সদসৎ বিচার করিতে অভিলাষ করেন অর্থাৎ বিশ্বসংসারের মধ্যে সার কি এবং অসারই বা কি? এই সমস্ত জানিতে যত্নবান হন; সাধকের অন্তঃকরণের এই ভাবকে 'যতমান' অবস্থা বলা হয়। এই অবস্থায় বিবেকী ব্যক্তির ইহ-পরলোক-সম্বন্ধীয় বিষয় সকলের মধ্যে দোষ দৃষ্ট হইবার কারণ, হৃদয়ে যে প্রথম বৈরাগ্যের ভাব উদয় হয়, ইহাকেই প্রথম বা 'মৃদু বৈরাগ্য" বলা যায়। ইহাতে সাধকের বিষয়-বাসনাকে বিনষ্ট করিবার প্রথম চেষ্টা জন্মে। ইহাই বৈরাগ্যের প্রথম অবস্থা।

২য়। ব্যতিরেক বা মধ্য বৈরাগ্য।

এই প্রথম বৈরাগ্য-সাধনার ফলে যখন সাধক বেশ অনুভব করিতে থাকেন যে, তুচ্ছ বিষয়ের তৃষ্ণা ক্রমেই ক্ষয় হইতেছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে এই অনিত্য বিষয়ে কি পরিমাণ আসক্তি ছিল, এক্ষণে তাহা অপেক্ষা কত অল্পতর হইয়াছে, চিত্তের সেই অবস্থাকে দ্বিতীয় বা ব্যতিরেক অবস্থা বলে। বিবেক-ভূমিতে এইভাবে অগ্রসর হইতে হইতে সাধকের ইহ-পরলোক-সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহে অরুচি হইয়া থাকে, ইহাকেই শাস্ত্রে "মধ্য বৈরাগ্য" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই অবস্থায় কতক বাসনা থাকে, কতক নষ্ট হইয়া যায়; যাহা থাকে, এই দ্বিতীয় বৈরাগ্য অবস্থাতেই তাহা নষ্ট করিবার প্রযত্ন হয়।

অনন্তর ভবদুঃখের কারণ-স্বরূপ বিষয়সমূহে বিষবৎ অনুভব-

দ্বারা সাধকের ইন্দ্রিয়গুলি স্পৃহাশূন্য হইলেও অন্তঃকরণে তাহাদের তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থাকেই বৈরাগ্যের তৃতীয় বা একেন্দ্রিয় দশা বলা যায়। এই সময়েই সাধকের বিষয়ভোগে প্রত্যক্ষ দুঃখ প্রতীত হইতে থাকে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ তখন বিষয়-সম্পর্ক একেবারেই পরিহার করিয়াছে, কেবল অন্তঃকরণে বিষয়ভোগের স্মৃতি বা সংস্কারমাত্র মধ্যে মধ্যে উদয় হইতেছে, কিন্তু বিবেক-বুদ্ধি তাঁহাতে তীব্র প্রতিকূলতাচরণ করায় সেই চির-দুঃখপ্রদ ভীষণ বিষয়-বাসনা চিত্তে আর স্থান পাইতেছেনা। ইহাকেই যোগাচার্য্য মহর্ষিগণ "অধিমাত্র" বৈরাগ্যের লক্ষণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

৩য়। একেন্দ্রিয় বা অধিমাত্র বৈরাগ্য।

ইহার পর চিত্ত হইতে বিষয়-তৃষ্ণা বা তাহার স্মৃতিমাত্রও বিলুপ্ত হইয়া যাইলে, অন্তঃকরণের যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহাকে "বশীকার" বৈরাগ্য বলে। এক্ষণে কি লৌকিক কি পারলৌকিক সকল বিষয়ের সহিতই যোগিবরের অন্তঃকরণ একেবারে সংস্কারশূন্য হইয়া অন্তরমুখী হইয়া যায়। ইহাকেই পরম পূজ্যপাদ যোগাচার্য্যগণ "পর-বৈরাগ্যের" লক্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

৪র্থ। বশীকার বা পর-বৈরাগ্য।

মুক্তিকামী সাধক ধারাবাহিক সাধনাদ্বারা ধীরে ধীরে এই চতুর্ব্বিধ বৈরাগ্য-পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হন। বাস্তবিক একেবারেই কখন কাহারও তীব্র বা চরম বৈরাগ্য হইতে পারে না। সকলকেই ক্রমোন্নত পথে অগ্রসর হইতে হয়। বিষয় কি এমনই জিনিস যে, মনে করিলেই ত্যাগ করা যায়! কত লক্ষ লক্ষ জন্মের সহিত যাহার সম্পর্ক, অস্থি মজ্জায় যাহা বিজড়িত হইয়া গিয়াছে প্রাণ ও মনের সহিতও যাহা একীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহা কি ইচ্ছা করিলেই ছাড়ান যায়? জীবের সাধ্য কি যে, এক মুহূর্ত্তও তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন

বৈরাগ্য-সিদ্ধির উপায় ও ফল।

থাকিতে পারে ? তবে ভববন্ধন-মুক্তির একমাত্র অধিপতি সেই পরমাত্মাই জীবাত্মাকে কৃপা করিলে বা পুরুষাকাররূপে সাধককে শক্তি প্রদান করিলেই বদ্ধ জীবের ক্রমে বৈরাগ্যের উদয় হয়। এই কারণে মন্ত্রাদি যোগচতুষ্টয়ের সাধনপথেই সকলকে অগ্রসর হইতে হয়। ভক্তিমূলক বিধিবদ্ধ যোগানুষ্ঠানের সহিত সাধক অগ্রসর হইলে, ইহলৌকিক বিষয় সকলের অনিত্যতারূপ দোষ প্রথমেই উপলব্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং তদ্বারা প্রবৃত্তিমার্গ্যে ইন্দ্রিয়ভোগ-বাসনা সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চিত্তে কি এক অজ্ঞাত সুখের তরঙ্গ উত্থিত হইতে থাকে। তখন সাধক একান্ত-বাস ও অধ্যাত্ম-জ্ঞান-পূর্ণ উপাসনা লাভ করিবার জন্য কখনও বা যোগী, সাধু-সজ্জনের কৃপালাভে যত্নবান হন, কখন বা বৈরাগ্য-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি পাঠে মনোনিবেশ করেন। ইহার ফলে ক্রমে স্বর্গাদি পারলৌকিক বিষয়ও যে অনিত্য, তাহাও উপলব্ধি করিয়া উভয়বিধ বিষয়ই যখন বিবিধ দোষযুক্ত অনুভব করিতে থাকেন, অর্থাৎ উভয় প্রকার বিষয়ই যখন বন্ধনের কারণ বলিয়া বুঝিতে পারেন, তখন ইন্দ্রিয়সমূহকে কি প্রকারে বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্তি করিতে পারা যায়, তাহারই চেষ্টায় সাধক শ্রীগুরুকৃপায় ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বা তাহার দমনের উপায় হঠাদি ক্রিয়া ও অন্যান্য কর্ম্ম-যোগের অভ্যাস-সহযোগে পূর্ব্ব-সাধনায় আরও অগ্রসর হইতে থাকেন। ক্রমে লয়াদি ক্রিয়ার সাধনায় অন্তরেন্দ্রিয়সহ মনোবৃত্তি নিবৃত্তি হইলে, ইন্দ্রিয়মাত্রই ক্রমে বিষয়-স্পৃহা-পরিশূন্য হয়। বিষয়-সংসর্গ ত্যাগের সাধনায় অতি সূক্ষ্ম লয়ক্রিয়া যাহা পূজ্যপাদ আচার্য্যবৃন্দ উপদেশ প্রদান করেন, তাহার মর্ম্ম প্রিয়-তম বৈরাগ্যাভিলাষীর অবগতির জন্য নিম্নে বর্ণন করিতেছি।

ভববন্ধনপ্রদ বিষয়সমূহ, যাহা জীব তাহার কর্ম্ম ও জ্ঞানে-ন্দ্রিয়ের সাহায্যেই সতত অনুভব করে, তাহা সেই ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারাই ক্রমে ত্যাগ করিতে হয়। বিষয়-বাসনার সৃষ্টিকল্পে পর

পর চারিটী বস্তুতে তাহা সম্পর্ক-যুক্ত হইয়া জীবের অন্তঃকরণ বিষয়ানুগত হইয়া পড়ে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রা বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়পঞ্চকের সাহায্যে অন্তঃকরণে যাবতীয় বিষয়ের প্রতিবিম্ব-ছায়া বা প্রভাব পতিত হয়, অন্তঃকরণ সাধারণতঃ স্থূল বিষয়-তত্ত্ব পাইয়া সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণার অবসর পায় না, কিন্তু স্থূল-তত্ত্বাত্মক বিষয়গুলি তন্মাত্রার সাহায্যে অন্তঃকরণে পৌঁছাইয়া দিলেও স্থূল জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক অর্থাৎ কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকারূপ যন্ত্র-পাঁচটীই আলোকচিত্রের (Photographic lens) যন্ত্রের ন্যায় বিষয়ের প্রতিবিম্ব-ছায়া ধরিয়া লইয়া ভিতরে পুরিয়া দেয়, তখন 'পঞ্চ-তন্মাত্রারূপী জ্ঞানক্রিয়ামাত্রের সাহায্যে অন্তঃকরণের উপর ছায়ারূপে পাতিত করে; সুতরাং অন্তঃকরণরূপ আধার-ক্ষেত্র তদাকার বা সেই বাহ্যবিষয়যুক্ত হইয়া পড়ে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, প্রথম বিষয়-সমূহ, দ্বিতীয় জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকের আকর্ষণে বা আশ্রয়ে, তৃতীয় বস্তু পঞ্চ-জ্ঞানশক্তি বা তন্মাত্রার সহায়তায়, শেষ বা চতুর্থ বস্তু অন্তঃকরণরূপী আধার-ক্ষেত্রে আলোকচিত্রণের চিত্রগ্রাহী উপাদানযুক্ত কাচখণ্ড বা "প্লেটের" ন্যায় বিষয়ানুরূপ প্রতিবিম্ব-ছায়া বা আকার ধারণ করিয়া থাকে। অন্তঃকরণ যখন যে তন্মাত্রার সাহায্যে যে ইন্দ্রিয়-পথে বিষয়ের সহিত লিপ্ত হয়, তখন বৈরাগ্যাভিলাষী সাধক যদি সেই অনিত্য বিষয়টী পরিত্যাগ করিয়া তাহার ক্রিয়ামাত্রকে অন্তরমুখী করিয়া লইতে পারেন অর্থাৎ সেই ক্রিয়াপ্রবৃত্তিকে সূক্ষ্ম বা নিত্যবস্তুতে প্রয়োগ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার ধ্যান ও সমাধির-মূল বস্তু অন্তিম-বৈরাগ্যের সূচনা হইতে পারে। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, তন্মাত্রারূপী জ্ঞানশক্তি বিষয় ও বিষয়াতীত-বস্তুর উভয় দিকেই জ্ঞানরূপী মনকে নিয়োজিত করিতে পারে। উদাহরণছলে বলা যাইতে পারে—যে কোনও সময় রাগরাগিনীর বিশুদ্ধতা বজায় রাখিয়া সুর তাল ও লয়াদির

প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য-পূর্ব্বক গীতবাদ্যাদির আলাপনসময়ে শব্দ-তন্মাত্রা দ্বারা তাললয় সংযুক্ত সংগীতরূপ বিষয়ানন্দেই মন অভিভূত হয়, আবার কেবল একটী তানপুরা বা একতারা-সহযোগে নাদ সাধনা বা প্রকৃত আলাপনের সময়ে সেই শব্দতন্মাত্রাই মনের একাগ্রতা সম্পাদন করিয়া অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া লৌকিক-বিষয়ের লক্ষ্য ভুলাইয়া দেয় ও সঙ্গে সঙ্গে শব্দাত্মক নিত্য-বস্তুতেই চিত্ত পৌছাইয়া দিয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেক তন্মাত্রাই অন্তর ও বহির্ম্মুখ ভেদে উভয় দিকেই যে উৎম-বিধ গতিবিশিষ্ট, তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে। অতএব আলোক-চিত্রণের চিত্র-গ্রহণোপযোগী কাচখণ্ডের বা "প্লেটের" উপরি-ভাগে প্রলিপ্ত রাসায়নিক-ক্রিয়া-সিদ্ধ উপাদান-স্তর (Sensitised film), যাহাতে প্রতিবিম্বছায়া সংযুক্ত হইয়া যায়, আবার তাহারও অভাবে যেমন যন্ত্রমধ্যে চিত্র-প্রতিবিম্ব নীত হইলেও, সেই চিত্র কেবল খালি কাচে আবদ্ধ হইতে পারে না, সেইরূপ অন্তঃ-করণরূপ মানসক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ তন্মাত্রাদি-সাহায্যে অহরহঃ সমাগত হইলেও বিষয়াসক্তিরূপ উপাদান-বিহনে কোনও বিষয়েরই প্রতিবিম্ব বা ছায়া অন্তঃকরণ গ্রহণ করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রাদির স্বাভাবিক ক্রিয়া অথবা ধর্ম্ম এই যে, তাহারা সতত বিষয়ের রূপ অন্তরের মধ্যে পৌছাইয়া দিবেই, কিন্তু যোগ-বৈরাগ্যাভ্যাসী সাধক তাহার সাধনার ফলে সেই বিষয়ের অনিত্য স্থূলভাব পরিত্যাগ করিয়া তাহার মূলীভূত বা কারণরূপ সূক্ষ্মপথে নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান করেন। ইহাদ্বারা সাধক বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, বিষয়সমূহ সংসার-আবদ্ধের বা প্রবৃত্তির কারণ হইলেও, বিচারশীল যোগরত সাধকের পক্ষে অন্তরমুখী তন্মাত্রার সাহায্যে সেই বিষয়লব্ধ বিপরীত ক্রিয়ায় নিবৃত্তিরও কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ রূপাদি বিষয়গুলি প্রথমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইবামাত্র মনে যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া উৎ-

পাদন করিয়া দেয়, যোগী সেই ক্রিয়ামাত্রটী লইয়া, তখন তাহার কারণস্বরূপ বিষয়টীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বা বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বিজ্ঞানরূপ আবরণ-বস্ত্র বা পরদা রক্ষা করিলে, তাঁহার বিষয়-বাসনা নিবৃত্তি হইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃকরণের অন্তরমুখী ক্রিয়া পরিচালিত হইবে। অতএব যোগীর অন্তরে সেই বিষয়-সম্ভূত ক্রিয়ার উন্মেষণমাত্রই তখন বিদ্যমান থাকিবে, বিষয়ের ছায়া বা তাহার ভাব থাকিবে না। সাধক সেই অবসরে সেই উন্মেষিত ক্রিয়ার পথ ধরিয়া অন্তর-রাজ্যের সারধন নিত্যবস্তুতেই পুনঃ পুনঃ মিলিত হইতে যত্ন করিলে, অচিরে তাঁহার বিষয়-বাসনা-বিরহিত চির-মুক্তিপ্রদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পর-বৈরাগ্যের ভাব উদয় হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পর-বৈরাগ্যের পূর্ব্বে স্থূল-বিষয়জাত অন্তরের ক্রিয়াগুলিদ্বারাই সাধক অন্তরমুখী সূক্ষ্ম-বিষয় বা নিত্যবস্তুতে চিত্ত নিয়োগ করিবার অবসর পান। এ অবস্থায় বাহ্য-বিষয় হইতেই অন্তঃকরণে অন্তর-ক্রিয়ার উদয় হয়, নতুবা নিত্যবস্তুর অনুসন্ধানে কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তিও অন্তঃকরণের থাকে না। তাই তন্ত্রের গভীর রহস্যপূর্ণ শিবোক্ত গুপ্ত-উপদেশ—"অভ্যস্থ প্রবৃত্তির পথ দিয়া নিবৃত্তির সাধনাই সহজ ও সিদ্ধিপ্রদ।" তবে এই সাধনা সম্পূর্ণ নিবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সিদ্ধ ও অভিজ্ঞ গুরুর উপদেশই যে সম্পাদন করিতে হয়, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব খণ্ডে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে।

সৎ ও চিতের মিলনেই যে আনন্দের বিকাশ, তাহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। আনন্দই বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ। যখন পরমাত্মা সৎ ও চিৎ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষভাবে দ্বিধাভূত হন, তাঁহার সেই উভয় সত্তার সহযোগে যে আনন্দসত্তার আবির্ভাব হয়; তাহাতেই এই ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ হইয়াছে। এই আনন্দই পরমানন্দ। এই কারণেই সেই সৎ বা জড়াপ্রকৃতির অতি স্থূলরূপ প্রকৃতির প্রাকৃতিক বিষয়-সহযোগে চিৎ বা চৈতন্যমলীনাংশরূপ

জীবের অন্তরে বা আত্মায় যে আনন্দ অনুভব হয়, তাহা তাহারই আভাস মাত্র, তাহাকেই লোকে সুখ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সর্ব্বত্রই সেই সর্ব্বব্যাপক সৎ ও চিতের মিলনীভূত আনন্দাভাসে সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতেই জীবজগৎরূপ সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমেই সুখানুবোধ ও তাহারই ফলে সংসারে সৃষ্টিস্বরূপ মহামায়ার অপূর্ব্ব লীলা সতত বিকশিত হইতেছে। বাহিরে যাঁহার বিকাশে বিষয়মাত্রই ইন্দ্রিয়-পথাবলম্বনে অন্তঃকরণ স্পর্শ করে, অন্তঃকরণের অধিপতি জীবাত্মা তাঁহারই প্রতিরূপে তাহা অনুভব করিতে থাকিলেও, অবিদ্যা-প্রভাবে বিষয়মোহে তাঁহাকেই তখন ভুলিয়া যায় ও আপনাকে স্বাধীনজীব-ভাবনায় বা আত্মপ্রধানতায় সংসার-পাশে বদ্ধ হইয়া পড়ে।

একটী সুন্দর কমল নয়নেন্দ্রিয় বা দৃষ্টি-যন্ত্রের সাহায্যে তাহার বিচিত্র সৌন্দর্য্য লইয়া যখন ভিতরে প্রবিষ্ট হয়, তখনই রূপ-তন্মাত্রা-সহযোগে অন্তঃকরণে তাহা নীত হয়; এই ভাবে তাহার সৌরভ ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা নাসিকা-যন্ত্রের দ্বারা গন্ধ-তন্মাত্রার সহায়তায়, তাহার সুকোমলত্বরূপ স্নিগ্ধভাব ত্বগেন্দ্রিয় বা ত্বক্-যন্ত্রের দ্বারা স্পর্শ-তন্মাত্রার সহায়তায়, তাহার অন্তর্নিহিত মধু রসনেন্দ্রিয় বা জিহ্বা-যন্ত্রের দ্বারা রসতন্মাত্রার সহায়তায় এবং সেই মনোরম কমলের সহিত এক মধুলোভী ভ্রমরের কল-গুঞ্জন শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণ-যন্ত্রের দ্বারা শব্দ-তন্মাত্রার সাহায্যে অন্তঃকরণে পৌছাইয়া দিল। জীবাত্মা এতক্ষণ সেই অন্তঃকরণের অধিপতিরূপে পাঁচ-দিক হইতে কমলরূপ বিষয়টীর সংস্পর্শে আনন্দাভাস সুখের কতইনা অনুভব করিল, তাহাতে মুগ্ধ হইল, তখন পুনঃ পুনঃ তাহার দর্শন ও ঘ্রাণাদির আকাঙ্ক্ষায় বা তাহার সুখ-স্পৃহার অন্তঃকরণও ইন্দ্রিয়ানুগত হইয়া ইন্দ্রিয়-পঞ্চককে উন্মুখী করিয়া রাখিল; বিষয়-ভোগে তন্ময় হইয়া রহিল। এই প্রকারেই জীবাত্মা বা তদনুগত অন্তঃকরণ সতত স্ত্রী, পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য, মান,

মর্য্যাদা, পুণ্য ও স্বর্গাদি নানা বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া থাকিবার কারণ চঞ্চল হইয়া পড়ায়, আর সেই আদি চৈতন্যসত্তার প্রতি লক্ষ্য করিতে অবসর পায় না, ফলে জীব মায়ার ছলনায় তখন বিমুগ্ধ হইয়া যায়। ইহাই জীবের বন্ধনের কারণ। এক্ষণে মুক্তিকামী সাধক শ্রীগুরু-কৃপায় তৎপ্রদত্ত সাধন-বিজ্ঞানের সাহায্যে বিচার করিয়া দেখুন যে, সেই বিষয়ই অন্তরে প্রকৃত সুখের কারণ কি না? যদি ঐ বিষয়টী যথার্থ বা নিত্য-সুখের কারণ হইত, তাহা হইলে ত সংসারে জীবের কখনই দুঃখ হইত না! বোধ হয় 'দুঃখ' বলিয়া এই শব্দের সৃষ্টিও হইত না। যে বিষয় এক সময় সুখের কারণ বলিয়া বোধ হয়, সময়ান্তরে তাহাই সেরূপ সুখদায়ী থাকে না অথবা তাহার অন্তরায় হইতেও দেখা যায়। সৌরভপূর্ণ মাল্য-চন্দন ও বণিতাদি যে সকল লৌকিক-বস্তু সদা সুখদায়ী বলিয়া জীব মনে করে, দেশ, কাল ও পাত্রাদির অবস্থা-ভেদে তাহাই কখন দুঃখ, কখন সুখ, কখন ঈর্ষা, আবার কখন ক্রোধোদ্দীপক হইয়া থাকে। শীতের সময় অগ্নি, তৃষ্ণায় জল, ক্ষুধায় অন্ন সুখপ্রদ হইলেও, তাহার বিপরীত সময়ে সেই সকল দ্রব্যই আবার দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। প্রখর গ্রীষ্মে অগ্নি আর ভাল লাগে না, শীতের সময় জল বা যে কোন শীতল বস্তু হইতে দূরে থাকিতে হয়, উদর পূর্ণ হইলে অতি উপাদেয় অন্নও বিষবৎ মনে হয়, এইরূপ শব্দ-স্পর্শাদির অনুগত বিষয়সমূহের কিছুতেই অবিচ্ছিন্ন আনন্দ নাই। কেবল মনের চঞ্চলতায় ক্ষণকালের জন্য তাহাতে সুখ-প্রবৃত্তি হয় মাত্র। পাঠকের বুঝিবার সুবিধার জন্য আর একটু খুলিয়া বলিঃ—

পূর্ব্বে যে কমলের কথা বলিতেছিলাম, যাহা সকল ইন্দ্রিয়ের সুখের হেতু বলিয়া এক সময় মনে হইতেছিল, কোনও কারণ বশতঃ হৃদয়ে সহসা ক্রোধ বা শোক-দুঃখের উদয় হইয়াছে, সেই সময় কেহ তাহা-অপেক্ষাও সুন্দর একটী কমল আনিয়া

সম্মুখে ধরিলে, তাহা পূর্ব্বানুরূপ আনন্দপ্রদ হয় কি? হয় ত তাহা দেখিয়াও তখন দেখিবে না বা অবজ্ঞা, কি ক্রোধভরে তাহা দূরে ফেলিয়াই দিবে। কারণ তাহা যে তোমার তখন ভালই লাগিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সেই কমল সতত বা নিত্য-সুখদায়ক নহে এবং ইহাদ্বারা আরও বুঝা যাইতেছে যে, স্থূল ইন্দ্রিয়সমূহও সুখের আধারভূত নহে। কারণ সে সময় চক্ষু কর্ণাদি স্থূল-ইন্দ্রিয়ের কিছুরই ত লোপ হয় নাই, তন্মাত্রা-পঞ্চক ও অন্তঃকরণ তখনও ত বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তখন কিছুতেই সেই কমলরূপ বিষয় সুখের সম্বন্ধ আদৌ নাই। ইহাদ্বারা নিশ্চয় হইতেছে যে, কোন বিষয়েই সদা সুখ নাই, ইন্দ্রিয়ের সহিত তন্মাত্রাদিতেও সুখ অনুভব হয় না, অন্তঃ-করণও বিষয়-সুখ ভোগ করে না। আনন্দাভাসরূপ অনিত্য সুখের ভোগ-কর্ত্তা মায়ামুগ্ধ-জীবের আত্মা বা জীবাত্মা। যখন সেই আত্মা, অন্তঃকরণ, তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত একতান প্রাপ্ত হয়, তখনই বিষয়ে অস্থায়ী সুখের সঞ্চার বোধ হয়, নতুবা বিষয় অনেক সময় দুঃখেরও কারণ হইতে দেখা যায়।

চৈতন্যময় আত্মাই আত্মাতে প্রেম করে! জীব—স্বামী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, স্বজন সকলকে ভাল বাসে, তাহাদের সঙ্গ করে, সেও কেবল তাহাদের অন্তরস্থিত আমিরস্বরূপ আত্মার জন্য। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কোনও আত্মার দেহত্যাগ ঘটে, তাহা-হইলে সেই স্থূল দেহটীকে লইয়া কেহ ক্ষণমাত্রও আর সঙ্গে রাখে না। বরং সেই দেহের পরিচালক বা তাহারই অন্তরস্থিত কোন বস্তু সূক্ষ্মরূপে কোথা দিয়া যে চলিয়া গেল, যাহার অভাবেই জীব কত শোক ও দুঃখ বোধ করিতে থাকে! সেই প্রত্যক্ষ স্থূলদেহটী সম্মুখে পড়িয়া থাকিলেও, তাহার আত্মীয়-গণ—কেহ "তুমি কোথা গেলে গো," কেহ বা "বাবা! কোথা গেলে গো," "বাপ! প্রাণের পুতুল, নয়ন-তারা, একবার আয়,

একবার মা বলে ডাক," "একবার বাবা বলে দুটো কথা ক" ইত্যাদি" এই ভাবে কাতর হইয়া কতই তাহাকে ডাকিতে থাকে। সুতরাং কেবল আত্মার অভাবেই স্থূল দেহখানি যে তখন সুখপ্রদ না হইয়া দারুণ দুঃখেরই কারণ হইয়া পড়িয়াছে তাহা বলিতে হইবে।

মায়া বা অবিদ্যা-রাজ্যে সমস্তই পরিণামশীল হইবার জন্যই আজ একরূপ, কাল অন্যরূপ; এখন একভাব, পরক্ষণে অন্য ভাব হইতেছে। অতএব যাহা পরিণামশীল, তাহা যতই সুখ-প্রদ হউক না, এক সময় অবশ্যই দারুণ দুঃখদায়ী হইবেই। আজ যে দেহ ননীতে গড়া, কমলের ন্যায় কোমল, সকলের আদরের ধন, নয়নের মণি, সদাই ক্রোড়ে ক্রোড়ে থাকে, একদণ্ড কেহ যাহাকে মাটীতে নামাইতে চায় না, দুইদিন পরে সেই শিশুই কত বড় হইয়া উঠিবে, কুমার, বালক, যুবা, ক্রমে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ, পরে জরা আসিয়া সেই কত আদরের দেহখানি জীর্ণ করিয়া ফেলিবে, তাহার অস্থি-চর্ম্ম-সার করিয়া দিবে; সে কান্তি নষ্ট হইবে, চক্ষু দৃষ্টিহীন হইবে, দন্ত শিথিল ও অঙ্গচ্যুত হইবে; কর্ণ বধির হইবে, সকল ইন্দ্রিয়ই কর্ম্মের বাহির হইয়া যাইবে; তাহার ভ্রমর-কৃষ্ণ-কেশকলাপ পাকিয়া উঠিয়া মাথায় টাক ফেলিয়া যাইবে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কিম্ভূত কিমাকার করিয়া দিবে। হায়! হায়! দুদিনের মধ্যে কতই না পরিবর্ত্তন! সেই নবনী-সম নয়নারাম দেহের এই পরিণাম! তাহাও শেষ দিনে শ্মশানে ভস্মের বা মৃত্তিকার স্তূপ কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া দিবে মাত্র! কতই না সুখের সেই দেহ আজ কি ভীষণ দুঃখের আকর হইল! তাই বলি মুমুক্ষু সাধক, ছলনাময়ী মায়া ও অবিদ্যা-রাজ্যের বিষয়সমূহে আর মুগ্ধ না হইয়া সকল আত্মার আত্মা, সকল কর্ম্মের কারণ, পরমাত্মা-রূপ নিত্য-বস্তুতে সেই অনিত্য বিষয়োত্থিত যে কোন ক্রিয়ার ধারা ধরিয়াই প্রথমে ইন্দ্রিয়, ক্রমে তন্মাত্রা ও অন্তঃকরণ দিয়া

অন্তর-আত্মার দিকে প্রবাহিত করিয়া দাও, তাহা হইলেই প্রকৃত আনন্দ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে, তাহা হইলেই তোমার পর-বৈরাগ্যের পথ সুগম হইয়া আসিবে।

বাস্তবিক অনিত্য বিষয় হইতে জীবের কখনই স্থির আনন্দ জন্মায় না, বিষয়-সংসর্গ সুখের নিদান নহে, কেবল অন্তঃকরণের পরিণামস্বরূপ দুঃখই জীবের ভ্রান্তি বশতঃ ও পূর্ব্ব-কল্পনা বা সংস্কারোদ্ভূত ভোগরূপ মিথ্যা বা অনিত্য সুখবোধ হয়। পুণ্য-কর্ম্ম-ফলে জীবের স্বর্গাদি-ভোগরূপ সুখও অনিত্য, তাহাও ভোগ-শেষ হইলে দুঃখদায়ী হইয়া থাকে। কারণ আবার তাহাকে স্বর্গচ্যুত হইতে হয়। এই সংসারে স্বামী, পুত্র, স্ত্রী, কন্যা, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি কেহই নিত্য বা অবিরত সুখদায়ী নহে, কারণ তাহাদের সহিত সর্ব্বদা সঙ্গদোষ হেতু তাহাদের স্থূলেই মমতা বৃদ্ধি হয়। সেই মমতাই পরিণামে বন্ধনের প্রধান কারণ হইয়া বিষ-মূর্চ্ছনার ন্যায় কেবল দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি প্রতি জন্মেই কর্ম্মবশে দৈবী-বিধানে অভিনব রূপে সংঘটিত হইতেছে। এই ভব-নদীর মধ্যে তরঙ্গমালার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর লোক-প্রবাহ অবিরত ভাবে আসিতেছে আর যাইতেছে। কেবল প্রাক্তন কর্ম্ম-স্রোতে প্রবাহিত ও কাল-প্রতি-হত হইয়া তাহারা যেন ফেণবৎ পুঞ্জীভূত হইতেছে, কখন পরস্পর সংবদ্ধ হইতেছে, আবার কখন বিশ্লিষ্ট ও বিচূর্ণ হইয়া যেন কোনও অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং সংসারে কে কাহার পিতা, কেইবা পুত্র, কে স্ত্রী কেই বা কাহার স্বামী? নাট্যশালার পট-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে একত্র কয়েক জনে কর্ম্মবশে সমা-বিষ্ট হইয়া দৈব ইঙ্গিতে কিয়ৎক্ষণ ক্রীড়া করিয়া সহসা সজ্জাগৃহে চলিয়া যাইতেছে। পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিলে তখন কেই বা রাজা, কেই বা রাণী, কেই বা কুমার, কেই বা কুমারী! কেহ গোঁফ কামাইয়া স্ত্রী সাজিয়াছিল, কেহ বা নকল পাকা গোঁফ ও দাড়ি

আঁটিয়া বৃদ্ধ পুরুষের অংশ অভিনয় করিতেছিল। অভিনয়-অন্তে সজ্জাগৃহে কেই বা বৃদ্ধমন্ত্রী কেই বা যশোদা মাতা? তথায় সকলেই যে সমান! বিশ্রামান্তে নায়কের ইঙ্গিতে পুনরায় নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নূতন ঢংয়ে নূতন নাটকের অভিনয়ের জন্য আবির্ভূত হইতেছে। জন্ম-জন্মান্তররূপ অবিরত ভাবে জীবের এই লীলাই চলিতেছে।

জীব সাজ বদলাইয়া মায়ার ছলনায় আপনাকেই আপনি যে ভুলিয়া যায়! অন্যকে সে চিনিয়া রাখিবে কি করিয়া? আপনাকে চিনিতে পারিলে অন্যকেও চেনা সহজ হইবে, অথবা অন্যকে চিনিতে চেষ্টা করিলে আপনাকেও চেনা সহজ হইত! অনেক সময় নাটকাভিনয় দেখিতে দেখিতে বুঝা যায় যে, এক ব্যক্তির গলাটী ভাল, বেশ অভিনয়-পটু, প্রয়োজন অনুসারে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া কখন রাধিকা, কখন রাখাল বালক, কখন সখী, আবার কখনও বা ভিন্ন নাটকে অন্য কোনও পাত্র বা পাত্রীর অংশ লইয়া অভিনয় করিয়া যাইতেছে। নানা ভাবে বাহ্য-পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেও তাহার সেই পরিচিত রূপ, কণ্ঠ ও প্রকৃতি দর্শকের চক্ষু-কর্ণের ভ্রান্তি উৎপাদন করিতে পারিতেছে না। সে ব্যক্তি নাট্যমঞ্চে প্রবেশ করিলেই দর্শক তাহাকে চিনিতে পারে, তাহার প্রকৃত নাম জানা থাকিলে, "ঐ অমুক আসিয়াছে" বলিয়া উঠে। এই ভাবে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা ও ভগিনী আদি আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যাহারা আসিতেছে, যাইতেছে, নানা ভাবে অভিনয় করিতেছে, যদি কেহ অভিনয়-রঙ্গে মুগ্ধ না হইয়া বা তাহার পরিহিত সাজ-সজ্জায় ভ্রান্ত না হইয়া সেই প্রকৃত লোকটিকে চিনিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে তাহার কল্পিত সুখ, দুঃখ বা মৃত্যুতে দর্শকের তদনুগত ভাব হইবে কেন? কোমল-হৃদয়া নারী-প্রকৃতির ন্যায় তাহার অধরোষ্ঠে হাসির ভাব অথবা নয়নে অশ্রুকণা সঞ্চিত

হইবে কেন? ইহা যে দর্শকের ভাব-মুগ্ধতা ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্যেরেই লক্ষণ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যিনি এই ভাবে অন্যকে চিনিতে চেষ্টা করেন, একদিন তিনি আপনাকেও আপনার সাজের মধ্য হইতেই চিনিয়া লইতে পারেন।

জীব পথিকের মত কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম লাভের জন্য যেন এক পান্থশালা বা বৃক্ষমূলে অবস্থান করিয়া পরক্ষণে আপন আপন রুচি বা কর্ম্মানুসারে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছে. নানাবিধ অলীক বিকল্প-কল্পনা করিয়া পুনঃ পুনঃ যে কি ভীষণ ভ্রমে নিপতিত হইতেছে, তাহা ভাবিবারও অবসর পায় না। এই সংসার এই পুত্র, কন্যা, এই ধন-রত্ন, এই বিষয়-সম্পত্তি, কত কষ্টে ভবিষ্যতের জন্য একত্রীকরণ, এই মান-সম্ভ্রম, এই জাতি-কুল-শীল, যাহার জন্য মাথা ঘুরিয়া যাইতেছে, দেহ প্রাণান্ত-প্রায় হইতেছে, কার্য্য কর্ম্ম বা হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইতেছে, চিরস্থায়ী ভাবিয়া সেই ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের জন্যই জন্ম জন্ম লালায়িত হইতেছে। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহা মনে হয় না। ঠিক এইরূপ ভাবে জন্মজন্মান্তরে কত বারই ধর্ম্মাধর্ম্ম লক্ষ্য না করিয়া বৃথা স্বার্থবশে কত সংস্থানাদি করিয়াছি আজ তাহার একটা স্বপ্নপর্য্যন্ত যে মনে আসে না! কি বিচিত্র মায়ার আচরণ! কি ভীষণ তমোঘোর! অহর্নিশ কেবল সেই ভ্রান্ত কল্পনা রাশির আলোচনায় অনিত্য সুখের আশায় দেহকে জরাজীর্ণ করিতেছে চিত্তকেও বিবেকহীন করিয়া তুলিতেছে। পরিণামময়ী প্রকৃতিরাজ্যে সমস্তই অহরহঃ পরিবর্ত্তন-শীল, সমস্তই অনিত্য।

"সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রিতাঃ
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তং হি জীবিতং॥

সঞ্চয়ের অন্তে ক্ষয় উচ্চতার অন্তে পতন সংযোগের অন্তে বিয়োগ এবং জীবনের অন্তে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব সমস্তই অনিত্য

এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কেহই অজর ও অমর নহে। সমস্তই জল-বুদ্ধুদের ন্যায় অলীক ও ক্ষণস্থায়ী জানিয়া, মুমুক্ষু-সাধক ধীরে ধীরে প্রোক্ত বৈরাগ্য-মার্গেই অগ্রসর হও ও একমাত্র বৈরাগ্যই অবলম্বন কর। পরবর্ত্তী অংশে "সন্যাসীর প্রতি উপদেশ-ক্রমে" উক্ত হইয়াছে যে, যেমন এই বিরাট জগৎ মিথ্যাস্বরূপ হইয়াও একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া সত্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, সেইরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়া এই মিথ্যাভূত ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ জীবদেহও আত্মবৎ প্রতীত হইতেছে। আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবরূপে একত্রীভূত সকলেই, এমন কি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ হইতে বৃক্ষ লতা সামান্য তৃণটী পর্য্যন্তও সেই একই নিয়মে পরিদৃষ্ট হইতেছে। সন্ন্যাসী ইহা জ্ঞাত হইয়াই সুখী হইয়া থাকেন। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে ইন্দ্রিয়গণ পৃথক পৃথক স্ব স্ব কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে, আত্মা তাহারই সাক্ষীস্বরূপ, সুতরাং নির্লিপ্ত; অর্থাৎ আত্মা বা আমি জীবরূপে দেহের সংসর্গে আসিয়াও ভ্রান্ত বা অন্ধ হইয়া সেই সেই কর্ম্মে আবদ্ধ হয়না, যিনি ইহা জানিতে পারেন, তিনিই পরবৈরাগ্যের অধিকারী হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসপদ পাইবার উপযোগী হন।

অত্যন্ত বৈরাগ্যরতঃ সমাধিসমাহিতস্যৈব দৃঢ় প্রবোধঃ।
প্রবুদ্ধতত্ত্বস্য হি বন্ধমুক্তির্মুক্তাত্মনো নিত্য সুখানুভূতিঃ॥"

অত্যন্ত বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তিরই সমাধি সিদ্ধি হইয়া থাকে, সেই সমাধি-সম্পন্ন পুরুষ তখন উৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, সেই উন্নত তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিরই তখন সংসারবন্ধন মুক্ত হয় এবং তাঁহারই নিত্য সুখানুভব হইতে থাকে। অতএব

"আত্মাবলোকনার্থন্তু তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজেৎ।
সর্ব্বং কিঞ্চিৎ পরিত্যজ্য যৎ শেষং তৎপরং পদং॥"

মুমুক্ষু সাধকের আত্মাবলোকনের জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করা

কর্ত্তব্য; সমুদায় অনিত্য বস্তু পরিত্যক্ত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই সেই নিত্যানন্দপ্রদ পরংপদ পরমাত্মা। ইতি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জীবাত্মা স্থূল দেহকেই আত্মবৎ মনে করিয়া যেন স্থূল হইয়া গিয়াছে, যথার্থ আত্ম-বস্তু যে কি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। সমুচ্চ হিমাচলের তুষারগর্ভসম্ভূত পবিত্র গঙ্গোত্তরীর ধারাই যে নানা পর্ব্বত, প্রস্রবণ, অরণ্য, প্রান্তর, জনপদ বিধৌত করিয়া নামিতে নামিতে ক্রমে গঙ্গাসাগরের সমীপে আসিয়া লবণাক্ত বালু-কর্দ্দমময় অঙ্গে পরিণত হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু কেহ একবার ভাবিয়া দেখেন কি যে, সেই মূল গঙ্গোত্তরীর ধারায় প্রবাহিত গঙ্গাজল, আর এই গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমের গঙ্গাজল, তাহার পবিত্রতা ও পতিতোদ্ধারিতাদি গুণ ব্যতীত তাহার স্থূল রূপ, গন্ধ ও আস্বাদাদি বিষয় একই প্রকার কিনা? যদি কখনও সম্ভব হয় যে, দুইটী স্বচ্ছ কাচাধারে একই সময়ে ঐ দুই স্থানেরই জল পূর্ণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, একটী কত নির্ম্মল, স্বচ্ছ, কীটাদি আবর্জ্জনাপরি-শূন্য, কত শীতস্পর্শ শান্তিপ্রদ ও উপাদেয় এবং অন্যটী বালুকা-কর্দ্দমযুক্ত মলিনাঙ্গ লবণাক্ত উষ্ণস্পর্শ ও অসংখ্য সামুদ্রকীটাদিতে পরিপূর্ণ। যাহারা গঙ্গোত্তরী যাইয়া পতিতপাবনী গঙ্গার সেই পবিত্র মূলধারা দেখিবার অবসর পায় নাই, তাহারা গঙ্গাসাগরের জল দেখিয়া ভাবিতেও পারিবে না যে, ইহা মূলে কি ছিল, আর এখানেই বা তাহার কিরূপ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আত্মাও গঙ্গোত্তরীর মূল-ধারায় প্রবাহিত গঙ্গাজলের ন্যায় স্বচ্ছ পবিত্র নির্ম্মল ও সর্ব্বদোষ বিমুক্ত, কিন্তু মিথ্যাভূত স্থূল বিষয় সংসর্গে স্বাধীনভাবে জীবাত্মারূপে গঙ্গাসাগরের জলের ন্যায়ই কেবল মলিন চৈতন্য-সত্তায় স্থূলে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তখন কিছুতেই সে বুঝিতে পারে না যে, আমি শুদ্ধ আত্মারই অংশ, কেবল অবিদ্যাভূত বিষয়-মালিন্যে স্থূল হইয়া আছি। গঙ্গাসাগরের-

জলকে পুনরায় সেই গঙ্গোত্তরীর ধারার ন্যায় ও সুনির্ম্মলাদি গুণ-সম্পন্ন করিতে হইলে যেমন তাহাকে বিপরীত গতিতে ক্রমোন্নত পথে তুলিয়া লইয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার মলিনাংশ ছাঁকিয়া পরিষ্কৃত বা পরিস্রুত করিতে হয়, তবেই কতকটা তাহা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু দৈবী-সহায়তায় তাহা যেমন অতি সহজে বা স্বাভাবিক-ভাবে সুসম্পন্ন হইতে দেখা যায়, তেমন আর কিছুতেই হইবার নহে ; অর্থাৎ শ্রীভগবান সূর্য্যদেবের কৃপায় গঙ্গাসাগরের সেই সমল জল সূর্য্যতাপে তাপিত হইয়া বাষ্পাকারে যখন আকাশে উঠিতে থাকে, তখন সেই জলের মৃৎকর্দ্দম তীব্রলবণ ও কীটাদি সমস্তই নীচে পড়িয়া থাকে, কেবল নির্ম্মলজল বাষ্পাকারে আকাশে উঠিয়া মেঘরূপে সঞ্চিত হয় ; পরে দক্ষিণ বা অনুকূল বায়ু-সহযোগে পুনরায় হিমগিরিশৃঙ্গে নীত হইলে যথাসময়ে সেই গঙ্গাসাগরের মলিন জলই শুদ্ধ স্বচ্ছ পবিত্র মূল ধারায় পরিণত হয়। এইরূপ জীবাত্মারূপে স্থূল বিষয়-সংসর্গে স্থূলে পরিণত বা আপনাকে স্থূল মনে করিলেও ভক্তি বা উপাসনা ও যোগাদি সাধনারূপ দৈবী অনুষ্ঠান ক্রিয়ার ফলে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সিদ্ধ হইলে, স্থূল বিষয় বিমুক্ত হইয়া জীব সূক্ষ্মভাবে আত্মদর্শন করিতে করিতে বিপরীত গতিতেই মূল পরমাত্মায় যাইয়া স্বরূপে পরিণত হইতে পারে। তখনই আমি কে বা কোন বস্তু, সাধকের সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়, আপনাকে তখন আপনি জানিতে পারে। এই কারণেই ভোগী ও ত্যাগীর মধ্যে সততই বিসদৃশ্য ভীষণ পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। বাস্তবিকই ভোগানুরত সংসারী সাধারণ মনুষ্য প্রকৃত ত্যাগীর ভাব কিছুতেই অনুভব করিতে পারে না। ভোগী, প্রবাহপতিত তৃণ কাষ্ঠের ন্যায় ক্রমাগতই নিচের দিকে ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার বিপরীত দিকে যাইবার তাহার যেন তিলমাত্রও শক্তি নাই। সে অতি প্রকাণ্ডকায় হইলেও যেন জড়ভাবাপন্ন চৈতন্য-বিহীন বস্তু, কিন্তু একটী ক্ষুদ্র মৎস্য চৈতন্যযুক্ত হইবার কারণ অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষের

ন্যায় প্রবাহপতিতভাবে স্রোতে ভাসিয়া যাইতে চাহেনা, সে স্বতঃ পরতঃ তাহার বিপরীত দিকে উন্নত-পথে উঠিতে যত্ন করে, অর্থাৎ যে পথ দিয়া জল নামিতেছে সেই পথেই সে উপরে উঠিতে চায়। ইহাই তাহার ধর্ম্ম বা ইহাই তাহার ক্রিয়া। ত্যাগী ব্যক্তি ঠিক সেই ক্ষুদ্র মৎস্যের ন্যায়ই প্রবৃত্তির প্রবাহবিরোধী নিবৃত্তির পথেই অগ্রসর হইয়া থাকেন। ইহাই তাঁহার চৈতন্য-লীলা ইহাই তাঁহার আত্মজ্ঞান-শক্তি। মুক্তিকামী ভোগী ব্যক্তি ত্যাগীর ন্যায় প্রবৃত্তি-প্রবাহের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমার্গী না হইতে পারিলেও প্রবাহে পতিত হইয়াই আশ্রয়স্থলরূপ তীরভূমির দিকে অগ্রসর হয় অথবা ত্যাগের আদর্শস্বরূপ শ্রীগুরুর ইঙ্গিতে সেই প্রবাহমধ্য হইতে আত্মরক্ষা করিতে যুক্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করে, ইহাও যে চৈতন্যের লক্ষণ তাহা বলাই বাহুল্য। শাস্ত্র বলিয়াছেনঃ—

"ন চাবিরক্তৈর্ব্বিজ্ঞাতুং সুশক্যোঽসৌ মহেশ্বরঃ।
তস্মাদ্বিরক্তিং ভো ধীরাঃ সম্পাদয়তমচিরম্॥'

বিষয়সমূহে বিরক্তি না জন্মিলে সেই মহেশ্বর পরমাত্মাকে বিশেষরূপে জানিতে পারা যায় না, অতএব মুক্তিকামী সাধকগণ তোমরা বৈরাগ্য-সম্পাদনে সত্বর যত্নবান হও, ইহাতে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে।

'বিরক্তেরপি চোপায় উক্তো দোষাবলোকনম্।
সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্য নিতরাং প্রীতিকারিণঃ॥"

সুখসাধনতারূপে সম্মত সংসারে সকল বস্তুতেই যে দোষাবলোকন, তাহাই বিরক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ নিরাশীর্ব্বন্ধনা সদা।
ত্যাগো যস্য হুতং সর্ব্বং স ত্যাগী স চ বুদ্ধিমান্॥'

যাঁহার সর্ব্বদা সকল কর্ম্মানুষ্ঠানই কামনাশূন্য ও যিনি

বিষয়বাসনা সকল একেবারে বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ উদাসীন ও বুদ্ধিমান্।

যে ব্যক্তি সুখ দুঃখ এতদুভয়ই পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে একান্ত নিস্পৃহ, তিনিই গুণাগুণ-সম্পন্ন ললনাদি সকল বিষয়ে সঙ্গহীন জীবত্ব-নিষ্পাদ্য, জ্ঞানাধিগম্য, স্বর্গাদি সুখবিশিষ্ট এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-স্বরূপ ব্রহ্মলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। নতুবা সাধকের অন্তঃকরণে যৎকিঞ্চিৎ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইলেও, কখন কখন তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হইবার কারণ, পরে তাহা বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। অতএব বুদ্ধিমান সাধকের প্রযত্ন-সহকারে বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

মুক্তিকামী সাধক, পাশবদ্ধ জীবত্ব ও পাশমুক্ত শিবত্ব-বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা কর। পরবর্ত্তী অংশে সপ্তমোল্লাসে যুক্তিতত্ত্বমধ্যে পাশ অর্থাৎ "অষ্টপাশ-বন্ধন" বিষয় পাঠ ও তাহার মর্ম্ম সম্যক্ অবগত হইয়া সর্ব্বদা সেই পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রযত্ন কর, ধন্য হইবে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সদা সাধুসঙ্গ কর, শাস্ত্রালোচনা কর, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদিসহ যোগ ও তপস্যাদ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য যত্ন কর, তাহা হইলেই বুদ্ধি নির্ম্মল হইবে, বৈরাগ্যমার্গ সরল হইবে। ত্যাগী সাধু ব্যক্তির উপদেশ ও আদর্শই এক্ষণে সম্পূর্ণ অবলম্বনীয়, নতুবা কেবল পণ্ডিত বা শাস্ত্রভারবাহী বক্তা বা তথাকথিত উপদেশে কোন ফলই ফলিবে না। ইহার একটী সুন্দর উদাহরণ মনে আসিয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে পাঠককে শুনাইয়া রাখিঃ—

কোন সময় এক অতি ধর্ম্মপরায়ণ বৈরাগ্যোন্মুখ নরপতি বৈরাগ্যলাভের আশায় প্রচার করিলেন যে, 'যিনি আমাকে সম্পূর্ণভাবে সংসারবৈরাগ্য শিখাইয়া দিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকে আমার অর্দ্ধ-রাজ্যাংশ ও আমার বিবাহযোগ্যা যে

কন্যা আছে, তাহাকে সম্প্রদান করিব।' এই প্রচারবাণী অবগত হইয়া নানা দেশ বিদেশ হইতে বহু শাস্ত্রদর্শী প্রধান প্রধান পণ্ডিতবৃন্দ সেই রাজসভায় সমাগত হইতে লাগিলেন। এক এক দিন এক এক পণ্ডিতবর রাজাকে নানা শাস্ত্র হইতে সার-সংগ্রহ করিয়া সংসার-বৈরাগ্য-বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও যুক্তি-পূর্ণ শাস্ত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। সভায় তাঁহাদের সম্মুখে সংসার-বৈরাগ্য-বিষয়ে জ্ঞান বেশ অনুভব করিয়া নিজ অনুকুল অভিমতও প্রকাশ করিলেন, কিন্তু পরক্ষণে অন্তঃপুরে আহার-বিহার-সাধনে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সেই বৈরাগ্যভাব আর সেরূপ থাকে না। প্রিয়তমা রাণী, স্নেহের আধার কুমার কুমারী, সেবাপরায়ণ দাসদাসীদিগের অকৃত্রিম আদর-যত্নে সংসার-বৈরাগ্য পুনরায় শিথিল হইয়া যায়। সুতরাং পরদিন তিনি যেন আবার নূতন হইয়া আইসেন, তাঁহার এই ভাব দেখিয়া পণ্ডিতগণ পুনরায় উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। এই ভাবে নিত্য উপদেশ দিতে দিতে সকল পণ্ডিতই ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তাঁহারা বিরক্ত হইয়া একে একে সাধারণভাবে বিদায় লইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং যাইবার সময় পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—'ইহা রাজার কেবল দুষ্টামি মাত্র! আমরা যে যে অভ্রান্ত শাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয়ই বৈরাগ্যজ্ঞান লাভ হইবার কথা, কিন্তু যে ব্যক্তি জাগিয়া নিদ্রার ভান করিয়া থাকে, তাহাকে কে জাগাইতে পারিবে? নিদ্রিত ব্যক্তিকে অবশ্যই জাগরিত করা কঠিন নহে; ইত্যাদি।" অনন্তর গৃহ-প্রত্যাগত পণ্ডিতদিগের মুখে রাজার সেই প্রচার-বাণী যে, দুরভিসন্ধিমূলক, এইরূপ অবগত হইয়া আর কোন পণ্ডিতই তাঁহার নিকট আসিলেন না।

এক দিবস রাজা শুনিলেন, তাহার প্রাসাদের সম্মুখে অত্যন্ত কোলাহল হইতেছে। দেখিলেন জনতায় চারিদিক পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে—কারণ জিজ্ঞাসায় অবগত হইলেন যে, এক ঘোর উন্মাদ রোগী আসিয়া সম্মুখস্থ বটবৃক্ষের মূল দুই হস্ত দ্বারা বেষ্টন করিয়া নানা অকথা কুকথা বলিয়া গালি দিতেছে। রাজা কৌতূহলপরবশ হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, লোক জন সব দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। পাগলও শুনিতে পাইল, রাজা আসিতেছেন ; তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়াই সে বলিল "আপনিই কি মহারাজা ? বেশ হইয়াছে। আপনি বিচারক, বিচার করুণ ত মহারাজ ! এই দুষ্ট বটগাছটা, আজ প্রাতঃকাল হইতে আমায় কষ্ট দিতেছে, আমার স্নান আহার পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছে, আমায় ধরিয়া আজ নাস্তানাবুং করিতেছে, আমি এত গালি দিতেছি, এত লাথি মারিতেছি, এই দেখুন আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, কিছুতেই আমায় ছাড়িতেছে না ; আপনি বিচার করুন, আমায় ছাড়াইয়া দিন, রক্ষা করুন। রাজা বলিলেন "বাপু, তুমি নিতান্ত পাগল দেখিতেছি, বৃক্ষ কি কখন মানুষকে ধরিয়া রাখিতে পারে ? তুমিই ত বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছ !" পাগল শুনিয়া হাসিয়া বলিল "বাহবা মহারাজ, বাহবা ! খুব বিচার কর্ত্তা ! আমার প্রাণান্ত হইতেছে, আর আপনি কি না বলিলেন—বৃক্ষের ধরিয়া রাখিবার শক্তি নাই, তা'র পরিবর্ত্তে আমিই বৃক্ষকে ধরিয়া রাখিয়া বৃথা কষ্ট পাইতেছি।' রাজা পুনরায় বলিলেন—"হ্যাঁ বাপু, তুমিই বৃক্ষকে জড়াইয়া রহিয়াছ, হাত দুটি ছাড়িয়া দাও দেখি, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে।' পাগল বলিল—'আমার হাত ছাড়াইবার শক্তি থাকিলে কথনও কি ইচ্ছা করিয়া কষ্ট পাই ? আপনি বিচারক হইয়া ত বেশ বলিতেছেন, আমি যে প্রাণপণে হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিতেছি ও ছাড়ে

কৈ ?' তখন রাজা বলিলেন—"আচ্ছা আমি তোমায় ছাড়াইয়া দিতেছি", এই বলিয়া রাজা তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া নিজের দুইহাতে তাহার দুইটী হাত ধরিয়া বৃক্ষ হইতে তাহাকে ছাড়াইয়া দিলেন। পাগলের বড় আনন্দ, তখন সে বলিল 'ঠিক ত মহারাজ! আমারই ভুল বটে, আমিই এতক্ষণ বৃক্ষকে জড়াইয়া মিছামিছি কষ্ট পাইতেছিলাম। মহারাজ! এই সংসার ঠিক এমনই বিরাট বৃক্ষস্বরূপ, মানুষ ভ্রমবশে আপনি সংসার-বৃক্ষকে জড়াইয়া বৃথা ভীষণ কষ্ট পাইতেছে। সংসারের ত কোনও অপরাধ নাই, মানুষ ইচ্ছা করিলেই সংসার-বন্ধন ছাড়াইয়া বৈরাগ্যরূপ মুক্তির পথ অবলম্বন করিতে পারে।" রাজা এই কথা শুনিয়াই অবাক্! পাগল যে, যেমন তেমন ব্যক্তি নহেন, তাহা জানিতে পারিয়া তখনই করযোড়ে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার পদযুগলে পতিত হইয়া বলিলেন—"প্রভো মহাত্মন্! আমায় রক্ষা করুন্। বুঝিয়াছি, আমার প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়াই আপনার এই অদ্ভুত লীলা বিকাশ। তখন সেই পাগলরূপী মহাপুরুষ বলিলেন—যাহার নিজেরই হাত বাঁধা, সে পরের হাত খুলিয়া দিবে কেমন করিয়া বাবা। তুমি যাহা-দের নিকট বৈরাগ্য-বিষয়ে উপদেশ লইতেছিলে, তাহারা নিজেই যে লোভ-পরবশ হইয়া সংসার-বন্ধনে দৃঢ় আবদ্ধ, তাহারা কি তোমার বন্ধনমুক্তির উপায় প্রকৃত বৈরাগ্য উপদেশ দিতে পারে? তাহাদের বিষয়-বৈরাগ্যের উপদেশ-প্রদান যে বিষয়ের লোভ সংযুক্ত!' রাজা কাতরভাবে নিবেদন করিলেন—"প্রভো! আমায় মুক্ত করুন, আমার বন্ধন ছাড়াইয়া দিন।" মহাপুরুষ, হাত দুটী ধরিয়া বলিলেন—"তবে উঠ, আমার সহিত চল, তোমার সংসার-বন্ধন খুলিয়া গিয়াছে।" রাজা আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া ধৃতহস্ত হইয়া মহাপুরুষের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। সমাগত সকলেই তখন পিছু পিছু যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় চলিতে

লাগিল। মহাপুরুষ বলিলেন—"বাবা সাজিয়া গুছাইয়া হিসাব নিকাশ করিয়া বৈরাগ্য হয় না। তীব্র-বৈরাগ্য হইলে কাহার সাধ্য তাহারে রাখে। তবে মৃদু বা মধ্য-বৈরাগ্যের সময় যথার্থ সংসারত্যাগী প্রকৃত বৈরাগ্যপরায়ণের আদর্শ, উপদেশ ও সম্পূর্ণ সহায়তা প্রয়োজন। বুঝিতে পারিলে ত বাপু! তোমার ঐ তুচ্ছ অৰ্দ্ধাংশ রাজত্ব কি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড লাভেরও আমার প্রয়োজন নাই, আর রাজ কন্যা, গন্ধর্ব্ব কন্যা বা দেব কন্যা সকলই যে মহামায়া জগজ্জননীর বিভূতিরূপা, তাহাতে আর আমার ভ্রান্ত আকাঙ্ক্ষা ত নাই। আমি মুক্তপুরুষ, তুমি ইচ্ছা করিলে এখনই আমার সাহায্যে মুক্তিমূলক বৈরাগ্যমার্গ আশ্রয় করিতে পার।" রাজার সময় হইয়াছিল, তিনি এই অপূর্ব্ব সুযোগ আর পরিত্যাগ করিলেন না, তিনি মহাপুরুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আর গৃহে ফিরিলেন না; তাঁহার গার্হস্থ্য কর্ম্ম-সাধনা পূর্ণ হইয়া গেল। সুতরাং সকলকে বুঝাইয়া তিনি তখনই সেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের পদানুসরণ করিলেন।

শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :—

চতুর্থাশ্রম — "তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে বৈরাগ্যং জায়তে যদা।
তদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রম মাশ্রয়েৎ॥"

তত্ত্বজ্ঞানের উদয়দ্বারা যখন দৃঢ় বৈরাগ্য-ভাবের উদয় হইবে, তখন সাধক সংসারাদি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবে। তাহার পূর্ব্বে গার্হস্থাশ্রম পরিত্যাগের বিধি শাস্ত্রে নাই। এই কারণ শ্রীভগবানের আদেশ এই যে :—

"বিদ্যামুপার্জ্জয়েৎ বাল্যে ধনং দারাশ্চ যৌবনে।
প্রৌঢ়ে ধর্ম্মানি কর্ম্মাণি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধীঃ॥"

অর্থাৎ প্রথম বাল্যকালে যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমসহ বিদ্যার্জ্জন করিবে; দ্বিতায় যৌবনাবস্থায় ধনোপার্জ্জন ও দারাদি গ্রহণদ্বারা গার্হস্থ্য

আশ্রমের সেবা করিবে, তৃতীয় প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে রত থাকিয়া বানপ্রস্থভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে যত্নবান হইবেন এবং চতুর্থে প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। মহর্ষি হারিত, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর আদি মহাত্মগণ তত্তৎকৃত সংহিতায় প্রায় এক বাক্যেই উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঃ—

"গৃহস্থঃ পুত্রপৌত্রাদীন্ দৃষ্ট্বা পলিতমাত্মনঃ।
ভার্য্যাং পুত্রেষু নিক্ষিপ্য সহ বা প্রবিশেদ্বনম্॥"

গৃহস্থ সাধক পুত্র পৌত্রাদি ও আপনার পলিত মুণ্ড দেখিয়া পুত্রদিগের উপর ভার্য্যার ভার দিয়া কিম্বা ভার্য্যার ইচ্ছা হইলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বনে প্রবেশ করিবেন। তথায় অর্থাৎ বনাশ্রমে থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ ধ্বংস করিয়া ব্রাহ্মণ সাধক অন্তে সন্ন্যাসবিধিক্রমে চতুর্থ বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। শাস্ত্রে তাহাই উক্ত আছে ঃ—

"এবং বনাশ্রমে তিষ্ঠন্ পাতয়ংশ্চৈব কিল্মিষম্।
চতুর্থমাশ্রমংগচ্ছেৎ সন্ন্যাসবিধিনা দ্বিজঃ॥"

শ্রীসদাশিব পূর্ব্ব হইতেই কলির জীবের আশ্রম সাধনের জন্ত অতিস্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, "কলিসম্ভূত মানবগণ তপো-বর্জ্জিত, বেদপাঠবিরক্ত ও স্বল্পায়ুঃ হইবে, সুতরাং তাহারা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বশতঃ ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থাশ্রমের তাদৃশ ক্লেশ ও পরিশ্রম সহ্য করিতে আদৌ সমর্থ হইবে না, অতএব দৈহিক পরিশ্রম প্রধান আশ্রমানুষ্ঠান তাহাদের পক্ষে কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?" এই কারণ কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রায়ই থাকিবে না, বানপ্রস্থ আশ্রমও সেইরূপ!

"গার্হস্থ্যেনভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌযুগে॥"

কলিযুগে গার্হস্থ্য ও ভিক্ষুক নামক এই দুইটীমাত্র আশ্রমই স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইবে। সুতরাং গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিয়াই প্রথমে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। পরে সংসার-ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইলে

পূর্ব্বকথিতরূপে অনিত্য বিষয়সমূহে যখন ক্রমে দোষ দৃষ্ট হইতে থাকিবে, তখনই সাধকের হৃদয়ে ধীরে ধীরে বৈরাগ্যের উদয়সহ নিত্যবস্তু বা ব্রহ্ম-বিষয়ের জ্ঞান বদ্ধমূল হইতে থাকিবে। তখনই তাঁহার মহাপূর্ণ দীক্ষার শেষ অঙ্গ বিরজারূপ সন্ন্যাসানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। এই অবস্থাতেও কোন কোন সাধক শ্রীগুরুর আজ্ঞায় বানপ্রস্থাবলম্বী হইয়া থাকেন। কুটিচকাদি সন্ন্যাসাশ্রম বান-প্রস্থেরই অনুরূপ তাহা পরে উক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সন্ন্যাসের প্রকৃত অর্থ সম্যক্ প্রকারে ত্যাগ কিন্তু আত্মজ্ঞান পুষ্ট না হইয়া কর্ম্ম-ত্যাগ করিলে, পতিত হইতে হয়। বিবেকবশতঃ বিহিত-কর্ম্মের বিধিপূর্ব্বক ত্যাগ ব্যতীত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিধিবিবর্জ্জিত কর্ম্মত্যাগ করিলে পাপে লিপ্ত হইতে হয়। এই কথাই শান্তি গীতায় শ্রীভগবান সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন :—

"বিধিনা কর্ম্মসন্ত্যাগঃ সন্ন্যাসেন বিবেকতঃ।
অবৈধং স্বেচ্ছয়া কর্ম্মং ত্যক্ত্বা পাপেন লিপ্যতে।
আত্মজ্ঞানং বিনা ন্যাসং পাতিত্যায়ৈব কল্প্যতে॥"

নদীর মধ্যে পতিত হইয়া উহার উভয় তীরের একদিক আশ্রয় করিতে না পরিলে যেমন কুম্ভীরাদি কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইবার সর্ব্বদা আশঙ্কা থাকে বা প্রবাহপতিতভাবে ক্রমে বিধ্বস্ত হইতে হয়, সেইরূপ আত্মজ্ঞান ভিন্ন কর্ম্মত্যাগ করিলে কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অহঙ্কাররূপ ভীষণ কুম্ভীর কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়া সাধক বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কেবল পেটের দায়ে বা উদরপূরণের নিমিত্ত যে ব্যক্তি সন্ন্যাসী, যিনি লৌকিক অর্থ সঞ্চয়েই সদা আসক্ত, যাহার আত্মতত্ত্ব আলো-চনায় আদৌ প্রবৃত্তি নাই, তাহার সকল কর্ম্মই বিড়ম্বনা মাত্র। যথার্থ সন্ন্যাসী হইতে হইলে, বিধিপূর্ব্বক সকল কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। শ্রীভগবান গীতোপনিষদে বলিয়াছেন :—সাত্ত্বিক, রাজসিক,

ও তামসিক ভেদে কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাস ত্রিবিধ। সকল কর্ম্মই আসক্তি-শূন্য হইয়া বা তাহার ফলাশা বর্জ্জিত হইয়া ত্যাগ করা বিধেয়। কিন্তু নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ সন্ন্যাসির কর্ত্তব্য নহে। মোহবশতঃ বা ধোঁকায় পড়িয়া কিম্বা কাহারও আজ্ঞায় ভীত হইয়া নিত্য কর্ম্মের ত্যাগকে তামসিক সন্ন্যাস বলে। যথা :—

"নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ অস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

এই ভাবে যে ব্যক্তি দুঃখবুদ্ধিতে বা দেহাদির ক্লেশের ভয়ে কর্ম্মত্যাগ করে; তাহা রাজসিক সন্ন্যাস, তাহাতেও ত্যাগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ তাহাতেও শান্তি পাওয়া যায় না। যথা :—

"দুঃখ মিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥"

সাত্ত্বিক সন্ন্যাস সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন :—

"কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়েতেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলংচৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥"

হে অর্জ্জুন সঙ্গ বা ইন্দ্রিয়াদির উপভোগ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এবং তাহার ফলাশাও ত্যাগ করিয়া কেবল কর্ত্তব্য মনে করিয়া যে নিত্য কর্ম্ম করা যায় সেই ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ, তাহাকেই সাত্ত্বিক ত্যাগ বা যথার্থ সন্ন্যাস বলে। এই কারণেই সাধকের রজোগুণের নিবৃত্তি হইতে আরম্ভ হইলে, বিরজানুষ্ঠানের পর সন্ন্যাস গ্রহণের বিধি শিবোক্ত। বাস্তবিক প্রমাদ ও আলস্য বশতঃ বা কেবল খেয়ালের বশে অথবা সংসারের দুঃখ কষ্টের আশঙ্কায় কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করা কখনই উচিৎ নহে। দেহী হইয়া সম্পূর্ণ কর্ম্ম ত্যাগ করাও সহসা সম্ভবপর নহে, সেই কারণ শ্রীভগবান খুলিয়া বলিয়াছেন :—

"যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥"

যিনি কর্ম্মফলের ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী

বলিয়া অভিহিত হন। অর্থাৎ যিনি বর্ত্তমানের বা ইহ পরকালের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং ভবিষ্যতের বা মোক্ষের ইচ্ছা রাখেন, তিনিই সন্ন্যাসী। শ্রীমৎঠাকুর বলেন:—মুক্তির কামনা, কামনা মধ্যে গণ্য নহে, অর্থাৎ যাহাতে সংসারভোগকামনা বিনাশ করে তাহাকে কামনা বলা যায় না, সুতরাং তাহাকেও নিষ্কাম বলিতে হবে। তথাপি পূজ্যপাদ আচার্য্যগণ সন্ন্যাসী ও পরমার্থ সন্ন্যাসীর ভেদ নির্ণয় করিয়াছেন। অর্থাৎ অনিষ্ট ইষ্ট ও মিশ্রিত এই তিন প্রকার ফলকামীদের পরকাল হইয়া থাকে। ত্যাগীদিগের তাহা হয় না কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের কচিৎ হয়। অতএব সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে মোক্ষার্থী সাধক কর্ম্মফল ত্যাগের অভ্যাসযোগ আরম্ভ করিবেন ও শ্রীগুরুমুখাগত সাধনা-দ্বারা আত্মজ্ঞানপরিপুষ্ট হইবেন। এইহেতু শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন:—

"ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্ব্বকর্ম্মণি।
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সন্ন্যাসাশ্রম মাশ্রয়েৎ॥

যখন ব্রহ্মজ্ঞান বদ্ধমূল হইবে, যখন সমুদায় কাম্যকর্ম্ম রহিত হইয়া আসিবে সেই সময় অধ্যাত্ম-বিদ্যা-বিশারদ ব্যক্তি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। সংসা শোক দুঃখ বা কোন সংসারিক দুর্ঘটনায় পড়িয়া আজকাল অনেকেই সন্ন্যাসী হইয়া পড়েন, শ্মশান বৈরাগ্যবং সাময়িক বৈরাগ্যবশে যে সন্ন্যাসভাব তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। চিত্তের সে ভাব কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত হইলেই পুনরায় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় বা সংসারের ও দেহের ভাবনারাশি নূতনভাবে আসিয়া আক্রমণ করে, তখন তাহার "ইতঃভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট" ন্যায় অবস্থা উপস্থিত হয়। সুতরাং সে সময় আশ্রমোচিত প্রকৃত আচরণ রক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে ভীষণ কষ্টকর হইয়া পড়ে। ফলে অনতিকাল মধ্যে পুনরায় সাধারণ লৌকিক বিষয়ে তাঁহাদের পূর্ণভাবে আসক্তি আসিয়া যায়। অতএব জন্ম জন্মান্তরের পুণ্যফলে

সংসার বিটপীর বিচিত্রফল মানবজীবন লাভানন্তর ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম সেবাদ্বারা সংসার রসেই পরিপুষ্ট হইলে, সাধক এই অন্তিম আশ্রম গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলে আর পতনের আশঙ্কা থাকিবে না। বৃদ্ধ পিতা মাতা, পতিব্রতা ভার্য্যা, শিশু পুত্র প্রভৃতি আত্মীয় বন্ধুবর্গকে না বলিয়া বা তাহাদের অভিমত না লইয়া সহসা পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা করিলে নরকগামী হইতে হয়, শাস্ত্রে এই-রূপই আদেশ আছে। এই কারণ সাধক গৃহস্থ আশ্রমের সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া আত্মীয়দিগের পরিতোযসম্পাদনপূর্ব্বক মন্ত্রযোগাদি সাধনার রীতিমত অভ্যাসসহযোগে মমতারহিত কামনাশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হইলে, আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবকে আহ্বান করিবেন এবং প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে সকলের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিবেন। অনন্তর অভীষ্ট দেবতাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সংসারপাশরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দে পূর্ণনিবৃত্ত অন্তঃকরণে পরমহংস বা বিরজাধিকারী শ্রীগুরুসন্নিধানে যাইয়া যথাবিধি আশ্রমান্তর গ্রহণ করিবেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অনেক সময় সামান্য কারণে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহাকে শাস্ত্রে সামান্য বা মৃদু বৈরাগ্য বলে। অধিকাংশস্থলে উক্ত শ্মশান বৈরাগ্যের ভাব উদয় হইলেই সহসা সংসার ত্যাগের ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাহা ত সত্বগুণের লক্ষণ নহে, তাহা সাধকের তমোপ্রভাবের কারণ বলিতে হইবে। যেহেতু তাহাতে সংসার পীড়ার কাতরতার ভাবই তখন বিদ্যমান থাকে। অতএব সে ভাব যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। করিলেও তাহা কেবল সন্ন্যাসী সাজা হইবে মাত্র, তাহাতে সন্ন্যাসীর অভিনয় করা বেশ চলিবে, প্রকৃত সন্ন্যাসের আনন্দবোধ হইবে না, বরং সময় সময় গ্রাসাচ্ছাদনের ও প্রবৃত্তি চরিতার্থের অভাবে অশান্তিরই অনুভব হইবে। এই হেতু সংসারের ভোগপ্রবৃত্তি পরিতৃপ্তি হইলে স্থায়ীভাবে চিত্তে নিবৃত্তি-

ভাব উদয়ের মুখে পিতা মাতা আদি আত্মীয়গণের অনুমতি গ্রহণের আজ্ঞা শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীভগবানের পূর্ণ আদেশ আছে যে, তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইলে মাতা, পিতা, যুবতী পত্নী, শিশু পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলকেই পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করা যাইতে পারে। তাহাতে কিছুমাত্র দোষ স্পর্শ করিবে না। সে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইলে কোন বিধিই তখন বাধা দিতে পারে না, অথবা চারিদিকেই তখন যেন কি এক অপূর্ব্ব ও অচিন্ত্যনীয় অনুকূল প্রবাহ বহিতে থাকে।

সংসারে প্রত্যেকেই সর্ব্বদা দেখিতেছেন যে, সকল ফলই স্ব স্ব জাতীয় বৃক্ষে জন্মে ও তাহাতে আবদ্ধ থাকিয়া কালে পরিপুষ্ট ও সুমধুর রসপূর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু কোন কারণে অসময়ে পতিত অপরিপক্ক অবস্থায় কোনও ফল পাড়িয়া মধু অথবা শর্করাদির ভাণ্ডে নিমজ্জিত রাখিলে ও তাহার প্রতি অত্যধিক আদর যত্ন করিলে সে ফল আদৌ সুমধুর বা সুপষ্ট হয় না বরং তাহা ক্রমে বিকৃত ও শুষ্ক হইয়া পচিয়া যায়। সুতরাং তাহাকে সুপরিপক্ক করিবার জন্য যে বৃক্ষে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতেই রাখিয়া দিতে হইবে। সেই বৃক্ষের মূলে তিক্ত, কটু, কষায় বা লবণ রসযুক্ত, যে কোন গন্ধবিশিষ্ট, ধূলি, কঙ্কর, কর্দ্দম, পঙ্ক অথবা গোময়াদি যে কোন বস্তুই থাকুক না কেন, ফল আত্মধর্ম্মানুসারে তাহার জন্মপ্রদ বৃক্ষমূল হইতে উত্থিত রসেই আত্মপরিপুষ্টতা ও পরিপক্কতা লাভ করিবে, তাহাতে তাহার আত্মধর্ম্মানুসারে রস গ্রহণের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না। একটী নারিকেল বৃক্ষ আর একটী তিন্তিড়ী বৃক্ষ বা তেঁতুল গাছ পাশাপাশি থাকিলেও উভয়ের ফলের মধ্যে অতি সামান্য-মাত্রও রস সামঞ্জস্য হইবে না অর্থাৎ নারিকেল আদৌ অম্ল হইবে না তেঁতুলও মিষ্ট হইবে না। এই ভাবে সকল বৃক্ষেরই ফল

সুপরিপুষ্ট হইলে, একদিন সহসা বৃন্তচ্যুত হইয়া খসিয়া পড়িবে। তখন ফল তাহার বৃক্ষের মোহে আর আবদ্ধ থাকিবে না, বৃক্ষও সে ফলকে আত্ম অঙ্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। ফল অথবা বৃক্ষ জানিতেও পারিবে না যে, কখন, কিভাবে, কি উপলক্ষে, পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে! এইরূপ সংসার বস্তুতই একটী বিরাট বিটপী সদৃশ, অসংখ্য জীব মানব তাহারই ফলস্বরূপ। সংসার বৃক্ষের মূলে নিত্য প্রবাহিত নানা রস অথবা অবস্থার মধ্য দিয়াই জীবমাত্রই ক্রমে সাধকরূপে প্রারব্ধ ভোগ করিতে করিতে যখন আত্মরসে পরিপুষ্ট হইয়া থাকেন তখনই তাঁহার প্রকৃত বৈরাগ্যের ভাব উদয় হয়, তখনই তিনি কি এক অভিনব ভাবে তন্ময় হইয়া পূর্ব্বোক্ত সাধারণ ফলের ন্যায় সংসার বৃক্ষ হইতে আপনাআপনি খসিয়া পড়েন। ফল অথবা বৃক্ষের ন্যায় তিনি সংসারের আত্মীয় স্বজন কেহও কিছু জানিতে পারেন না, অথবা জানিতে পারিলেও পরস্পর কাহারও বাধা দিবার ক্ষমতা থাকিবে না। তখন সেই সাধক যেন স্বাভাবিক নিয়মেই নির্ম্মম, কামনাপরিশূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পড়িবেন, সুতরাং আত্মীয়গণের নিকট অনুমতি লওয়া না লওয়া তাঁহার পক্ষে উভয়ই সমান হইয়া যাইবে। তবে অসময়ে সেই তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই প্রায় সকলকে বুদ্ধ, শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের ন্যায় গোপনে বা ছল করিয়া পলায়ন করিতে হয়; কিন্তু সময়ে অর্থাৎ শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট প্রব্রজ্যার কাল উপস্থিত হইলে প্রবীণ সাধক বেশ আনন্দের সহিত সকলের অভিমত গ্রহণানন্তর যথাবিধি অবধূতাশ্রম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক ইচ্ছা করিলেই কেহ প্রকৃত সন্ন্যাসী হইয়া ব্রহ্ম-দর্শনের পথে অগ্রসর হইতে পারেন না, কত জন্ম জন্মান্তরে যে তাহা সম্পন্ন হয় সে কথা জীবন্মুক্তপ্রাণ মহাপুরুষও সহসা ভাবিতে পারেন না। বালক ধ্রুব পাঁচবৎসর বয়সে সাধনায় সিদ্ধ

হইয়া শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। প্রহ্লাদ আট বৎসরে প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এইরূপ অনেক কথাই শাস্ত্র পুরাণ ইতিহাসে যেন স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বালক ধ্রুব পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাঁহার দর্শন পাইয়া মনে মনে সামান্য গর্ব্ব অনুভব করিলেন—ভাবিলেন, কত বড় বড় মুনি ঋষি সাধু যোগী কতদিন ধরিয়া কঠোর তপস্যা করিতেছেন, তাঁহাদের ত শ্রীভগবদ্দর্শনের কিছুই হইতেছে না, আর আমি এই বয়সেই কয়েকদিনের সাধনায় তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। সর্ব্বগর্ব্বহারী শ্রীভগবান ধ্রুবের এই ভাব জানিয়া তখনই অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"বাবা ধ্রুব! চল এইদিকে একটু বেড়াইয়া আসি।" ধ্রুব বলিলেন—"চলুন।" কিয়দ্দূর যাইতেই ধ্রুব বলিলেন—"ঠাকুর এ কোনদিকে আসিলাম, কৈ এদিকে ত কোন দিন আসি নাই।" বৃদ্ধঠাকুর বলিলেন—"সে কি ধ্রুব, নিত্যই তুমি এদিক দিয়া গমনাগমন কর।" ধ্রুব—"না ঠাকুর, এ যে নূতন জায়গা, এদিকে কোন দিনইত আসি নাই।" ঠাকুর—"না এসেছ বৈ কি, তুমি ছেলে মানুষ, ঠিক তোমার মনে নাই।" ধ্রুব—"না না ঠাকুর; এযে সামনে এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত, কৈ এদিকে ত পাহাড় ছিল না?" ঠাকুর—"ছিল বৈকি বন, আর একটু এগিয়ে চল তা'হলেই বুঝিতে পারিবে।" ক্রমে কতদূরই তাঁহারা যাইলেন, ধ্রুব পুনরায় বিস্ময়সহকারে বলিলেন—"এযে অতি ভীষণ পাহাড়! কেবল নরকঙ্কালেরই সমষ্টি, একি মহশ্মশান, একি ঠাকুর?" ঠাকুর তখন তাঁহার পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিলেন—"ধ্রুব এখনও বুঝিতে পার নাই?" ধ্রুব শ্রীকরস্পর্শে তখন চকিত হইয়া তাঁহার পাদপদ্মে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—"লীলাময় ঠাকুর, আপনার এত দয়া! এতক্ষণে সব বুঝিয়াছি, আপনি না বুঝাইলেবু কে ঝাইবে ঠাকুর!" ঠাকুর বলিলেন—"কি বুঝিয়াছ

ধ্রুব, বল দেখি শুনি!" তখন ধ্রুব বলিলেন—"পাঁচ বৎসর বয়সেই প্রভুর সাক্ষাৎ পাইয়া বড়ই গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম, কত যোগী ঋষি, কত শত বৎসর ধরিয়া তপস্যা করিয়াও যাঁহার দর্শন পায় না, আমি এই পাঁচ বৎসরেই তাঁহাকে সম্মুখে স্বরূপে পাইয়াছি। ইহার মধ্যে আমার যে ঘোর ভ্রান্তিপূর্ণ অভিমান ছিল, তাহা সহসা চিন্তা করিবারও অবসর পাই নাই। ঠাকুর কত হাজার হাজার বৎসর যে আমি সাধারণ সাধকের মতই তপস্যা করিয়াছি, তাহা এতদিন স্মরণেও আসে নাই। এই নর কঙ্কালের সমষ্টীভূত ভীষণ পর্ব্বত যে আমারই পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের পরিত্যক্ত কঙ্কালরাশি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আজ এখনই আপনার কৃপায় জানিতে পারিলাম। আমার সাধনার সিদ্ধির শেষ পাঁচ বৎসর যাহা পূর্ব্ব-জন্মে অবশিষ্ট ছিল, এই জন্মে তাহা যেমন পরি-সমাপ্ত হইয়াছে, অমনি প্রভুর দর্শন পাইয়া আমি ধন্য হইতে পারিয়াছি। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে কয়েকদিনের মাত্র সাধনাতেই যে, আমার সাধনা পূর্ণ হয় নাই, তাহাই জানিতে পারিয়াছি, আমার পূর্ব্ব পূর্ব্বজীবনের সকল ঘটনাই প্রত্যক্ষ হইয়াছে। ঠাকুর, আপনার অপার করুণা!"

তাই বলিতেছিলাম, প্রকৃত বৈরাগ্যানুভব সহ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কেবল মুখের কথায় বা ইচ্ছামাত্রেই হয় না। যথার্থ সাধুত্ব সে উৎকট বৈরাগ্য জন্মজন্মান্তরের সাধনালব্ধ প্রারব্ধ বস্তু। সাধারণ লোকে দেখিল, লোকটা এক কথায় বা সহসা সমস্ত ত্যাগ করিয়া আসক্তি বর্জ্জিত হইয়া অন্তিম আশ্রম গ্রহণ করিলে, বিষয়কে বিষের ন্যায়ই মনে করিল, ভ্রান্ত জীব সকলে কি তাহা বুঝিতে পারে? সেই কারণ অনেক সময় বিষয়ী লোক বিষয়-ত্যাগী সন্ন্যাসপন্থীকে অযাচিত কতই না উপদেশ দেয়, তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা সংসারে তাহার কর্ত্তব্য পালন আদি নানা বিষয় কত প্রকারে বুঝাইয়া দেয়। বাস্তবিক ইহা যে সাধারণের বিরুদ্ধ কর্ম্ম

ও বিপরীত ধর্ম্ম, সাধারণে তাহা অদৌ ভাবিতে পারে না। সংসারের প্রায় সকলেই যে অনিত্য বিষয়ের সঞ্চয়ী ও ভোগী আর এ ব্যক্তি যে সঞ্চিত বিষয়ের ত্যাগী, একজন নামিয়া আসিতেছে, আর একজন যে উপরে উঠিয়া যাইতেছে; সংসার মোহমুগ্ধ সাধারণ জীব তাহা বুঝিতে পারে না, একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। অনেকে তাই সময় সময় বেশ গম্ভীরভাবে আপনার প্রগাঢ় শাস্ত্র-জ্ঞান ও প্রবীনতালব্ধ অভিজ্ঞতার অভিমান দেখাইয়া বলিয়া থাকেন:—"কেন গৃহে থাকিয়াই মোক্ষ সাধনা করিতে পারিলে না?" রাজর্ষি জনক তাঁহাদের সকলেরই একমাত্র আদর্শ প্রমাণ, কেহ কেহ আবার শিবকেও দেখাইয়া তাঁহাদের গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহার উত্তরে বলিবার কিছুই নাই তবে এই মাত্র বলা যায় যে, তাঁহাদের কথা বর্ণে বর্ণে যে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিবের কি জনকের ন্যায় হইতে পারিলে সংসারে বসিয়াই সব চলে? কিন্তু শিব বা জনক শাস্ত্রে এক একটী ব্যতীত আর দ্বিতীয় হইল না কেন? তাঁহারা যে অবস্থায় শাস্ত্রে পরিচিত বা জীবন্মুক্তের আদর্শরূপে প্রখ্যাত হইয়াছেন তাহার সংবাদ কি কেহ রাখেন? জীব কেমন করিয়া শিবত্ব লাভ করে, কর্ম্মবদ্ধ জীব কেমন করিয়া কর্ম্মমুক্ত বিদেহ অবস্থা প্রাপ্ত হয়? কেবল শাস্ত্র ও সাধন জ্ঞানের অভাবেই লোকের এইরূপ কত কি ভ্রান্ত ধারণা পরিপুষ্ট হইয়া হইয়া থাকে! বাস্তবিক সাধনা না করিয়া কেহ সিদ্ধ হন না। জনকাদিকেও যে জন্ম জন্মান্তর ব্যাপী মোক্ষ সাধনা করিতে হইয়াছে তাহাতেত শাস্ত্রের ভিন্ন মত নাই। ধর্ম্ম সাধনা ও মোক্ষ সাধনা যে এক বস্তু নহে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। তাহা জানিলে এমন কথা কি সহজে তাঁহারা বলিতে পারেন? নিষ্কামকর্ম্মযোগের সূত্র আজকাল অনেকেরই যেন মুখের কথা হইয়া পড়িয়াছে। তাহা যে কোন বনের ফল বা পক্ষী তাহা তাঁহারা ভাবিতেও

পারেন না। দেহাত্মবুদ্ধি বিনষ্ট না হইলে যে তাহা কখনও
সম্ভবপর নহে, কয়জনে তাহার সংবাদ রাখেন? যাঁহারা মনে
করেন, গৃহে থাকিয়া শাস্ত্রপাঠেই সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, তাঁহারা
কিছুদিনের জন্য বিষয় সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া বিদেশে থাকিলেই
অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, দেহাত্মজ্ঞান ত দূরের কথা,
বিষয়ার্থ জ্ঞানই তাঁহাদের কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত! তাঁহারা কি
পরিমাণ বিষয়াসক্ত তাহা চিন্তা করিলে সহজেই আপনি আপনাকে
পরীক্ষা করিতে পারিবেন। রাগ দ্বেষ যে তাঁহাদের অস্থি মজ্জার
অণুপরমাণুতে কিভাবে পরিপূর্ণ, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য তখন
আর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না। সকল কাজ ফেলিয়া
অতি সত্বর তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিবার জন্য অস্থির হইয়া
পরিবেন। তখন তিনি নিজেই বুঝিতে পারিবেন, সংসারের
আসক্তি ও কামনা তাঁহার বিদূরিত হইতে এখনও কত বিলম্ব
আছে? তাই তিনি গৃহের মধ্যেই বসিয়া আত্মপ্রবঞ্চনারূপ
নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার পক্ষপাতী। কদলি বিক্রয়লব্ধ স্বার্থবুদ্ধি
মুক্তিপ্রদ উপায়ন্তর বিশেষ রথে বামন মূর্ত্তি দর্শনের মধ্যে তখনও
যে লীলা করিতেছে! অতএব মধ্যে মধ্যে এইরূপভাবে আত্ম-
পরীক্ষা না করিলে কেহ সন্ন্যাস গ্রহণের আবশ্যকতা কখনই
অনুভব করিতে পারিবেন না। পারতাপের বিষয় আজ কাল
যেন প্রায় সকলেই না পড়িয়া পণ্ডিত হইতে আশা করেন। জ্ঞান
কর্ম্ম বা উপাসনা কোনও সাধনা না করিয়াই পূর্ণ জ্ঞানী জনক
সাজিতে সাধ করেন। বাস্তবিক আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে
যে ক্রমে বিষয়, দেহ ও জীবাত্মবুদ্ধি শূন্য অর্থাৎ বিদেহ হইতে হয়,
তাহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক। কেবল ঔপপত্তিক অংশ
(Theory) মুখস্থ করিলে কাজ হইবে না, তাহার ক্রিয়াসিদ্ধাংশ
(Practice) অভ্যাস করা একান্ত প্রয়োজন। সৎসঙ্গ ও সৎশাস্ত্র
শ্রবণের এবং প্রকৃত আদর্শের অভাবেই বেদ, তন্ত্র ও ঋষি প্রবর্ত্তিত

অন্তিম আশ্রমের বিষয় অধুনা লোক ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহা যে সনাতন ধর্ম্ম মন্দিরের চূড়াস্বরূপ তাহা কেবল অজ্ঞানতা বশতঃই লোকে বুঝিতে পারেন না। মোক্ষাভিলাষী পুনঃ পুনঃ সাময়িকভাবে সংসার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থানপূর্ব্বক যথাক্রমে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ক্ষয় ও পুষ্টতা বিষয়ে আপনাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যখন বিষয় ও আত্মীয়সঙ্গের জন্য অন্তঃকরণ আর ব্যাকুল হইবে না বরং একান্তবাসে শান্তি অনুভব করিবেন, তখনই বিষয়সঙ্গ কত চিত্তবিক্ষেপকর ও মোক্ষ সাধনের প্রতিকূল তাহা বুঝিতে পারিবেন। তখনই সন্ন্যাস আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা ও ঋষিবাক্যের সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন। ফলতঃ সন্ন্যাসমার্গে সাধকের যথেষ্ট আধ্যাত্মিক শক্তির ও সাহসিকতার প্রয়োজন; অতএব দুর্ব্বলহৃদয় ব্যক্তির পক্ষে ইহা অপেক্ষা সংসারমার্গে থাকিয়াই সাধনোন্নতি করা যুক্তিযুক্ত। তাঁহাদের পক্ষে বাস্তবিক সন্ন্যাসাশ্রম যে আশঙ্কার কারণ, তাহা জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যিনি লজ্জা, ভয় ও ঘৃণাদি ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, যিনি স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, আত্মীয়স্বজন, শত্রু, মিত্র সকলের আত্মাই পরমাত্মার সহিত একতানে দেখিতে শিখিয়াছেন, তিনিই "সর্ব্বকর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" একমাত্র তাঁহারই স্মরণ লইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসাধিকারী হইতে পারিয়াছেন বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্‌বিষ্ণুভাগবতে কথিত গোপিকাগণের ন্যায় সাধক শ্রীভগবানের মুরলিধ্বনিরূপ ব্রহ্মনিনাদ প্রণবস্বর অন্তরে শুনিবামাত্র আর কি সংসারমোহে তিলমাত্রকালও মুগ্ধ থাকিতে পারেন? তখন সম্পূর্ণ অসম্পুর্ণ সকল কর্ম্ম সেই অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া সেই অনির্ব্বচনীয়, অনাহত স্বর-ধ্বনি অনুসরণ করিয়া কোথায় উধাও হইয়া চলিয়া যান, ফিরিয়া দেখিবারও আর মুহূর্ত্তমাত্র অবসর থাকে না। তখন তাঁহাদের দেহ থাকিতেও দেহজ্ঞান থাকে না। সাধারণ জীব কালের আহ্বানে যেভাবে সংসারের প্রিয় অপ্রিয় সকল বস্তু ফেলিয়া, জীবনের কত সাধ আশা

ও ভরসা সমস্তই ছাড়িয়া, একটী কথা বলিবারও অবসর না পাইয়া নিজ দেহখানি পর্য্যন্ত বিনা বাধায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সাধকও প্রায় সেইভাবে সংসারের সকল আসক্তি ও বিরক্তি বর্জ্জিত হইয়া সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করেন; তখন তাঁহার চিরাভ্যস্থ অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া চিন্তা করিবারও আর কিছুই থাকে না। শ্রীমন্মহর্ষি ব্যাসের বচনে উক্ত হইয়াছে :—

"ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বাণপ্রস্থোঽথবা পুনঃ।
বিরক্ত সর্ব্বকামেভ্যঃ পারিব্রাজ্যং সমাশ্রয়েৎ॥"

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা বানপ্রস্থাশ্রমী যে কেহ হউক পূর্ণভাবে তাঁহার বিষয় বৈরাগ্য আসিলেই প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন।
শ্রুতি আরও বলিয়াছেন :—

"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ॥"

অর্থাৎ যে দিনই তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইবে, সেই দিনই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। তখন কাহার কোন বাধাই নাই। শ্রীভগবান তাই সাধককে সোৎসাহে বলিয়াছেন, ভক্তের নিকট যেন এক প্রকার শপথই করিয়াছেন :—

"অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

আবার বলিয়াছেন :—

"সর্ব্বকর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

অর্থাৎ সকল কাজ ফেলিয়া তুমি আমার নিকট চলিয়া আইস, তোমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই, তোমার ওরূপ তীব্র বৈরাগ্যের সম্মুখে আর কি কোন কাজ ভাল লাগিতে পারে? আইস, তুমি সম্পূর্ণভাবে আমার উপর নির্ভর করিয়া চলিয়া আইস, তোমার সকল ভারই আমি বহন করিব, আমার শরণাপন্ন হইলে আমিই তোমার অসম্পূর্ণ কার্য্যজনিত পাপভারসমূহ গ্রহণ করিব। তোমার

পরিত্যক্ত অপূর্ণকার্য্য আমিই পূর্ণ করিয়া দিব, তোমার সর্ব্ববিধ পাপ হইতে তোমায় মুক্ত করিব; তুমি তাহার জন্য কোনপ্রকার চিন্তা করিও না। তুমি আমাতে বা আপনাতে অবস্থিত হও।

যখন তাঁহার এত কৃপা, এত উৎসাহ, এত ভরসা, তবে আর ভাবনা কি? সাধকপ্রবর! তাঁহাতেই সম্পূর্ণ নির্ভর কর, তাঁহাতেই তন্ময় হইয়া তোমার অন্তিম ক্রিয়ানুষ্ঠান বিরজাসংস্কার এইবার সম্পন্ন কর, সাধনার শেষ অবিরোধপথে নির্ভয়ে অগ্রসর হও! পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। ওঁতৎসৎ শ্রীমচ্ছদাশিব ওঁ॥

(কাজেরলোক)—"*** এমন গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে কেহ প্রকাশ করেন নাই। ** একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। (সাহিত্য-সংবাদ)—"*** ইহা পাঠে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হয়, বিষয়-বিন্যাস কৌতূহল-প্রদ।" *** (ব্রহ্মবিদ্যা) "যিনি বহু বৎসর কাশীতে বাস করিয়া স্থানীয় তথ্য সকল নিজে আয়াসসহ অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা যে অন্যদৃষ্ট ও অন্য-লিখিত বিবরণের অনুবাদাদি অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস্য ও সত্য, তাহার সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে অবশ্য-জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ের অভাব দেখিলাম না। ***" (বঙ্গবাণী)—"** এককথায় ইহা কাশীর ইতিহাস ও কাশীযাত্রীর "গাইড-বুক"। ***

("THE BENGALI," 33-1-12)—"The book is full ble information about the sacred city— ion which we believe would be both ng and instructive to all lovers of antiquity ticularly to patriotic Hindus." ("INDIAN NEWS" 10-9-12.)—"This is an illustrated guide book to Benares in Bengali ***which cannot fail to be of use to Bengali pilgrims to that Holy City" ("AMRITA BAZAR PATRIKA" 7-10-12) —"***The reader will find in the book detailed descriptions of not only all the temples, wells, ghats, muths, mosques, and other relics of antequarian interest but also of all the modern institutions which have added lustre to the fair fame of the fascinating city. There are also in the book elaborate accounts of the various

বাবা নামে পরিচিত হইয়া সতত দিগম্বর বিশ্বনাথের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। যাহার সুন্দর শঙ্খ মর্ম্মর মূর্ত্তি এখনও দশাশ্বমেধ ঘাটে তাঁহার আশ্রম মন্দির প্রতিষ্ঠিত, সেই মহাপুরুষের অপূর্ব্ব ও অসাধারণ জীবন বৃত্তান্ত. পড়িতে পড়িতে চমৎকৃত ও আত্মহারা হইতে হয়। প্রায় আড়াইশত পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থ। সুন্দর বাধাই মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ভক্ত ও সাধকগণের সুবর্ণ সুযোগ—

সাধন ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ও আগ্রহে আমরা পূজ্যপাদ শ্রীমদ 'গুরুমণ্ডলীর' ফটো ও নিম্নলিখিত সুরঞ্জিত বিশুদ্ধ চিত্রাবলী প্রকাশ করিয়াছি।

'নন্দনলাল' 'শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী', 'শ্রীশ্রীদক্ষিণকালিকা' 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-ভগবান' ও 'প্রণবেনগল' ইত্যাদি দেবদেবীর চিত্র।

যোগ-বিজ্ঞানাচার্য্য প্রসিদ্ধ মহাত্মার উপদিষ্ট বিশুদ্ধ—

(১) ষট্‌চক্র—(সাধকাঙ্গে মূলাধারাদি ষটচক্রকমল ও সহস্রারমধ্যে অপূর্ব্ব শ্রীগুরুপাদুকাকমলে 'শ্রীশ্রীগুরুমূর্ত্তি', সুরঞ্জিত অপূর্ব্ব চিত্র, (২) ষট্‌চক্র—নরকঙ্কালস্থিত সুষুম্নামার্গের মধ্যে ষট্‌চক্রান্তর্গত দেবতাবৃন্দসমন্বিত সুরঞ্জিত অপূর্ব্ব চিত্র। মূল্য প্রত্যেকখানি ।০ চারি আনা মাত্র।

পরমপূজ্যপাদ পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী বশিষ্ঠানন্দ সরস্বতী, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, সচ্চিদানন্দ সরস্বতী; কাশীমিত্রের শ্মশানস্থিত সিদ্ধসাধক শ্রীমৎ প্রণবানন্দজী ও যোগীরাজ শ্রীমৎ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের এবং ও জ্ঞানানন্দজী মহারাজ আদির আসল (ব্রোমাইড-ফটো) মূল্য প্রত্যেকখানি ১।০ পাঁচসিকা মাত্র। ঐ ১২"×১০" বর্দ্ধিত ব্রোমাইড-চিত্র; মূল্য প্রত্যেকখানি ৮৲ মাত্র।

এতদ্ব্যতীত পরমপূজ্যপাদ অন্যান্য মহাপুরুষবৃন্দের ফটো-চিত্রও উক্তরূপ মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে।

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল।

২৫৭এ, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।